াাবধা   ...

২; এক্ষণে ইহা বালকদিগের পাঠোপ

ইলেই তদ্ভাবৎ সকল জ্ঞান করিব।

শ্রীতারিণীচরণ শর্ম্মা।

লিকাতা, সংস্কৃত কালেজ।

আষাঢ়, সংবৎ ১৯২৭।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদিমকালীন ম্লেচ্ছ রাজাদিগের ভারতবর্ষ-আক্রমণ।

—()—

চতুর্থ অধ্যায়।

আলেকজণ্ডরের সময় হইতে মুসলমানদিগের আক্রমণের
প্রাক্কাল পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের বিবরণ

পঞ্চম অধ্যায়।

দাক্ষিণাত্যের আদিম বিবরণ।

—•—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আদিম ভারতবর্ষীয়দিগের সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য।

———

ন

সপ্তম অধ্যায়।

হ

মুসলমানদিগের উৎপত্তি ও দিগ্বিজয়।

—০—

অষ্টম অধ্যায়।

সুলতান মামুদ।

———

নবম অধ্যায়।

মামুদের উত্তরাধিকারিবর্গ।

দশম অধ্যায়।

দাসরাজশ্রেণী—পাঠান-বংশ।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পাঠান-বংশ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মোগল-বংশ।

সুলতান বাবর।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আকবর।

—০—

অষ্টাদশ অধ্যায়।

আকবরের রাজত্বের পরিশিষ্ট।

—০—

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জাহাঙ্গীর।

বিংশ অধ্যায়।

সাজাহান।

একবিংশ অধ্যায়।

আরাঙ্গিব।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

আরাঙ্গিবের রাজত্বের পরিশিষ্ট।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আরাঙ্গিবের উত্তরাধিকারিগণ।

—০—

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

াদির সাহার আক্রমণ ও মোগল রাজত্বের বিনাশ।

—

ভূমিকা।

আফগান বিবরণ আফগানিস্থানের সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে, যে প্রকারে সদোজায়ী রাজত্ব সংস্থাপিত হয় এবং যে কারণে তাহার ধ্বংস হইয়া বরাকযায়ী রাজত্ব সংস্থাপিত হয়, এবং যে জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বারম্বার আফগানিস্থানে যাইতেছেন, সেই সকল বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ইংরেজী অনেক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছি, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ যে ভাবে লিখিতে আশা করিয়াছিলাম, তাহা পারি নাই। অনেক ঘটনার অনেকাংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রত্যাশা করি যে, পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠে যে সকল সংবাদ পাইবেন, তাহা এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই।

এই পুস্তকের সঙ্গে সেণ্ট্র্যাল এসিয়ার একটী বাঙ্গলা মানচিত্র দিবার একান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন তাহা অসম্পূর্ণ রহিল। ভরসা করি, পাঠকগণ একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ এই তিনটী অধ্যায় পাঠ করিবার সময় সেণ্ট্র্যাল এসিয়ার একখানি নূতন মানচিত্র সম্মুখে রাখিয়া পাঠ করিবেন।

যে সকল ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক-খানি লিখিয়াছি, তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

(1) Havlock's War in Afghanistan (2) Afghanistan by P F Walker (3) Herat The Granary and Garden of Central Asia By Col. G B Malleson C. S. I (4) History of Afghanistan By the same Author. (5) Races of Afghanistan By W H. Bellew C. S I. (Late on a special political duty at Cabul) (6) Memoirs of Afghanistan (7) England and Russia Face to Face By Yate (8) Journal of the Asiatic Society for 1884.

ময়মনসিংহ—মুক্তাগাছা
সন ১২৯৩ সাল। } শ্রীকেশব চন্দ্র আচার্য্য।

সূচীপত্র।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি।	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৩০	১৩	অঙ্গীকার প্রতিপালন	অঙ্গীকার প্রতিপালন না করা।
৭২	২	তাঁহারা	তাহার
৯৭	১৮	এই সময়ে	ইহার পর ১৮৫৬সনের অক্টোবর মাসে।
৯৯	৪র্থ	রাজার	রাজ্যের।
		দশম অধ্যায়	নবম অধ্যায়।
		একাদশ "	দশম "
		দ্বাদশ "	একাদশ "
		ত্রয়োদশ "	দ্বাদশ "
		চতুর্দ্দশ "	ত্রয়োদশ "

আফগান-বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

সদোজায়ী রাজত্ব।

খৃষ্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আফগানিস্থান খোরাসান নামে অভিহিত হইত এবং মোগল ও পারস্য রাজ্যে প্রায় তুল্যভাবে বিভক্ত ছিল। কাবুল ও গজনি মোগল, এবং কান্দাহার ও হিরাট পারস্য রাজ্যভুক্ত ছিল। উভয় প্রদেশের অধীশ্বরই অপরের অধিকৃত অর্দ্ধভাগ অধিকার করিবার জন্য যত্ন করিতেন। হিরাট এবং কান্দাহারবাসিগণ সুন্নি ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু পারস্য দেশের সম্রাট শিয়া শ্রেণীভুক্ত, পারস্য দেশ হিরাটের খুব নিকটবর্ত্তী এবং তজ্জন্য শাসন-কার্য্যও দৃঢ়তার সহিত পরিচালিত হইত, এতদ্ভিন্ন উভয়ের মধ্যে জাতি এবং ভাষাগত বিভিন্নতাও ছিল; এই সকল কারণে আফগানগণ পারস্যবাসীদিগকে একান্ত ঘৃণা করিত। প্রকৃতপক্ষে, আফগানগণের যদৃচ্ছাচারিতাই উ[illegible]র [illegible] কারণ ছিল। আফগানেরা দেখিতে লাগিল যে পারস্য সম্রাট তাহাদের অবৈধ ব্যবহার সহ্য করিবেন না,—তিনি বিধি ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্যানুযায়ী ফল বিধান করিতেছেন। পারস্য রাজের এই ব্যবহারে আফগানগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া-

ছিল। অন্য পক্ষে, মোগল সম্রাট সুন্নি ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; এবং মোগল রাজধানী দিল্লী আফগানিস্থান হইতে বহুদূরে সংস্থাপিত হওয়াতে শাসনকার্য্য ঐরূপ দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন হইত না। এ জন্য, এবং কতক পরিমাণে বাণিজ্য বিষয়ক সুবিধার জন্যও আফগানগণ দিল্লীর সম্রাটের প্রতি অনুরক্ত ছিল।

উভয় রাজার যশঃসূর্য্যই ক্রমশঃ অস্তমিত হইতে লাগিল, উভয় রাজ্যই দুর্ব্বল হইয়া উঠিল এবং কিছুদিন মধ্যে উভয়ের রাজত্বই—দ্রুত বা মন্দ গতিতে—ক্ষীণপ্রভ হইয়া গেল।* কান্দাহার নিবাসী ঘিলিজাইগণ এই সময়ে পারস্য-শাসন অসহ্য বলিয়া, সকলে সমবেত হইয়া বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিল। এই বিদ্রোহ দমনজন্য পারস্যরাজ উপর্য্যুপরি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সেনাপতি ও সৈন্যগণের

---

* ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎপর দিল্লী, আগ্রা, আলিগড় এবং মথুরা প্রভৃতি রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে যে কিছু প্রকৃত আধিপত্য ছিল তাহাও ১৮০৩ খৃঃ অব্দে একবারে হারাইলেন। সেই অবধি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রদত্ত বৃত্তির উপর তাহার সম্রাটত্ব নির্ভর করিত। অবশেষে দিল্লীর দুর্গের মধ্যে যে কিছু স্বাধীনতা ছিল তাহাও দ্বিতীয় আকবরের জীবন সময়ে তিরোহিত হইয়া গেল। তৎপর বাহাদুর সাহের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহা ভারত ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। বাহাদুর সাহের সময় পর্য্যন্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন নামাকরণে দিল্লীশ্বরের নামে সমগ্র ভারতবর্ষ ১৮৫৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত শাসন করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে ভারতবর্ষ শাসনের ভার লইলেন।

নৃশংস ব্যবহারে আফগানগণ উৎপীড়িত হইয়া দ্বিগুণিত বিক্রমের সহিত তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭০৭ খৃঃঅব্দে পারস্যরাজ প্রেরিত গবর্ণরকে বধ করিয়া, মীরওয়াএস নামক এক ব্যক্তি স্বাধীন রাজা হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন, এবং বাহুবলে বিপক্ষ সৈন্যসমূহ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ইহার কতিপয় বৎসর পরই হিরাটবাসী আফগানগণও (ইহারা আবদালী নামে অভিহিত) কান্দাহারবাসীদিগকে অনুকরণ করিয়া পারস্যরাজ কর্তৃক নিযুক্ত গবর্ণরকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, এবং আসাদুল্লা খাঁ সদোজায়ী স্বাধীন রাজা হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পশ্চিম আফগানিস্থান এই ভাবে সংস্থিত ছিল।

এই সময় পারস্য সেনার বিখ্যাত নায়ক নাদীরসাহ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই বিখ্যাত তুর্কি দস্যু মোগল এবং পারস্যরাজ্য অধিকৃত করিয়া যে কি ভীষণ নৃশংসতার অভিনয় করিয়াছে তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে, ঘিলিজাই এবং আফগানগণ পারস্য দেশ আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত উৎপা[illegible] করিতে আরম্ভ করে; নাদীরসাহ তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া শান্তি সংস্থাপন কর[illegible], [illegible] পর[illegible]র করেন, রুশকে বহুদূর পশ্চাতে, বা[illegible] আই[illegible]সেন, এবং অবশেষে স্বীয় সম্রাটকে [illegible]জ্যভ্রষ্ট করি[illegible] পারস্যের রাজমুকুট নিজ মস্তকে পরিধান করেন।

এই ঘটনার পাঁচ বৎসর অন্তে, নাদীরসাহ, দীর্ঘকালব্যাপী

আক্রমণের পর, কান্দাহার অধিকার করিয়া পুরাতন নগরটীকে ভূমিসাৎ করেন এবং এই নগরের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে একটী নিম্ন জলাভূমিতে নাদিরাবাদ নামে একটী নিরুষ্টতর নগর সংস্থাপিত করেন। কান্দাহার আক্রমণ সময়ে ঘিলিজাই এবং আফগান জাতি হইতে বহু সৈন্য আহরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী সমুদয় প্রদেশ জয় করেন, এবং উক্ত নগরের পতনের অব্যবহিত পরেই কাবুল এবং উত্তর ভারতবর্ষ জয় করিতে অগ্রসর হন।

ইহার ১০ বৎসর পর ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে পঞ্জাব জয় করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন ও নগরবাসীগণকে নৃশংসভাবে বধ করিয়া অপরিমিত মহামূল্য ধন সহ পারস্য রাজ্যের সমীপবর্ত্তী হইলে পর, এই বিখ্যাত দস্যু স্বীয় সহচরগণ কর্ত্তৃক হত হন।

ভারতবর্ষে যাইবার সময় নাদীরসাহ বহুতর আফগান সৈন্য সঙ্গে লইয়া যান। এই আফগান সৈন্যের সহিত আহাম্মদ খাঁ অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ রাজশিবিরের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য নাদীরসাহের লুণ্ঠিত ধনের প্রহরী স্বরূপ পশ্চাতে ছিল। এই আহাম্মদ খাঁ নাদীরসাহের বধ সংবাদ শ্রবণ করিবা-মাত্রই রাজস্কন্ধাবার পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যসহ কান্দাহার অভি-মুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া নিজ সৈন্যের সহায়তায় নাদীরসাহের অপরিমিত লুণ্ঠিত ধনরাশি অধিকার করিয়া বসিলেন।

এই প্রকারে অনায়াস লব্ধ বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া আহম্মদ খাঁ আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থানের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন, এবং বর্ত্তমান কান্দা-হারের সমভূমির সম্মুখস্থিত একটী উচ্চ স্থানে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের অধিকৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে এদেশের ইতিবৃত্ত হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন রাজত্বকালে বিভক্ত। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময়ের আট শত বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশে হিন্দুদিগের অখণ্ড প্রভাব ছিল; সেই তাবৎ কাল হিন্দুরাজত্বের অন্তর্গত। তৎপরে মুসলমানেরা আসিয়া, হিন্দুদিগকে পরাস্ত করিয়া, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত আধিপত্য করেন। সেই তাবৎকাল মুসলমান-রাজত্বের অন্তর্ব্বর্ত্তী। অনন্তর ১৭৫৬ খৃঃঅব্দ হইতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরেজেরা মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া, এপর্য্যন্ত ভারতভূমির অধিস্বামী হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদিগের রাজত্ব ইংরেজরাজত্ব নামে প্রসিদ্ধ। উপরি উক্ত তিন রাজত্বকালের স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য।

কোন দেশেরই অতিপ্রাচীন সময়ের যথাতথ ক্রমায়াত বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ কস্মিন্ কালেও হিন্দুদিগের কোনপ্রকার প্রকৃত পুরাবৃত্ত-গ্রন্থ ছিল কি না সন্দেহ; যাহাও ছিল তাহা কালাতিরেকে ও উপর্য্যুপরি

উপপ্লবে বিলুপ্ত হইয়াছে। অধুনা যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই কাব্য ও কল্পিত উপন্যাসে পূর্ণ; রাজতরঙ্গিণী*ভিন্ন একখানিও প্রকৃত পুরাবৃত্ত দেখা যায় না। সে যাহা হউক, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি পুস্তক, চিরাগত কিম্বদন্তী ও অনুশাসন-পত্র প্রভৃতিতে যে সকল বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সার ভাগ সঙ্কলন করিয়া হিন্দুরাজত্বের অতি সঙ্ক্ষিপ্ত ও অগত্যা অসম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

অতীত কালের যত দূর উদ্ভেদ করিতে পারা যায় তাহাতে এই দৃষ্ট হয় যে অতি প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে, পরস্পর অতিশয় বিভিন্ন, দুই সম্প্রদায় লোকের বসতি ছিল। তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় শরীরের দৈর্ঘ্য ও গঠন প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের অনেক অনুরূপ। অধুনা সেই সম্প্রদায়ের সন্ততি হিন্দু নামে খ্যাত। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা খর্ব্বকার, কৃষ্ণবর্ণ ও অতিশয় অসভ্য ছিল। ইদানীং ইহাদের সন্ততি খশ, ভিল্ল, পুলিন্দ, সাঁওতাল প্রভৃতি জঙ্গল জাতি নামে পরিচিত। উপরি উক্ত দুই সম্প্রদায়ই ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী কি না অধুনা তাহার অবধারণ করা সহজ নহে। কেহ কেহ বলেন, ইদানীন্তন হিন্দুদিগের আদিপুরুষেরা ভারতভূমির আদিম নিবাসী নহেন, তাঁহারা সিন্ধু-নদীর পশ্চিমের কোন জনপদ হইতে আসিয়া বাহুবলে ভারতবর্ষ অধিকার ও তদবধি তথায় বসতি করেন। এরূপ হউক বা না হউক, কিন্তু আদিম হিন্দুরা যে সমস্ত ভারতবর্ষে

---

* কাশ্মীরের ইতিহাস।

ব্যাপ্ত ছিলেন না তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদিম হিন্দুদিগকে আর্য্য কহিত, এজন্যই তাঁহারা প্রথমে যে সকল ভূভাগে বসতি করেন তৎসমুদয়ের নাম আর্য্যাবর্ত্ত হইয়া উঠে। দাক্ষিণাত্য আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত নহে; ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যখন ঐ নামের সৃষ্টি হইযাছিল তখন দাক্ষিণাত্যে আর্য্য অর্থাৎ হিন্দুদিগের বসতি হয় নাই।

ভারতবর্ষে আর্য্যাবর্ত্তই হিন্দুদিগের আদিম নিবাসস্থল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু উহারও সমস্ত ভাগে একেবারেই তাঁহাদিগের বসতি হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক প্রদেশই হিন্দুদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী * নদীর অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহিত। ব্রহ্মাবর্ত্ত দিল্লীর প্রায় পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত; উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ত্রিশ ক্রোশ, বিস্তার আঠার ক্রোশ মাত্র। ব্রহ্মাবর্ত্তই হিন্দুদিগের যাবতীয় রাজর্ষি ও মহর্ষিগণের কীর্ত্তিস্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। ব্রহ্মাবর্ত্তের অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মর্ষি-প্রদেশের বর্ণনা দেখা যায়। ঐ প্রদেশ, ব্রহ্মাবর্ত্তের পূর্ব্ব হইতে বিহারের উত্তর পর্য্যন্ত, যমুনা ও গঙ্গার উত্তরবর্ত্তী যাবতীয় ভূভাগ লইয়া পরিগণিত। বোধ হয়, আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আদিম হিন্দুরা ব্রহ্মাবর্ত্তের পরেই ব্রহ্মর্ষি-প্রদেশে বসতি করেন। এইরূপে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে ব্যাপ্ত হইয়া উঠেন এবং অবশেষে, অপেক্ষাকৃত বহুকাল বিলম্বে, দাক্ষিণাত্যেও উপনিবেশ সংস্থাপন করেন।

---

* অধুনা এই নদী কাগার নামে খ্যাত।

এদেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হয়। মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্র। শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ হইতে ব্রাহ্মণেরা উৎপন্ন, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এবং পর পর অপকৃষ্ট অঙ্গ হইতে আর আর বর্ণ উৎপন্ন, এজন্য তাহারা পরপর অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। যাহা হউক, প্রাগুক্ত বিবরণ প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। এরূপ বিবেচনা করা অযৌক্তিক নয় যে, জাতিভেদ ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হয় এবং বহুকাল পরে তাদৃশ প্রভেদের আদি কারণ নির্দ্দেশ আবশ্যক হওয়াতে ওরূপ বিবরণ উদ্ভাবিত হইয়াছে। বোধ হয়, আদিম হিন্দুরা নিজ নিজ ব্যবসায়-ভেদে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন মাত্র জাতিতে বিভক্ত ছিলেন। পরে তাঁহারা যে সকল জাতিকে পরাজিত করেন, তন্মধ্যে কিয়দংশ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করে, অবশিষ্ট অংশ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বতপ্রভৃতি দুরাক্রম্য ভূভাগে আশ্রয় লয়। যে সকল পরাভূত ব্যক্তিরা হিন্দুদের অধীন হয় তাহারাই শূদ্র নামে খ্যাত এবং পরিণামে হিন্দু-সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা জেতা, শূদ্রেরা জিত; এজন্যই শেষোক্ত জাতির উপর প্রথমোক্ত তিন জাতির এরূপ প্রাধান্য হইয়া উঠে। প্রথমোক্ত তিন জাতি দ্বিজ এই সামান্য নামে পরিচিত; শেষোক্তেরা ঐ নামের অধিকারী নহে। ইহাতেও প্রতীয়মান হইতেছে যে আদৌ প্রথমোক্তেরা শেষোক্তদিগের হইতে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ছিলেন। পরে শেষোক্তেরা সেই সম্প্রদায়ে গৃহীত, কিন্তু সর্ব্ব-নিকৃষ্ট

শ্রেণীতে গণিত হয়। তদবধি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণে হিন্দুসম্প্রদায় বিভক্ত হইয়া উঠে। ইহাদের পরস্পর সংস্রবে বিবিধ সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হয়। সেই সকল সঙ্কর বর্ণও হিন্দু-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভূত হইয়া উঠে। আপন সম্প্রদায়ের বহির্ভূত লোকদিগকে হিন্দুরা ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

হিন্দুদিগের রাজত্বকালে কোন সময়েই সমস্ত ভারতবর্ষ এক রাজার অধীন ছিল এমন বোধ হয় না। প্রত্যুত যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে এই প্রতীয়মান হয় যে,—পূর্ব্বকালে ভারত-ভূমি বহুসংখ্যক স্বস্বপ্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে যখন যে রাজ্যের রাজা স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে অন্যান্য রাজাদিগের অপেক্ষা সমধিক পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেন, তখনই তিনি দিগ্বিজয়ে নির্গত হইতেন এবং সন্নিহিত অপরাপর রাজা জয় করিয়া আপনাকে সার্ব্বভৌম * চক্রবর্ত্তী ও সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। তাদৃশ পরাক্রান্ত রাজা পরলোক গমন করিলেই তাঁহার ভুজবল-পরাজিত ভূপতিরা স্বাধীন হইবার প্রয়াসে, অথবা অন্যান্য পরাক্রান্ত রাজারা তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার অভিলাষে, তদীয় উত্তরাধিকারীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐ উত্তরাধিকারী প্রবল-পরাক্রম হইলে সেই সকল বিপদ নিরাকৃত হইত, নতুবা তাঁহার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন, সঙ্কীর্ণ অথবা একেবারেই উৎসন্ন হইয়া যাইত।

---

* হিন্দুরাজাদিগের সার্ব্বভৌম প্রভৃতি উপাধি অপেক্ষাকৃত অধিক আধিপত্য ও পরাক্রমের সূচকমাত্র, নতুবা বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবী বা সমস্ত ভারতবর্ষের আধিপত্য নিবন্ধন বলিয়া বোধ হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদিম রাজবংশ।

অতিপ্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে দুই অতিপ্রসিদ্ধ রাজবংশের বিস্তর উল্লেখ আছে। বৈবস্বত মনু উভয় বংশেরই আদি-পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত। তাঁহার ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র ও ইলা নাম্নী দুহিতা ছিল। ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশের উৎপত্তি। সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা পুরী সূর্য্যবংশের রাজধানী ছিল। চন্দ্রবংশের আদিম রাজধানী প্রয়াগ। প্রয়াগ অযোধ্যার যেরূপ সন্নিহিত তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের আদিম অধিকার তাদৃশ বিস্তৃত ছিল না। ইক্ষ্বাকু ও ইলা ভিন্ন মনুর আর অনেক সন্ততি ছিলেন; তাঁহারা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক স্বপ্রধান রাজ্য স্থাপন করেন, কিন্তু তৎসমুদায় তাদৃশ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে নাই।

ইক্ষ্বাকুর লোকান্তর গমনের পর ক্রমান্বয়ে চুয়ান্ন জন ভূপতি অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদ-নন্তর সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ রামচন্দ্র আবির্ভূত হন। তিনি কিরূপে মৈথিলীর পাণিগ্রহণ, বিমাতার ষড়যন্ত্রে বনে গমন এবং তথা হইতে সীতা-হরণ জন্য লঙ্কাপতি রাবণকে নিধন করেন, আদি কবি বাল্মীকির সুললিত মধুর পদ্যে তৎসমুদায় অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে এবং অস্মদ্দেশে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তত্তাবৎ অবগত আছেন। কিন্তু বাল্মীকির গ্রন্থে অনেক উপকথা সন্নি-বেশিত হইয়াছে। যাহা হউক, রামায়ণ হইতে ইহা

প্রতিপন্ন হইতেছে, যে রামচন্দ্র মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং তিনিই প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদিগের প্রভুতার সূত্রপাত করেন। রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। দণ্ডকারণ্য কাবেরী নদীর উভয় তটে বহুদূর লইয়া বিস্তৃত ছিল। তাহার দক্ষিণে রাবণের অধিকৃত জনস্থানের বর্ণনা আছে। ইহাতে বোধ হয় তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ ভাগ লঙ্কার অধিকৃত ছিল। রামের লোকান্তরের পর ষাটি জন রাজা ক্রমান্বয়ে তাঁহার সিংহাসনে রাজত্ব করেন। তৎপরে অযোধ্যায় সূর্য্যবংশের বিলোপ হইয়া উঠে। অযোধ্যাতে সূর্য্যবংশের বিলোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানান্তরে অদ্যাপি তদ্বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেছেন। মেওয়ার, উদয়পুর, জয়পুর প্রভৃতির প্রায় তাবৎ রজপুত রাজারাই সূর্য্যবংশজাত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু এই পরিচয় কত দূর সত্যমূলক তাহা স্থির বলা যায় না।

রামচন্দ্রের পরে কুরু-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে রাজা ইক্ষ্বাকুর ইলানাম্নী ভগিনী ছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, চন্দ্রতনয় বুধের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই ইলা ও বুধ হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। বুধের প্রপৌত্র রাজা যযাতির পাঁচ পুত্র ছিল, তন্মধ্যে পুরু ও যদু বিশেষ বিখ্যাত। পুরুর সন্ততি পৌরবেরা কালসহকারে দিগ্দিগন্তর ব্যাপিয়া উঠেন এবং ইহাদের মধ্যে হস্তি-নামা একজন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রায় পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে, হস্তিনাপুর স্থাপন করেন। এই নগর দিল্লীর ত্রিশ ক্রোশ পূর্ব্বে গঙ্গাতটে অবস্থিত ছিল। পাণ্ডবেরা ও মগ-

ধের প্রসিদ্ধ ভূপতি জরাসন্ধ উভয়ই পুরুর বংশ। যদুর বংশে যে সমস্ত ব্যক্তি উৎপন্ন হন তন্মধ্যে কৃষ্ণ ও বলরাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

ইলা ও বুধ হইতে কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ছচল্লিশ জন চন্দ্রবংশীয় রাজার রাজত্ব গণনা আছে। এদিকে ইক্ষাকু হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে সাতান্ন জন সূর্য্যবংশীয় রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকু ও ইলা ভ্রাতা ও ভগিনী ছিলেন। সুতরাং সূর্য্য ও চন্দ্র উভয় বংশীয় এক এক রাজার রাজত্বকাল গড়ে সমান ধরিলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রামচন্দ্রের রাজত্বের পূর্ব্বে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বাস্তবিক সেই যুদ্ধ রামচন্দ্রের বহুকাল পরে ঘটে। অতএব হয় চন্দ্রবংশীয় কতিপয় রাজার রাজত্ব গণনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, নয় চন্দ্রবংশীয় রাজারা অপেক্ষাকৃত অনেক দীর্ঘজীবী ছিলেন স্বীকার করিতে হইতেছে। নতুবা, যে সময়ে সূর্য্যবংশে সাতান্ন, তাহার অনেক পর সময় লইয়াও চন্দ্রবংশে ছচল্লিশ জন মাত্র রাজা হইয়াছিলেন—এই দুই বিষয় পরস্পর সঙ্গত হইয়া উঠে না।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় অযোধ্যা-রাজ্যের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, ইহাতে বোধ হয় তৎপূর্ব্বেই তথায় সূর্য্যবংশের বিলোপ হইয়া থাকিবে। অথবা সূর্য্যবংশীয়েরা নিতান্ত হীনপ্রতাপ হইয়াছিলেন বলিয়াই বর্ণনায় পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, তখন চন্দ্রবংশীয়েরা সর্ব্বত্র প্রবল ও ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত বংশজাতদিগের মধ্যে মগধে জরাসন্ধ, মথুরায় কংস এবং হস্তিনাপুরে পৌরবেরা অতিশয় প্রবল ও পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কংস জরা-

সন্ধের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণের সহিত তাঁহার দারুণ শত্রুতা ছিল। পরিণামে কৃষ্ণ প্রবল হইয়া কংসের প্রাণবধ ও তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। জরাসন্ধ জামাতৃ-বধহেতু ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া মথুরা অবরুদ্ধ করিলেন। প্রথিত আছে তিনি অষ্টাদশ বার মথুরা অবরোধ করেন; অবশেষে ঐ নগর তাঁহার হস্তে পতিত হয়। তখন কৃষ্ণ স্বগণ সহিত বহির্গত হইয়া গুর্জ্জরের প্রান্তে যাইয়া দ্বারকা নগর স্থাপন করেন।

পূর্ব্বকালে চন্দ্রবংশে কুরু নামে রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাল-সহকারে কুরুর বংশে সুপ্রসিদ্ধ শান্তনুর জন্ম হয়। শান্তনুর তিন পুত্র জন্মে; ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ। তন্মধ্যে শেষোক্ত দুই জন সত্যবতী নাম্নী মহিষীর গর্ভজাত। অল্প বয়সে চিত্রাঙ্গদের আয়ুঃশেষ হয়। বিচিত্রবীর্য্য অম্বা ও অম্বালিকা নামে কাশীরাজের দুই তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া উঠেন এবং তন্নিবন্ধন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া লোকান্তর গমন করেন। বিচিত্রের মাতা সত্যবতীর পরাশরের ঔরসজাত এক কানীন পুত্র ছিল। তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন। তিনি চতুর্ব্বেদের সংগ্রহ ও বিভাগ-কর্ত্তা; তন্নিবন্ধন ব্যাস ও বেদব্যাস নামে বিখ্যাত। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অল্পকাল পূর্ব্বেই বেদের সংগ্রহ ও বিভাগ সম্পন্ন হয়।

বিচিত্রবীর্য্য পরলোক গমন করিলে, সত্যবতী তাঁহার বিধবা পত্নীদিগের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য ব্যাসের প্রতি অনুমতি প্রদান করেন, তদনুসারে একের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, ও অন্যের গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মে। পাণ্ডু কৃষ্ণ বলরামের পিতৃভগিনী কুন্তীর ও মাদ্রীনাম্নী অন্য এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব এই পঞ্চ পুত্র জন্মে। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েরই সন্ততি কুরু-কুলজাত, কিন্তু সামান্যতঃ ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানেরা কৌরব ও পাণ্ডুর সন্তানেরা পাণ্ডব নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের পিতৃভগিনীর পুত্র, এজন্য পাণ্ডবদিগের সহিত কৃষ্ণের অতিশয় সখ্য ছিল।

যথাসময়ে শান্তনুর মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র ধৃতরাষ্ট্র, জন্মান্ধতা-দোষে, শাস্ত্রানুসারে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত বলিয়া, কনিষ্ঠ পাণ্ডু হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই; ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্দশাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র, স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে বয়ঃকনিষ্ঠতা হেতু অতিক্রম করিয়া, অপেক্ষাকৃত বয়োধিক ভ্রাতৃপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। দুর্য্যোধন রাজ্যভোগে একান্ত লোলুপ ও যৎপরোনাস্তি দুষ্টস্বভাব ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রকৃতি তাহার একান্ত বিপরীত ছিল। যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাতে দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, সন্তোষ, ধর্ম্মভীরুতা প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণই যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া যুধিষ্ঠির-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। রাজ্যপ্রাপ্তিবিষয়ে দুর্য্যোধন অপেক্ষা যুধিষ্ঠিরের বয়োধিকতা যেরূপ উপযোগী ছিল, ধার্ম্মিকতাও তদনুরূপ উপকারী হইয়াছিল। সে যাহা হউক, দুর্য্যোধন নিয়তই পাণ্ডবদিগের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রেরও

মত্ত করিয়া পাণ্ডবদিগের বধের এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, তিনি যে তাঁহাদের জীবনের প্রতি কোনরূপ হিংসায় সম্মত হইবেন তাঁহারা ইহা স্বপ্নেও জানিতেন না। এজন্য তাঁহার পরামর্শক্রমে, তাঁহারা কিয়ৎ কালের জন্য রাজ্যের নানাবিষয়িণী চিন্তার সহিত হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করিয়া বারণাবত-নামক রম্য স্থানে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। এদিকে বারণাবতের যে গৃহে তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের তথায় উপস্থিতির পূর্ব্বে, সেই গৃহে অগ্নি সংযোগ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার তাবৎ উদ্দ্যোগ সম্পন্ন করা হইয়াছিল। অগ্নি প্রয়োগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা সেই বিষম বিপদের সংবাদ পাইয়া তথা হইতে গোপনে বহির্গত হইলেন; এবং হস্তিনাপুরে সকলেই তাঁহাদের প্রতিকূল ও বিনাশ-সাধনে তৎপর, ইহা ভাবিয়া ছদ্মবেশ অবলম্বনপূর্ব্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনেরা, গৃহদাহের পর পাণ্ডবেরা ভস্মীভূত হইয়াছেন মনে করিয়া পরমাহ্লাদে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে পঞ্চাল* দেশে কাম্পিল্য নগরে দ্রুপদ রাজার দুহিতা দ্রৌপদীর বিবাহ উপস্থিত হইল। তদুপলক্ষে নানাদিগ্দেশীয় রাজা ও বীর পুরুষেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বিবাহে এই পণ ছিল, যিনি শরদ্বারা এক

---

* দিল্লীর উত্তর ও পশ্চিম দিকে হিমালয় পর্ব্বত ও চর্ম্মণ্বতী নদীর অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ পঞ্চাল নামে খ্যাত ছিল। পঞ্চাল দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; উত্তর ও দক্ষিণ পঞ্চাল। উত্তর পঞ্চালের প্রধান নগর মাকন্দি ও কাম্পিল্য, দক্ষিণ পঞ্চালের প্রধান নগর অহিচ্ছত্র।

নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, দ্রৌপদী তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। পরমসুন্দরী দ্রৌপদীর পাণি-গ্রহণ-লালসায় সকলেই লক্ষ্যভেদের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে এক হীনবেশ পুরুষ, ধনুর্ব্বিদ্যায় অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া, লক্ষ্য ভেদ করিলেন। দ্রৌপদী তাঁহারই হইলেন। এই হীনবেশ পুরুষ অর্জ্জুন। অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে স্বস্থানে লইয়া আসিয়া পঞ্চ ভ্রাতায় মিলিয়া বিবাহ করিলেন। কোন্ প্রথা বা কোন্ কারণ অনুসারে এক নারী পঞ্চ ভ্রাতার ধর্ম্মপত্নী হইলেন, বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয় অতিপূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে, অধুনাতন তিব্বতদেশীয় বিবাহপ্রণালী নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল না; এই বিবাহও সেই প্রথানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকিবে; নতুবা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে কেবল মাতৃ-আজ্ঞাক্রমে এইরূপ বিবাহ ঘটিয়াছিল, তাহা কোনক্রমেই সম্ভব বোধ হয় না।

অতঃপর প্রকাশ হইয়া উঠিল, অর্জ্জুন ও তাঁহার চারি ভ্রাতা বর্ত্তমান আছেন। দিন দিন পাণ্ডবদিগের যশো-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে আহ্বান করিলেন এবং সমুদায় রাজ্য সমান বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ দুর্য্যোধন ও অপরার্দ্ধ যুধি-ষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন। দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন; যুধিষ্ঠির ঐ নগরের প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমে ইন্দ্রপ্রস্থ-নামক নগরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। অধুনা ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লী নামে খ্যাত। ইন্দ্র-প্রস্থ অচিরকাল মধ্যেই হস্তিনাপুরের সমান সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। যুধিষ্ঠিরের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তৃত হইল। অবশেষে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভিন্ন সামান্য নরপতির এই যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকার ছিল না। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ায় আপনাকে অন্যান্য রাজাদিগের অপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইল। মগধাধিপ জরাসন্ধের বহুকাল অবধি সার্ব্বভৌমত্বের অভিমান ছিল; তিনি ঈর্ষাদগ্ধ-চিত্তে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-ব্যাঘাতের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে এক দল সৈন্য দিয়া, কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে, জরাসন্ধের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সেনাগণ, গুপ্তভাবে পর্ব্বত-পথে আসিয়া, সহসা জরাসন্ধের রাজধানী অবরুদ্ধ করিল। জরাসন্ধের যুদ্ধের কোন উদ্যোগ ছিল না, তথাপি তিনি বিলক্ষণ বীরতা সহকারে তিন দিবস যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে শত্রুহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন।

জরাসন্ধ ভিন্ন অন্য কেহই যুধিষ্ঠিরের প্রভুতা অস্বীকার করিতে সাহস করেন নাই। সুতরাং রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে ও মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হইল। তাহাতে নানা দিগ্দেশীয় রাজা আহূত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের খ্যাতি প্রতিপত্তির আর পরিসীমা রহিল না। যজ্ঞ সমাপন হইলে, দুর্য্যোধন দারুণ ঈর্ষাবিষাক্ত-হৃদয়ে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিলেন। লোকে যুধিষ্ঠিরের যত সুখ্যাতি কীর্ত্তন করে ততই দুর্য্যোধনের পামর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। তিনি আবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তথাপি তাঁহার অক্ষ-ব্যসন অতিশয় প্রবল ছিল। দুর্য্যোধন সেই অক্ষ দ্বারাই তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধন-সঙ্কল্প করিলেন। দুর্য্যোধনের অনুরোধে যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ে

পণ করিয়া খেলিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ক্রমশই পরাস্ত হন, তথাপি প্রতিনিক্ষেপেই 'এইবার জিতিব' এই মোহে ক্রমে ক্রমে রাজ্য, ধন প্রভৃতি সমস্ত বিসর্জ্জন দিলেন; অবশেষে, বহুকালের জন্য, পঞ্চপাণ্ডবের নির্ব্বাসন পর্য্যন্ত পণ করিয়া খেলিতে লাগিলেন, তাহাতেও পরাস্ত হই-লেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া, চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, হীনবেশে ভ্রমণকরিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল। তৎ-পরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পণ ছিল। সেই অনুসারে পাণ্ডবেরা বিরাট-নামক রাজ্যে অতিসংগোপনে আপন আপন প্রকৃত নাম গোপন পূর্ব্বক অন্য নাম ধারণ করিয়া, নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর যমুনার সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে আসিয়া, আপনাদের রাজ্য চাহিবার নিমিত্ত, দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করি-লেন। দুর্য্যোধন তাঁহাদের প্রার্থনায় অবজ্ঞা করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমিও দিবেন না। সুতরাং যুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না।

স্থানেশ্বর নগরের সন্নিধানে কুরুক্ষেত্রে এই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই বিপুল সংগ্রামে যাবতীয় চন্দ্রবংশীয় রাজারা কুরুপাণ্ডবদিগের অন্যতর পক্ষে সহায়তা করেন। নির্ব্বাসনসময়ে পাণ্ডবেরা নানাস্থানীয় রাজগণের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদের সহকারীর অপ্র-তুল ছিল না। ফলতঃ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যেখানে যত প্রধান প্রধান রাজা ছিলেন, সকলেই সসৈন্যে আগমন করত, অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। প্রথিত আছে অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ ও সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষের অসংখ্য সেনার নিধন হয়। অবশেষে,

দুর্য্যোধন হত হইলে, যুদ্ধের অবসান ও যুধিষ্ঠিরের জয়-ঘোষণা হইল। কিন্তু সেই জয়োল্লাস অচিরকাল মধ্যেই বিষাদে পরিণত হইয়া উঠিল। যখন রণভূমির চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া যুধিষ্ঠির দেখিলেন অসংখ্য জ্ঞাতিবর্গ ও অপরাপর ব্যক্তির মৃতকায়, গণ্ডশৈলের ন্যায়, পতিত ও তাহাদের শোণিতে মেদিনী রঞ্জিত রহিয়াছে, তখন তাঁহার নিতান্ত বিবেক ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইল।

তিনি দুর্য্যোধনাদির প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করিলেন ; কিন্তু তদনন্তর হস্তিনায় যাইয়া রাজপদ গ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অবশেষে কৃষ্ণের প্রবর্ত্তনায় তাহাও স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের অসুখ দূর হইল না। জ্ঞাতিবধে প্রভূত পাপ সঞ্চয় হইয়াছে এই আশঙ্কায় তিনি নিরন্তর অসুখী রহিলেন। পরিণামে পাপের প্রায়শ্চিত্ত-সঙ্কল্পে অশ্ব-মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। অনেক বিঘ্নের পর যজ্ঞ সম্পন্ন হইল।

কৃষ্ণ নিয়তই পাণ্ডবদিগের সহায়তা করিয়া আসিতে-ছিলেন। প্রথিত আছে তাঁহারই বুদ্ধিকৌশল পাণ্ডব-দিগের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়লাভের প্রবল হেতু। অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপনান্তে, কৃষ্ণ হস্তিনা হইতে স্বীয় রাজধানী দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল পরে দ্বারকা নগরে বিবিধ কুলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎসমুদায়ের শান্তির জন্য যদুবংশীয় পুরুষেরা তাবতে প্রভাস নামক তীর্থে উত্তীর্ণ হইলেন। এরূপ বর্ণনা আছে যে স্নানাদির পর সকলেই সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কথায় কথায় কলহ ও তদুপলক্ষে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাহাতে অধিকাংশই নিধন প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণ, চিন্তায় মগ্ন

হইয়া, একান্তে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ মৃগভ্রমে শরসন্ধান করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল।

যদুবংশীয়দিগের আত্ম-বিদ্রোহের আরম্ভেই কৃষ্ণ, অর্জুনের সন্নিধানে, দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অর্জুন আসিয়া দেখিলেন যদুকুল নির্ম্মূল হইয়াছে। পরম সুহৃৎ কৃষ্ণেরও মৃতকায় পতিত রহিয়াছে। তিনি অনেক শোক ও বিলাপ করিলেন; পরে, কৃষ্ণের নিরাশ্রয় নারীগণকে সঙ্গে লইয়া, হস্তিনাভিমুখে পরাবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে দস্যুদল উপস্থিত হইয়া স্ত্রীদিগকে হরণ করিল। একে কৃষ্ণের শোক, তাহাতে দস্যুহস্তে অবমানে অর্জুন যৎ-পরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। অবশেষে হস্তিনায় পঁহুছিয়া, যুধিষ্ঠিরকে তাবৎ অবগত করিলেন। যুধিষ্ঠির আদ্যোপান্ত শ্রবণে একবারে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের পর হইতেই তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল; এক্ষণে পরম মিত্র কৃষ্ণের বিয়োগে তাঁহার আরও ঔদাসীন্য উপস্থিত হইল। তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত, হিমালয়ের পরপারে প্রস্থান করিলেন। হিমালয়ের যে ভাগ দিয়া যুধিষ্ঠির প্রস্থান করেন সেই ভাগকে মহাপ্রস্থান কহে।

রামের কীর্ত্তিসমূহ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এই দুই ব্যাপার কোন্ কোন্ সময়ে ঘটে তাহার কিছুই অবধারণ নাই। পরন্তু ইয়ু-রোপীয় পুরাবিদেরা, বিবিধ যুক্তিদ্বারা, প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টীয় শাকারম্ভের চতুর্দ্দশশতাব্দী

পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত এরূপ অপরিজ্ঞেয়, অসম্বদ্ধ ও গোলযোগে আবৃত যে তাহা হইতে কোনরূপ বিবরণ সঙ্কলন করা দুঃসাধ্য। এই মাত্র স্পষ্ট জানা যায় যে, পরীক্ষিতের সন্তান-পরম্পরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, এদিকে জরাসন্ধ-তনয় সহদেবের সন্তানেরা মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় রহিলেন।

সহদেব হইতে চৌত্রিশ জন রাজার পর, মগধ-সিংহাসনে অজাতশত্রু আরোহণ করেন। ইঁহারই রাজত্বকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্থাপন-কর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধদেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বুদ্ধকে গৌতম ও শাক্যসিংহও বলিয়া থাকে। নানাপ্রকারে সপ্রমাণ হইয়াছে বুদ্ধ, খৃষ্টের প্রায় ৫৫০ বর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন।

বুদ্ধ, প্রথমতঃ বিবিধ তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া অবশেষে স্বনাম-খ্যাত ধর্ম্মের ঘোষণা আরম্ভ করিলেন। তিনি, বেদাদি শাস্ত্রের অলীকতা ও কর্ম্মকাণ্ডের অসার্থকতা প্রদর্শন করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণে একমাত্র যুক্তিরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন, এবং জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ লোকদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম গ্রহণে আহ্বান করেন। সুতরাং তিনি হিন্দুধর্ম্মের পরম শত্রু হইয়া উঠেন; এজন্য হিন্দুরা তাঁহাকে নাস্তিক ও ধর্ম্মবিলোপক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মে অতি পবিত্র বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যুক্তিহীন কিছুই মান্য করিতেন না। কোন জাতি যতই কেন প্রাচীন সংস্কারের পরতন্ত্র হউক না, চিরাগত মতের বিরুদ্ধে প্রবলতর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিলে, পরিণামে অবশ্যই অন্ততঃ কিয়দংশেরও মত-পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠে।

এই হেতুবশতঃ বুদ্ধের মত ক্রমশই পরিগৃহীত এবং তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অজাতশত্রুর পর, চারি জন রাজা ক্রমশঃ বিগত হইলে, নন্দ নামে সুপ্রসিদ্ধ ভূপতি মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশই ইঁহার অধিকৃত হয়। ইনি স্বয়ং শূদ্র-জাতীয় ছিলেন; ক্ষত্রিয়দিগকে অতিশয় উৎপীড়ন করিতেন।

—০—

তৃতীয় অধ্যায়।

আদিমকালীন ম্লেচ্ছ রাজাদিগের ভারতবর্ষআক্রমণ।

মুসলমান পুরাবিদদিগের মতে, পারস্যের রাজারা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ডেরা-য়সের পূর্ব্বে পারস্য-রাজাদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। ডেরায়স খৃষ্টের ৫১৮ বৎসর পূর্ব্বে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং লিবান্ট সাগর হইতে সিন্ধুপর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া উঠেন। পরে স্বর্ণভূমি ভারত-বর্ষ অধিকার করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হন এবং বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া, সিন্ধুর সমীপবর্ত্তী রাজা-দিগকে পরাস্ত ও তাঁহাদের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। তিনি ভারতবর্ষের কত দূর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন অধুনা তাহার অবধারণ হয় না। কিন্তু বর্ণনা আছে

তাঁহার সমস্ত রাজস্বের অন্যূন তৃতীয়াংশ কেবল ভারত-বর্ষ হইতেই উৎপন্ন হইত। ভারতবর্ষের যে ভাগ ডেরায়সের অধিকৃত হয়, তাঁহার মৃত্যুর পর, উহা কত কাল তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের হস্তগত ছিল তাহার সবিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ডেরায়সের আক্রমণের কিঞ্চিদূন শত বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃঃপূ ৩৩৩ অব্দে, মাসিডনের সুপ্রসিদ্ধ বীর আলেক্জণ্ডর, ভুবনবিজয়-সঙ্কল্পে, পারস্য-সাম্রাজ্য অধিকারের পর, ভারতবর্ষে উপস্থিত হন; এবং পঞ্জাব জয় ও অতিক্রম করিয়া অনুগঙ্গ প্রদেশে আসিবার মানস করেন। কিন্তু তাঁহার সেনারা ক্রমাগত দীর্ঘকাল রণক্ষেত্রের ক্লেশ সহ্য করিয়া এরূপ বিরক্ত হইয়াছিল যে তাহারা কিছুতেই আর আসিতে স্বীকার করিল না। অগত্যা আলেকজণ্ডরকে মহাক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিগমন করিতে হইল। প্রতিগমন কালে তিনি, বহুসংখ্যক রণতরি লইয়া, সিন্ধুনদী বাহিয়া সমুদ্রাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। স্থলপথেও কিয়দংশ সৈন্য তরিশ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল এবং সিন্ধুর তটস্থ দেশ সকলে মাসিডনের পতাকা উড্ডীন করিল। বহুকাল বিলম্বে তরিশ্রেণী সমুদ্রে উপস্থিত হইল। তখন আলেকজণ্ডর অকর্ম্মণ্য জাহাজ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অবশিষ্ট ভাগে প্রায় দশ সহস্র সৈন্য আরোহিত করিয়া নিয়র্কস নামক সেনানীকে সিন্ধুর মোহানা হইতে সমুদ্র দিয়া ইউফ্রেটিস পর্য্যন্ত পথ আবিষ্কারের জন্য প্রেরণ করিলেন; স্বয়ং স্থলপথে বেলুচিস্তানের অভ্যন্তর দিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সকল ঘটনার পর আলেকজণ্ডর অধিককাল জীবিত থাকেন নাই। তাঁহার পরলোক গমন হইলে, তাঁহার সেনাপতিরা

তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য বিভক্ত করিয়া লইলেন এবং তন্মধ্যে এক জন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে, বাক্‌ট্রিয়া নামক প্রদেশে একটী গ্রীকরাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। সেই রাজ্যের রাজারা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডের স্থানে স্থানে আধিপত্য করিয়াছিলেন। ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে আলেক্‌জণ্ডর প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারীদিগের হইতেই ইয়ুরোপীয়েরা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম বিবরণ প্রাপ্ত হন। এজন্য ইয়ুরোপীয়দিগের লিখিত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে আলেক্‌জণ্ডরের এতদ্দেশ আক্রমণ এক অতি প্রধান ঘটনা।

—•••—

চতুর্থ অধ্যায়।

আলেক্‌জণ্ডরের সময় হইতে মুসলমানদিগের আক্রমণের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের বিবরণ।

যৎকালে আলেক্‌জণ্ডর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন সেই সময়ে পাটলিপুত্র নগরে* মগধ-সিংহাসনে নন্দ-রাজার বংশোদ্ভব মহানন্দ নামে রাজা অধিরূঢ় ছিলেন। প্রথিত আছে তিনি বিংশতি সহস্র অশ্ব, দুই লক্ষ পদাতিক ও বহুসংখ্যক হস্তী সংগ্রহ করিয়া আলেক্‌জণ্ডরের প্রতিকূলে

---

* প্রথিত আছে বলরাম এই নগর স্থাপন করেন। অনেকে অনুমান করেন, অধুনা যেখানে পাটনা, পূর্ব্বে সেই খানেই পাটলিপুত্র অবস্থিত ছিল।

যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই বৈদেশিক আক্রমণকারী আপনা হইতেই প্রস্থান করিলেন।

মহানন্দের আট পুত্র ছিল। তন্মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত এক ক্ষৌরকার-পত্নীর গর্ভসম্ভূত ছিলেন। তাঁহার সুজাত ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত, স্বীয় মন্ত্রী চাণক্যের বুদ্ধিকৌশলে, ভ্রাতাদিগকে বিনাশ করিয়া, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন। তিনি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠেন এবং গ্রীকেরা অনুসিন্ধু প্রদেশে যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল তত্তাবৎ প্রতিগ্রহণ করেন। তাঁহার মন্ত্রী চাণক্য অতীব পণ্ডিত ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন; রাজনীতি-প্রয়োগে ইনি এরূপ চাতুর্য্য ও কৌটিল্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাকে চক্রী মন্ত্রীদিগের গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। চাণক্যের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আছে। আর বিবিধ-উপদেশ-পূর্ণ বহু-সংখ্যক শ্লোক চাণক্য-শ্লোক নামে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অতিশয় প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু সেই সকল বাস্তবিক তাঁহারই রচিত অথবা তাঁহার নামে মাত্র পরিচিত, তাহার অবধারণ করা যায় না। খৃষ্টের কিঞ্চিন্ন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত প্রাদুর্ভূত হন।

কালক্রমে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অশোকের আর একটী নাম প্রিয়দর্শী। তাঁহার সময়ে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যেরও অনেক স্থান মগধের অধিকৃত ছিল। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং সেই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অতিশয় যত্নবান্ হন। যাহাতে বুদ্ধের মত ও তাঁহার অনুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বদ্ধমূল

হয় তদুদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অশোক অনেক অনু-শাসন-পত্র প্রেরণ করেন। অধুনা সেই সকলের বহু-সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টান মিসনরিদিগের ন্যায় বৌদ্ধদিগের নিয়মিত ধর্ম্মপ্রচারক ছিল। ধর্ম্মপ্রচারকেরা ও পুরোহিতেরা শিরোমুণ্ডন, পীত বসন পরিধান ও ত্রিদণ্ডধারণ করিতেন। তাঁহারা চির-কৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বী ছিলেন এবং বিহার-নামক নিভৃত ধর্ম্মশালায় অনেকে একত্র অবস্থিতি করিতেন। পুরুষদিগের ন্যায় অনেক স্ত্রীও চিরকাল অবিবাহিতা থাকিতেন এবং সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিহারে আশ্রয় লইতেন। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই এক বিহারে বাসের অধিকার ছিল না।

অশোক বৌদ্ধদিগের তৎকালীন বিহারসকলে অনেক অর্থ প্রদান করেন এবং তাঁহার পুত্র সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং একজন প্রধান ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া উঠেন। অশোক ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহাকে লঙ্কাদ্বীপে প্রেরণ করেন। এদিকে অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রচারকেরা হিমালয় পর্ব্বত পারে তিব্বত, তাতার, চীন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হন। ফলতঃ অশোকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি হয়। তিনি লোকান্তর গমন করিলে পরও অন্যান্য রাজাদিগের আনুকূল্যে বৌদ্ধধর্ম্মই বহুকাল ভারতবর্ষের ও আসিয়ার অধিকাংশের প্রবল ধর্ম্ম হইয়া উঠে।

অশোকের মৃত্যু হইতে রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অতিশয় অস্পষ্ট ও অপরিজ্ঞেয়। কিম্বদন্তী, উপন্যাস প্রভৃতির অস্পষ্ট আলোকে এই মাত্র প্রতিভাত হয় যে, ঐ দীর্ঘ কালের শেষ ভাগে, ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে এক নূতন রাজবংশ প্রবল

হইয়া উঠে। সেইবংশীয় রাজারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধদিগের বিদ্বেষী ছিলেন। বিপুলশোণিতবর্ষী বহুল সংগ্রামের পর ইহাঁদের দৌরাত্ম্যে বৌদ্ধেরা অনেকে নির্ব্বাসিত ও অধিকাংশ নিহত হয় এবং ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রবল হইয়া উঠে। উজ্জয়িনী নগর সেই রাজকুলের রাজধানী ছিল এবং সেই বংশে সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য প্রাচুর্ভূত হন।

খৃষ্টের ছাপ্পান্ন বর্ষ পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন এবং তদবধি তাঁহার প্রচলিত শাকের গণনা হইয়া আসিতেছে। এই শাকের নাম সম্বৎ। বিক্রমাদিত্য অতিশয় প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহারও রাজত্বের কোন ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে তিনি প্রজাদিগের মঙ্গলবর্দ্ধনে নিয়ত তৎপর ছিলেন এবং তজ্জন্যই এপর্য্যন্ত তাঁহার নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সম্মান ও আদর পূর্ব্বক গৃহীত হইয়া থাকে। তিনি বিদ্যার অতিশয় সমাদর করিতেন। তাঁহার সভা সমস্ত ভারতবর্ষের বিদ্যাবিশারদদিগের আরামস্থল ছিল। সেই সমুদায়ের মধ্যে নয় জন সর্ব্বপ্রধান পদে অধিরূঢ় ছিলেন। সেই নয় জন নবরত্ন নামে প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস সেই নবরত্নের সর্ব্বপ্রধান রত্ন ছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের পরে শালিবাহন নামে রাজা প্রবল হইয়া উঠেন। ইনি মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান অধিকার করেন। ইনিও এক শাক প্রচলিত করিয়াছেন; সেই শাক শকাব্দাঃ নামে খ্যাত। উহা সম্বতের আদি হইতে ১৪৩ বৎসর পরে আরব্ধ। এরূপ কিম্বদন্তী আছে, শালিবাহন বিক্রমাদিত্যের প্রাণসংহার

করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্ভব বোধ হয় না, যেহেতু তিনি বিক্রমাদিত্যের ১৩৪ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন।

শালিবাহনের রাজত্ব হইতে মুসলমানদিগের আক্রমণের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে উজ্জয়িনীর রাজাদিগের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। পূর্ব্ব খণ্ডে প্রায় পাঁচ শত বৎসর কাল, মগধের সিংহাসন অন্ধ্রবংশীয়দিগের অধিকৃত দেখা যায়। যত সূক্ষ্ম গণনা করা যাইতে পারে তদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়, খৃঃশাকের বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে অন্ধ্রেরা মগধের রাজচ্ছত্র প্রথম ধারণ করেন। ইহাঁরা অতিশয় পরাক্রান্ত ও বিখ্যাত হইয়া উঠেন। ইহাঁদের খ্যাতি রোম নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রোমক গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই বংশে ১৯১ খৃঃঅব্দে শূদ্রক নামে এক অতি প্রবলপ্রতাপ নরপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁকে কর্ণদেব ও মহাকর্ণও বলিয়া থাকে। অন্ধ্রবংশীয় শেষ রাজাদিগের সহিত চীন সম্রাটদিগের পরিচয়ের অনেক আভাস পাওয়া যায়। চীনেরা পুলমা নামে এক ভারতবর্ষীয় রাজার বর্ণনা করেন এবং তাঁহার নাম হইতে সমগ্র ভারতবর্ষকে পুলমন্ অর্থাৎ পুলমার দেশ কহেন। পুরাণেও অন্ধ্রবংশসম্ভূত পুলমন্ নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। হিমালয় পর্ব্বতের ওদিকেও ইহাঁর দিগ্বিজয়ের অনেক উল্লেখ আছে। চীনদিগের পুলমা, ও পুরাণের পুলমন্, বোধ হয়, এক ব্যক্তিই হইবেন।

অন্ধ্র রাজাদিগের পরে তাঁহাদের কর্ম্মসচিবেরা মগধরাজ্য অধিকার করেন। তদবধি মুসলমানদিগের আক্রম-

মণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত থাকে। সেই সকল রাজ্যের রাজাদিগের পুরাবৃত্তের কিছুই পাওয়া যায় না, কেবল মালব দেশের একমাত্র রাজার নাম এপর্য্যন্ত অবিস্মৃত রহিয়াছে। ইনি ধারাবর নগরের সুপ্রসিদ্ধ ভোজ ভূপতি। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ভোজ রাজা প্রাদুর্ভূত হন। ইনি বিদ্যার অতিশয় সমাদর করিতেন। কিন্তু কতিপয় উপন্যাস ভিন্ন ইহারও কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এপর্য্যন্ত পুরাণাদির বিলোড়ন দ্বারা কেবল অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ ও মগধের কতিপয় মাত্র রাজার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের সমকালে আর্য্যাবর্ত্তে অন্যান্য যে সমস্ত রাজ্য ছিল তাহাদের পুরাবৃত্ত অপেক্ষাকৃত আরও অপবিজ্ঞেয়। এজন্য নিম্নে সেই সকল রাজ্যের মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির নাম ও কোন্ রাজ্যের কোন্ সময়ে শেষবার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে তন্মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাভারতে যে সমুদায় রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায় সেই সমুদায়ে (*) এই চিহ্ন সংযুক্ত হইল। পূর্ব্বকালে পঞ্জাব বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে কোন রাজ্যই বিশেষ বিস্তৃত ও পরাক্রান্ত ছিল না; এজন্য নিম্নে পঞ্জাবের নাম উল্লেখ করা গেল না। সে যাহা হউক, মুসলমানদিগের আক্রমণের প্রাক্কালে লাহোর রাজ্য বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজ্যের নাম।	শেষবার উল্লেখের সময়।
* গৌড়, বঙ্গ বা বাঙ্গালা	১২০৩ খৃঃঅঃ
মালব	১২৩১
* গুর্জ্জর	১২৯৭

* কান্যকুব্জ বা পঞ্চাল	১২৯৩
মিথিলা (ত্রিহুত)	১৩২৫
অজমীর (আজমীর)	১১৯২
মেওয়ার	এখনও বর্ত্তমান
জৈসলমিয়র	ঐ
জয়পুর	ঐ
* সিন্ধু	৭১১
কাশ্মীর	১০১৫
* কাশী	১১৯৭

পঞ্চম অধ্যায়।

দাক্ষিণাত্যের আদিম বিবরণ।

দাক্ষিণাত্যে উড়িয়া, তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, ও মহারাষ্ট্রী এই পাঁচটী প্রধান ভাষা প্রচলিত। বাঙ্গালার দক্ষিণ হইতে সমগ্র উড়িষ্যা দেশ উড়িয়া ভাষার স্থান। উত্তরে উড়িষ্যা, দক্ষিণে পলিকট হ্রদ, পশ্চিমে মহারাষ্ট্র দেশ এবং পূর্ব্বে বঙ্গসাগর এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশে তৈলঙ্গী ভাষা প্রচলিত। পলিকট হ্রদ হইতে কুমারিকা বেষ্টন করিয়া মলবার পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশে দ্রাবিড়ী ভাষা। উত্তরে বিদর, দক্ষিণে কোইম্বাটুর, পশ্চিমে পশ্চিম-ঘাটগিরি এবং পূর্ব্বে পূর্ব্ব-ঘাট এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ কর্ণাটী ভাষার প্রকৃত স্থান। মলবারের উত্তর হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সমুদায় উপকূলে এবং পূর্ব্বে হৈদরাবাদ, উত্তরে নাগপুর ও দক্ষিণে

সোলাপুর, ইহার মধ্যবর্ত্তী দেশে মহারাষ্ট্রী ভাষা প্রচলিত। অতি পূর্ব্বকালে উপরি উক্ত পাঁচ ভাষার নামানুসারে দাক্ষিণাত্য উড়িষ্যা, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র এই পাঁচ প্রধান খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে আদৌ দাক্ষিণাত্য জঙ্গলময় এবং অহিন্দু অসভ্য জাতিদিগের নিবাসস্থল ছিল। রামচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের ঐ ভাগে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করেন। তাঁহার সময় ও অশোক রাজার রাজত্ব, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে দাক্ষিণাত্য হিন্দুদিগের অধিকৃত ও অধিষ্ঠিত হইয়া উঠে। দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বদক্ষিণ ভাগ অন্যান্য ভাগের অপেক্ষা অধিক উর্ব্বর। সর্ব্বাগ্রে সেই প্রদেশেই হিন্দুদিগের উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদিগের আদিম উপনিবেশ সংস্থাপনের অনেক জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়।

পাণ্ড্য ও চল রাজ্য- প্রাচীন সময়ে, দাক্ষিণাত্যের নৈঋ‌র্ত কোণে, দ্রাবিড় দেশে পাণ্ড্য ও চল নামে দুই হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। অধুনা যে সকল স্থান মদুরা ও ত্রিনেল্লবলি জেলার অন্তর্গত, পূর্ব্বে সেই সমুদায় লইয়াই পাণ্ড্য রাজ্য সঙ্ঘটিত ছিল। উহার রাজধানী মদুরা নগর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। চল রাজ্য অপেক্ষাকৃত অনেক বিস্তৃত ছিল। অধুনা যে সকল স্থানে দ্রাবিড়ী (তামিল) ভাষা প্রচলিত, পূর্ব্বে সেই সমুদায় ভূভাগ এবং তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে, কর্ণাট ও তৈলঙ্গেরও অনেক অংশ, চলরাজ্যে পরিগণিত হইত। কাঞ্চী নাম নগরে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। অধুনা সেই নগরকে কঞ্জিবরম কহে। উপরি উক্ত দুই রাজ্যে নিয়তই পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ

চলিত। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের কিছুকাল পরে একবার সম্মিলন হয়। পরে আবার উভয়েই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে, এবং সময়ে সময়ে স্বাধীন থাকে, সময়ে সময়ে অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত রাজ্যের করদ-দশায় উপনীত হয়। অবশেষে, ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে পাণ্ড্য রাজ্য আর্কাড়ুর নবাবের অধিকৃত হয়; এবং ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে চল রাজ্য একজন মহারাষ্ট্রীয়ের হস্তগত হইয়া, তাঞ্জোর রাজ্য নামে অভিহিত হইয়া উঠে। আদৌ পাণ্ড্য ও চল উভয় রাজ্যই আর্য্যাবর্ত্ত-নিবাসী হিন্দুদিগের স্থাপিত।

চের রাজ্য—পাণ্ড্য রাজ্যের পশ্চিমে, আরব সাগরের উপকূলে, চের নামে ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ত্রিবাঙ্কোড়, মলবারের কিয়দংশ ও কোইম্বাটুর লইয়া এই রাজ্যের সঙ্ঘটন হয়। একদা ইহার রাজারা কর্ণাটের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। খৃঃ দশম শতাব্দীতে চের রাজ্য উৎসন্ন এবং ইহার যাবতীয় অধিকার, সন্নিহিত রাজ্য সমুদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া উঠে।

কেরল রাজ্য—পূর্ব্বকালে মলবার ও কানাড়া কেরল রাজ্য নামে খ্যাত ছিল। প্রথিত আছে ক্ষত্রিয়শত্রু সুপ্রসিদ্ধ পরশুরাম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া কেরলে স্থাপন করেন। এখানে ব্রাহ্মণদিগের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ও তাঁহাদিগের স্থাপিত একটী সভা ছিল, সেই সভার মতানুসারে সমুদায় রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কালক্রমে একজন ক্ষত্রিয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত হয়। পরিণামে মলবার ও কানাড়া দুই স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মলবারের রাজা মুসলমান-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করাতে প্রজারা রাজদ্রোহী হইয়া মলবারের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের স্থাপন করে। তন্মধ্যে

কল্লিকট্টের তাম্বুরীদিগের* রাজ্য অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। খৃঃ দ্বাদশ শতদীতে কানাড়া রাজ্য বিলাল-বংশীয় রাজাদিগের দ্বারা উৎসন্ন হয়। অবশেষে বিজয় নগরের অধিপতিরা সেই রাজ্য আত্মসাৎ করেন।

কর্ণাট—বিবিধ হেতুতে অনুমিত হয়, আদৌ সমস্ত কর্ণাট এক রাজার অধীন ছিল। কিন্তু পুরাবৃত্তে যত দূর বর্ণনা আছে তাহাতে পূর্ব্বকালে ঐ দেশ পাণ্ড্য, চের ও কানাড়ার রাজাদিগের মধ্যে বিভক্ত দেখা যায়। কাল-ক্রমে কর্ণাট বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভাজিত হইয়া উঠে। পরিণামে বিলাল বংশীয় রাজারা প্রবল হন এবং সমুদায় ক্ষুদ্র রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া, সমস্ত মলবার ও দ্রাবিড় এবং তৈলঙ্গেরও কিয়দংশে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করেন। এই বংশীয় রাজারা আপনা-দিগকে যদুকুল-জাত বলিয়া পরিচয় দিতেন। ১৩১০।১১ খৃঃঅব্দে মুসলমানেরা বিলাল বংশের ধ্বংস করে।

রজঃপূত রাজ্য—কতিপয় অনুশাসন-পত্র দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ হইতে দ্বাদশ শতা-ব্দীর শেষভাগ, এই তাবৎ কাল কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রের প্রান্তভাগে কল্যাণনাম নগরে চালুক্য-গোষ্ঠীয় রজঃপূত রাজাদিগের রাজ্য ছিল। একদা ইহারা নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণবর্ত্তী সমগ্র মহারাষ্ট্রে আধিপত্য করেন, অবশেষে ইহাঁদের রাজ্য দেবগিরির † রাজাদিগের হস্তগত হয়।

কলিঙ্গের চালুক্য রাজবংশ – তৈলঙ্গের পূর্ব্ব ভাগকে কলিঙ্গ কহিত। তথায়ও চালুক্য রজঃপূতদিগের আধি-পত্য ছিল। বোধ হয় ইহারা কল্যাণ নগরের চালুক্য-

---

* ইংরাজী ভাষায় তাম্বুরী রাজারা জমরীন নামে খ্যাত।
† অধুনা এই নগরের নাম দৌলতাবাদ।

দিগেরই গোষ্ঠী হইবেন। খৃঃ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহাঁদের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। তৎপরে ইহাঁদিগকে অন্ধ্রদেশীয় গণপতি রাজারা পরাভূত, এবং অবশেষে কটকের রাজারা উৎসন্ন করেন।

গণপতি রাজ্য—হৈদরাবাদের প্রায় পঁয়ত্রিশ ক্রোশ ঈশান কোণে বরঙ্গল নামে নগর ছিল। তাহার সন্নিহিত যাবতীয় ভূভাগকে অন্ধ্রদেশ কহিত; ইহা তৈলঙ্গেরই অন্তর্ব্বর্ত্তী। বোধ হয় মগধের অন্ধ্র রাজারাও আদৌ এই দেশসম্ভূত ছিলেন। অন্ধ্রদেশে এই কিম্বদন্তী আছে যে, অতি পূর্ব্বকালে সেই দেশ বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের অধীন ছিল, পরে চল রাজ্যের রাজারা তদ্দেশ অধিকার করেন। তদনন্তর নয় জন যবন রাজার বর্ণনা আছে। তদবসানে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে, গণপতি বংশীয় রাজাদিগের রাজত্বের আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গণপতি রাজাদিগের চরম প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। ১৩৩২ খৃঃঅব্দে মুসলমানেরা ইহাদিগকে অতিশয় উৎপীড়িত করে, পরে ইহাঁরা উড়িষ্যার করদ হন। অবশেষে গোলকুণ্ডার মুসলমানরাজারা ইহাঁদের উচ্ছেদ সম্পন্ন করে।

উড়িষ্যা—ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাগের ন্যায় উৎকলেরও আদিম বিবরণ অতিশয় অস্পষ্ট। ৪৭৩ খৃঃঅব্দের পূর্ব্বের কিছুই জানা যায় না বলিলেই হয়। ঐ বৎসর কেশরী বংশীয় এক জন রাজা উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তদবধি ১১৩১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরেরা রাজত্ব করেন। তৎপরে গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই বংশের আদি পুরুষ তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশ হইতে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন। কালক্রমে গঙ্গাবংশীয়েরা অতিশয় পরা-

ক্রান্ত হইয়া উঠেন। ইহাঁরা উড়িষ্যার বহির্ভাগে অনেক স্থান অধিকার করিয়াছেন। এমন কি, একদা উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত ইহাদের রাজ্যের বিস্তার হইয়াছিল। এই বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব কালে, ১১০৯ খৃঃ অব্দে, জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। কাল সহকারে গঙ্গাবংশীয়েরা হীনপ্রভাব হইয়া আসিলে, এক রজঃপূত বংশ তাঁহাদিগকে সিংহ-সন-চ্যুত করে। সেই রজঃপূত বংশের শেষ রাজা মুকুন্দ দেবের সময়ে দিল্লীর পাঠানেরা উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিল। পরে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং সেই সুযোগে, ১৫৫০ খৃঃ অব্দে তৈলঙ্গ দেশীয় একজন রাজা উড়িষ্যা অধিকার করেন। অবশেষে ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া আইসে।

মহারাষ্ট্র—মুসলমানদিগের রাজত্বের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। এই মাত্র জানা যায় যে, এখানে শালিবাহন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। আর, খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যদুবংশোদ্ভব রাজারা দেবগিরি নগরে আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৩১৭ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে উৎসন্ন করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আদিম ভারতবর্ষীয়দিগের সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অতিশয় অসম্পন্ন ও কল্পিত উন্যাসে কলুষিত সত্য বটে, তথাপি আদিম

কালের হিন্দুকুলের অভ্রান্ত দর্পণস্বরূপ বিবিধ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য নহে। তৎসমুদায়ে আদি পুরুষদিগের যেরূপ চরিত্র প্রতিবিম্বিত হয় অধুনাতন হিন্দুদিগের মধ্যে তাহার অধিক অনুকৃতি দেখা যায় না। প্রাংশু ও বামনে, বলী ও ক্ষীণে যত বৈলক্ষণ্য, আদিম ও আধুনিক হিন্দুতে তদপেক্ষাও অধিক। পূর্ব্বপূর্ব্বকালে বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যবংশের সাহসিকতা, বাগ্‌নিষ্ঠা, সারল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠাদর্শনে বিস্মৃত ও চমৎকৃত হইতেন ; অধুনা হিন্দুদিগের ঐ সকল গুণের অভাবই প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তখন হিন্দুরা দিগ্‌বিজয়ে নির্গত হইয়া সময়ে সময়ে তাতার, চীন প্রভৃতি দেশে আপনাদিগের পতাকা উড্ডীন করিতেন ; অধুনা বহুদূর হইতে এক ক্ষুদ্র দ্বীপের কতিপয় সৈনিক আসিয়া ভারতভূমির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। তখন হিন্দুরা স্বজাতীয় ভিন্ন সকলকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন ; অধুনা সেই ম্লেচ্ছরা আসিয়া আর্য্যসন্তানগণের উপরে নিয়ত অবজ্ঞা বর্ষণ করিতেছে। তখন হিন্দুদিগের অর্ণবতরি সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে নিয়ত গতায়াত করিত, অদ্যাপিও আবার সন্নিহিত বালিদ্বীপে তাহার ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় ; অধুনা সমুদ্র-গমনের নামেই হিন্দুদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং কেহ কোন রূপে যাইলে তিনি সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আইসেন। সঙ্ক্ষেপ বিবরণ এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য, নতুবা স্পষ্ট প্রদর্শন করা যাইতে পারিত যে ইদানীন্তন হিন্দুরা শৌর্য্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে আদি পুরুষদিগের হইতে নিতান্ত হীন হইয়া আসিয়াছেন।

শৌর্য্যাদির হ্রাসের সহিত সামাজিক ব্যবস্থাতেও

অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। অধুনা হিন্দু-সীমন্তিনীগণ, দাসীর ন্যায় ব্যবহৃত, বন্দীর ন্যায় অবরুদ্ধ ও ইতর জন্তুর ন্যায় নিরক্ষর দৃষ্ট হয়। কিন্তু সার্দ্ধ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অবলোকন করিলে স্ত্রীদিগকে আদরণীয়, শিক্ষণীয় ও অনেক পরিমাণে অনবরুদ্ধ দেখা যায়। তখন বাল্যবিবাহ কোথায়! কেহই চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের ন্যূন বয়সে দারপরিগ্রহ করিতেন না। আর স্বয়ংবরের প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে স্ত্রীদিগেরও অধিক বয়সে বিবাহ হইলে কেহই চতুর্দ্দশ পুরুষ নিরয়গমনের বিভীষিকায় ভীত হইতেন না। কিন্তু তখন শূদ্রদিগের প্রতি অতিশয় কঠিন নিয়ম ছিল, অধুনা তাহার অনেক শৈথিল্য হইয়া আসিয়াছে।

পূর্ব্বকালে যখন প্রায় সমুদায় মেদিনী ঘোর মূর্খতা-রজনীতে আচ্ছন্ন ছিল, তখনও ভারতবর্ষে বিদ্যার নির্ম্মল আলোক কোন রূপেই নিষ্প্রভ ছিল না। তীক্ষ্ণমনীষা-সম্পন্ন হিন্দুরা দর্শনশাস্ত্রে অতি আদিম কালে যে সকল মত উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন এখনও ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তৎসমুদায় লইয়া আন্দোলন করিতেছেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় আদিম হিন্দুদিগের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল; তাঁহারা বিষুব-সংক্রান্ত তাবৎ তত্ত্ব এবং গ্রহণের প্রকৃত হেতু অবগত ছিলেন। গ্রহণ-গণনারও উৎকৃষ্ট সঙ্কেত উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। আদিম বুধগণের মধ্যে কেহ কেহ মেরুদণ্ডের উপরে পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্ত্তন আবিষ্কার করেন এবং কেহ কেহ অপরিস্ফুটরূপে মাধ্যাকর্ষণেরও প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। বীজগণিত-শাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দুরা অনেক আবিষ্ক্রিয়া করেন এবং সেই সকলের কোন কোন তত্ত্ব পরশ্চমাত্র ইয়ুরোপে প্রকাশ

হইয়াছে বলিলেই হয়। ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রেও তাঁহাদের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। ঐ শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ইয়ুরোপের যাবতীয় বিদ্যার আদিম উদ্ভাবক গ্রীকজাতি হিন্দুদিগের অপেক্ষা বিস্তর ন্যূন ছিল। এমন কি, কত কাল হিন্দুরা যে সকল তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইয়ুরোপে তাহার অনেক তত্ত্বের বিন্দু বিসর্গও জ্ঞাত ছিল না। পাটীগণিতে হিন্দুরাই দিগ্দিগন্তরব্যাপিনী দশগুণোত্তর অঙ্কলিখনপ্রণালীর উদ্ভাবন করেন।

দর্শন ও গণিতে প্রাচীন হিন্দুরা যত দূর ব্যুৎপন্ন ছিলেন তর্ক ও শব্দ শাস্ত্রে তদপেক্ষ ন্যূন ছিলেন না। আর ভাষাবিদ্দিগের মতে সংস্কৃতের ন্যায় সুশ্রাব্য সুললিত ও সুসম্পন্ন ভাষ ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। ব্যাকরণের যত নৈপুণ্য ও চাতুর্য্য সম্ভব, এই ভ ষায় প্রচুর পরিমাণে তত্তাবৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন ভাব নাই যাহা ইহাতে প্রকাশ করা যায় না। ইহার ছন্দোমঞ্জরীতে অশেষবিধ ছন্দশ্চাতুর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবম্বিধ ভাষা পাইয়া সুনির্ম্মল-মনীষাসম্পন্ন প্রাচীন হিন্দুরা যে বিস্তর মধুর কাব্য রচনা করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অধুনা বহুায়ত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সংস্কৃত কাব্যের যশঃসৌরভ জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়াছে এবং ইহা সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে। পারে যে যাবৎ মানব কুলের কাব্যরসে স্বাদ ও আস্থা ই থাকিবে তাবৎ বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিকুল কথনই বিস্মৃত বা অনদৃত হইবেন না।

সপ্তম অধ্যায়।

মুসলমানদিগের উৎপত্তি ও দিগ্‌বিজয়।

খৃষ্টীয় ৫৬৯ অব্দে মুসলমান-ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা মহম্মদ, আরব দেশের অন্তর্গত মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন আরবেরা বহুসংখ্যক স্ব স্ব প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এবং নানাপ্রকার সাকার দেব-দেবীর, বিশেষতঃ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির অরাধনা করিত। মহম্মদ স্বভাবতই ঈশ্বরতত্ত্ব চিন্তনে অনুরক্ত ছিলেন। বহুকালের প্রগাঢ় চিন্তার পর, তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল পরমেশ্বর অদ্বিতীয় ও নিরাকার, তিনিই মনুষ্যের একমাত্র উপাস্য। হৃদয়ে এই নির্ম্মল তত্ত্ব উদিত হইলে, কিরূপে উহা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিবেন তাহারই কল্পনায় নিমগ্ন হইলেন। অনতিক্রম্য বিষয়কর্ম্ম-সকল হইতে যে মাত্র অবসর পাইতেন অমনি সন্নিহিত হিরাপর্ব্বতের নিভৃত গুহায় আসীন হইয়া অনন্যমনে স্বমতের প্রচারোপায়ের অনুধ্যান ও পরমেশ্বর চিন্তনে ব্যাপৃত হইতেন। অবশেষে চত্বারিংশ বর্ষ বয়সে তিনি প্রথমতঃ আত্ম পরিবারের নিকটে প্রচার করিলেন 'পরমেশ্বর অদ্বিতীয় ও নিরাকার; লোকের ভ্রম উচ্ছেদ করিয়া সংসারে সত্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি আমাকে অবনীতে প্রেরণ করিয়াছেন। তৎপ্রেরিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-দিগের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ, তিনি আমাকে কোরাণ নামে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সকল ধর্ম্মের সার সঙ্কলিত আছে।" আত্মপরিবারবর্গ স্ব-মতে আনীত হইলে

তিনি প্রকাশ্যরূপে প্রচার আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পরিলেন না। প্রাচীন মতাবলম্বীরা তাঁহার অতিশয় বিদ্বেষী হইয়া উঠিল এবং অবশেষে প্রাণ বধের সঙ্কল্প করিল। মহম্মদ ভয়ে মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করিলেন। এখানে অনেকে আদর পূর্ব্বক তাঁহার মত গ্রহণ করিল এবং ক্রমশঃ তিনি মদিনার রাজা হইয়া উঠিলেন। মহম্মদ স্বীয় শিষ্যদিগের নাম মুসলমান অর্থাৎ ভক্ত এবং তদ্ভিন্ন যাবতীয় মনুষ্যের নাম কাফর অর্থাৎ ধর্ম্মভ্রষ্ট রাখিলেন।

মহম্মদের মদিনায় পলায়নের দিবস হইতে মুসলমানদিগের হিজিরা শকের আরম্ভ। উহা খৃষ্টীয় ৬২২ অব্দে সম্পন্ন হয়। ইতিপূর্ব্বে মহম্মদ ধর্ম্ম-প্রচার বিষয়ে যুক্তিমূলক তর্ক মাত্র অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন, মদিনায় যাইয়া আর এক প্রকার তর্ক অবলম্বন করিলেন। তথায় স্বীয় শিষ্যগণকে কাফরদিগের বিনাশের জন্য তরবারি ধারণের আজ্ঞা দিয়া, কহিলেন পরমেশ্বর সম্প্রতি আদেশ করিয়াছেন ভ্রান্তির উচ্ছেদ জন্য খড়্গ-ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য, এই মহৎকার্য্য সাধনের জন্য যে সকল মুসলমান সমরশায়ী হইবেন তাঁহারা বিবিধ বিলাসবস্তু-সমন্বিত স্বর্গধামে যাইয়া, কজ্জলনয়না অপ্সরাগণের সহবাসে, পরম সুখে কালহরণ করিবেন ; কিন্তু রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে, পরকালে নরকে পতিত ও দুঃসহ দুঃখ-দাবদাহে অজস্র দগ্ধীভূত হইতে থাকিবেন। আরব জাতি স্বভাবতই নির্ভীক ও সমরপ্রিয় ; তাহাতে ইহলোকে শত্রুর ধন লুণ্ঠন ও পরলোকে প্রাগুক্তরূপ সুখভোগের প্রত্যাশা পাওয়াতে মুসলমানদিগের খড়্গ সর্ব্বত্রই অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে লাগিল, সমস্ত আরব মহম্ম-

দের অধীন হইল এবং তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই কাবুল হইতে স্পেন পর্য্যন্ত তাবৎ দেশে মুসলমানপতাকা উড্ডীন হইয়া উঠিল। যেরূপ স্বল্পকালের মধ্যে এক রাজ্যের পরেই অন্য রাজ্য, এক দেশের পরেই অন্য দেশ প্রাথমিক মুসলমানদিগের পদানত হইয়াছিল, পুরাবৃত্তে সেরূপ আর কখনই দেখা যায় নাই। ঈদৃশ দিগ্বিজয়োন্মত্তেরা যে অতুল সম্পদের আকর ভারতবর্ষ লাভে লোলুপ হয় নাই ইহ কখনই সম্ভব নহে। ফলতঃ খলিফা অর্থাৎ মহম্মদের উত্তরাধিকারীরা প্রথম হইতেই ভারতবর্ষের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন এবং কয়েক বার আক্রমণেরও প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু খৃষ্টীয় ৭১০ অব্দের পূর্ব্বে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

খৃঃ ৭০৫ হইতে ৭১৫ অব্দ পর্য্যন্ত, ডামস্কস নগরে ওয়ালিদনামা পুরুষ খলিফীয় সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত দেওয়াল নামক স্থানে একখানা আরবী জাহাজ ধৃত হয়। সেই অর্ণবতরির মোচনের জন্য সিন্ধুপতি ডাহিরের নিকট আবেদন আসিলে, তিনি উত্তর পাঠান দেওয়াল তাঁহার অধীন নহে। খলিফাদিগের বস্রার শাসনকর্ত্তা সেই উত্তরে অসন্তুষ্ট হন ...৬,০০০ সৈন্যের সহিত মহম্মদ কাসিমকে সিন্ধুরাজ্য ...ণের জন্য প্রেরণ করেন। তখন কাসিমের বয়ঃক্রম ...ত বর্ষমাত্র। কাসিম দেওয়ালে পঁহুছিয়া তন্নগর ...রপূর্ব্বক, সিন্ধুনদী পার হইয়া, সিন্ধুরাজ্যের তদা... রাজধানী আলোরনগরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ...ময় পারস্য হইতে ২,০০০ অশ্বারোহী আসিয়া কাসি...র সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল। এদিকে ডাহির ৫০,০০০

সৈন্য লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কাসিম সৈন্য-সংখ্যায় আপনাকে দুর্ব্বল দেখিয়া, এক দুরাক্রম্য স্থান মনোনীত করিয়া, তথায় হিন্দুদিগের আক্রমণ প্রতিঘাতের প্রতীক্ষায় রহিলেন। দৈব তাঁহার অনুকূল হইল। তাঁহার সেনাদিগের নিক্ষিপ্ত একটা জ্বলৎ গোলা আসিয়া রাজার হস্তীকে আহত করাতে হস্তী একান্ত ভীত হইয়া রণস্থল হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজসেনারা, রাজা পলায়ন করিলেন ভাবিয়া, চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। পরে দৃষ্ট হইবে যে, এইরূপ দুর্দ্দৈব হেতু ভারতবর্ষীয়েরা, জয়লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও, অনেক বার মুসলমান-দিগের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। হস্তী কিঞ্চিৎ শান্ত হইবামাত্র রাজা, অবরোহণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া, সেনাদিগকে পুনর্ব্বার একত্র করিবার জন্য বিস্তর নিষ্ফল প্রয়াস পাইলেন। অবশেষে, প্রচুর সাহসিকতা প্রকাশ করিয়া শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন; পরে রাজধানী আক্রান্ত হইল, কিন্তু ডাহিরের পত্নী স্বামীর অনুরূপ সাহস অবলম্বন করিয়া নগর রক্ষার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে আহার সামগ্রীর অপ্রতুল হইয়া উঠিল। তখন শত্রুহস্তে পতনের অপেক্ষা মরণ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া তিনি নগরবাসীদিগকে তাহার আয়োজন করিতে কহিলেন। সকলে সম্মত হইল; সর্ব্বত্র চিতা প্রজ্বলিত হইয়া উ স্ত্রী ও শিশুরা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল নন্তর পুরুষেরা স্নানাদি সমাপন করিয়া, অসিহস্তে ব হইয়া, অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক হইল। এই সকল ঘটনার পর আর এক সংগ্রাম হ তাহাতেও কাসিম জয়ী হইয়া, ডাহির রাজার সমস্ত রা অধিকার করেন। বশ্যতা স্বীকার করিলে মুসলমানে

প্রজাদিগের ধর্ম্মের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিত না।
সিন্ধুদেশেও সেই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়াছিল।

সিন্ধুদেশের জয়াবসানে কাসিম ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে
প্রবেশের উদ্‌যোগ পাইতেছিলেন, এমন সময়ে, একস্ত্রীর
চাতুর্য্যজাল তাঁহার কাল হইয়া উঠিল। সমরশেষে সিন্ধু
দেশে যে সমস্ত স্ত্রী বন্দী হয় তন্মধ্যে রাজা ডাহিরের দুই
দুহিতা ছিল। ইহারা যেমন উচ্চকুলজাতা তেমনি অসা-
ধারণ রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিল। কাসিম ইহাদিগকে খলি-
ফার উপযুক্ত উপঢৌকন জ্ঞান করিয়া তৎসন্নিধানে প্রেরণ
করিলেন। মুসলমানপতি জ্যেষ্ঠার রূপে মোহিত হইয়া
তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অমনি সে
বিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া কহিল হায়! আমি এক্ষণে
আর ভবৎসদৃশ জনের অনুরাগের যোগ্য নহি, কাসিম
পূর্ব্বেই আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে। খলিফ ভৃত্যের ঈদৃশ
ব্যবহার শ্রবণমাত্র, ক্রোধান্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন কাসি-
মকে চর্ম্মে বদ্ধ করিয়া আমার সন্নিধানে আনয়ন কর।
আজ্ঞা সম্পন্ন হইলে, খলিফা রাজকুমারীকে কাসিমের শব
প্রদর্শন করিলেন। তখন সে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে কহিল,
কাসিম সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী; জনকজননীর মৃত্যু ও তাঁহাদের
প্রজাবর্গের অবমাননার প্রতিশোধ দিবার জনাই আমি
তাহার এরূপ মিথ্যাপবাদ করিয়াছিলাম (৭১৪)।

ভারতবর্ষে কাসিম যে সমস্ত জনপদপরাজয়করেন তৎসমু-
দায় পঁয়ত্রিশ বৎসর মুসলমানদিগের অধীন থাকে, তদব-
সানে হিন্দুরা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক উহাদিগকে বহিষ্কৃতকরিয়া
দেন এই সকল ব্যাপারের দুই শতাব্দীর অনধিক কাল
মধ্যেই খলিফাদিগের নাম ও গৌরবের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট
থাকে, কিন্তু তাহাদের সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন এবং তাহা

হইতে অনেক স্ব স্ব প্রধান রাজ্য সমুদ্ভূত হয়। তৎসমুদা-য়ের মধ্যে সামনি নামক পুরুষের স্থাপিত রাজ্য বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়া উঠে এবং ১২০ বৎসর অভগ্ন থাকে। সামনি রাজ্য পারস্যের পূর্ব্বভাগ লইয়া সঙ্ঘটিত হয়।

সামনি রাজ্যের পঞ্চম রাজার আলপ্তগিন নামে এক দাস ছিল। রাজা তাহাকে বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ দেখিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর পদে অভিষিক্ত এবং অবশেষে পারস্যের উত্তরভাগে, খোরাসানের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। সেই রাজার মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারী কোন বিশেষ কারণে, আলপ্তগিনকে কর্ম্মচ্যুত করেন এবং তাঁহার জীবন নাশেরও সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠে। তথা আলপ্তগিন, আপনার নিতান্ত বিশ্বাসী অনুচরবর্গ সমভি ব্যাহারে আসিয়া, অধুনাতন আফগানিস্তানের দুরাক্রম পার্ব্বতীয় প্রদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং গজনি নগর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তথায় শত্রুকুল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। তিনি গজনির সন্নি হিত প্রদেশে চতুর্দ্দশ বর্ষ রাজত্ব করেন।

সবক্তগিন নামে আলপ্তগিনের এক দাস ছিল আলপ্তগিন স্বয়ং যেমন হীন অবস্থা হইতে উন্নত পদ আরোহণ করেন এ ব্যক্তিরও পক্ষে সেইরূপ ঘটিয়াছিল ইনি স্বীয় প্রভুর দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রভুর মৃত্যুর পর নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। সবক্তগিন লাহোর-পতি জয়পালকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত গজনি রাজ্য বিস্তৃত করেন। পরে ৯৯৭ খৃঃঅব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। তখন প্রথমে তাঁহার পুত্র ইস্মেল পিতৃসিংহাসনে অধি-রোহণ করেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে ইস্মেলের সুপ্রসিদ্ধ

ভ্রাতা মামুদ, তাঁহাকে পরাভব করিয়া, আপনি অধীশ্বর হন। মুসলমানদিগের মধ্যে ইহাঁরই দৌরাত্ম্যে সর্ব্ব-প্রথম ভারতবর্ষ বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, এবং ইহাঁরই পর হইতে হিন্দুদিগের স্বাধীনতা, কৃষ্ণপ্রতিপ-চ্চন্দ্রমার ন্যায়, ক্রমশই ক্ষয়গ্রস্ত ও বিলুপ্ত হইয়া আইসে। সেই দুঃখকাহিনী কথনের পূর্ব্বে মামুদের রাজ্যাভিষেক কালে আর্য্যাবর্ত্তে কোন্ কোন্ রাজ্য প্রধান পদে গণিত ছিল, সংক্ষেপে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

কাসিমের ভারতবর্ষ আক্রমণ সময়ে উজ্জয়িনীর সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠে। তুয়ারবংশীয় রাজারা দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিকে অনেক স্থান অধিকার করেন। গুর্জ্জর স্বাধীন হইয়া প্রথমতঃ চৌর-বংশীয়, পরে সোলাঙ্কি-বংশীয় রাজাদিগের অধিকৃত হয়, পত্তন নগরে ঐ রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। উদয়পুর রাজ্য ক্রমশঃ বহুবিস্তৃত হইয়া উঠে। এ সমুদায় ভিন্ন আজমীর, কালিঞ্জর, কনোজ ও গোয়ালিয়ার রাজ্য বিলক্ষণ প্রতাপশালী ছিল। বাঙ্গালাদেশে বৈদ্যবংশীয় সেন উপাধিধারী রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। মামু-দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব সময়ে বঙ্গাধিপ আদিশূর কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চের সন্ততি বাঙ্গা-লার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক্ষণে প্রধান; আর তাঁহাদের পাঁচ ভৃত্য হইতেই কায়স্থ জাতির উৎপত্তি।

অষ্টম অধ্যায়।

সুলতান মামুদ।

মামুদ ত্রিংশ বর্ষ বয়সে গজনির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মধ্যমাকার, সুঘটিত ও বীর-কলেবর ছিলেন, কিন্তু বসন্তরোগে তাঁহার মুখশ্রী বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে পারস্যের পশ্চিমের রাজ্য সকল যাদৃশ বিশৃঙ্খল হইয়াছিল তাহাতে সাহসী, বিচক্ষণ, যুদ্ধ-কুশল ও অধ্যবসায়শালী মামুদ, সঙ্কল্প করিলে, সহজেই ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি যেমন ঐ সকল গুণান্বিত ছিলেন তেমনি, অন্ততঃ লোকতঃ মুসলমান-ধর্ম্মে একান্ত ভক্ত, দেব দেবীর অর্চ্চনার দারুণ বিদ্বেষী এবং যৎপরোনাস্তি অর্থ-পিশাচ ও গৌরবাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন। ভারতবর্ষ তাঁহার তাবৎ আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের প্রকৃত ক্ষেত্র ছিল। সুতরাং তদ্দেশ লুণ্ঠনেই তাঁহার চিত্ত সমধিক আকৃষ্ট হইল। তদনুসারে রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে, ১০০১ খৃঃঅব্দে, কাবুল নদীর অববাহিকায় সসৈন্য আসিয়া পেশোয়ার নগরের সন্নিকর্ষে উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় লাহোর-পতি জয়পালও উপস্থিত ছিলেন। ইনি পরাস্ত ও কারারুদ্ধ হইলেন। তদনন্তর মামুদ সমস্ত পঞ্জাব পর্য্যটন পুরঃসর বটিন্দা নগর লুণ্ঠন করত পেশোয়ারে প্রতিগত হইলেন। তথায় জয়পাল নিষ্ক্রয় দান ও রাজস্ব প্রদান অঙ্গীকার করিলে তাঁহাকে তাবৎ হিন্দুবন্দীর সহিত মোচন করিয়া, গজনি যাত্রা করিলেন। এদিকে জয়পাল যবন-হস্তে পরাভব হেতু মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি আপন রাজ-

ধানীতে আসিয়া, পুত্র অনঙ্গপালকে সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক, স্বয়ং অগ্নি প্রবেশ দ্বারা দেহের সহিত সমস্ত মনস্তাপ ভস্মীভূত করিলেন।

অনঙ্গপাল পিতার অঙ্গীকার পালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার একজন অধীন ভূপতি, দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ মামুদের নিকট অঙ্গীকৃত রাজস্বের নিজ অংশ প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। মামুদ তচ্ছ্রবণে সিন্ধুপারে আসিয়া তাঁহাকে উৎসন্ন করিয়া গেলেন। মূলতানের সামন্তের দর্প দলন জন্য মামুদকে তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আসিতে হইল। মূলতান, মামুদের অধীন এক জন পাঠান বংশীয় মুসলমানের হস্তগত ছিল। কিন্তু সে ব্যক্তি মামুদের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া অনঙ্গপালের সহিত মিলিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অনঙ্গপাল সেই মিত্রের পক্ষ হইয়া মামুদের আগমন রোধের প্রয়াস পান। কিন্তু সমরে পরাস্ত হইয়া কাশ্মীরে পলায়ন করেন। অনন্তর মামুদ মূলতান অবরোধ করিলেন। এদিকে সংবাদ আসিল তাতারেরা আসিয়া তাঁহার পৈতৃক অধিকারের উত্তর ভাগ আক্রমণ করিয়াছে। এমন সময়ে মুলতানের সামন্ত বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মামুদ তদানীং তাহাতেই সম্মত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাতারেরা পরাভূত ও দূরীকৃত হইল। তখন মামুদ আবার ভারতবর্ষের দিকে মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলেন।

এবার অনঙ্গপালের নির্যাতনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এদিকে অনঙ্গপালও সুষুপ্ত ছিলেন না। মুসলমানেরা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ধ্বংস ও হিন্দু-ধর্ম্মের বিলোপ সঙ্কল্প করিয়াছে এবং লাহোর গ্রহণ

করিতে পারিলেই অমনি অন্যান্য ভাগ আক্রমণ করিবে; সুতরাং সকলে একযোগ হইয়া ম্লেচ্ছদিগের দমন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে এই বলিয়া, তিনি সমুদায় প্রধান প্রধান হিন্দু রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আবেদনও নিষ্ফল হয় নাই। দিল্লী, কনোজ, উজ্জীন, গোয়ালিয়ার, কালিঞ্জর প্রভৃতির রাজারা অনঙ্গপালের সহিত একযোগ হইলেন; রাশি রাশি সেনা আসিয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হইল। মামুদ তাদৃশ আকস্মিক বলোপচয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার উদ্দেশেই পেশোয়ারের সন্নিধানে অবস্থিত রহিলেন। দিন দিন হিন্দুসৈন্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দূরদেশ হইতেও হিন্দু মহিলাগণ, হীরকাদি বিক্রয় ও স্বর্ণালঙ্কার দ্রবীভূত করিয়া যুদ্ধের সংস্থান পাঠাইতে লাগিলেন, এবং গোক্কুর ও অন্যান্য সমর-কুশল জাতিরা তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমান-শিবির এমন অবরুদ্ধ করিল যে, তাহাদিগকে আত্মরক্ষার্থ পরিখা খনন করিতে হইল। কিন্তু তখনও মামুদের সাহস অন্তর্হিত হয় নাই; তিনি হিন্দুশিবিরে একদল কৃতহস্ত ধনুর্দ্ধর প্রেরণ করিলেন। গোক্কুরেরা ইহাদিগকে একবারেই দূর করিয়া দিল এবং বহুসংখ্যক তীব্রবেগে, নগ্নশিরে ও নগ্নপদে, ধাবমান হইয়া শত্রু-কটকে প্রবেশপূর্ব্বক, অসি ও ছুরিকা দ্বারা, চক্ষুর নিমিষ মধ্যে, অশ্ব ও আরোহী হতাহত করিয়া অন্যূন তিন সহস্রকে যমালয়ে প্রেরণ করিল।

অতঃপর মুসলমান শিবির হইতে একটা জ্বলৎকন্দুক অথবা তীক্ষ্ণ শর আসিয়া হিন্দু-সেনানায়ক অনঙ্গপালের হস্তীর অঙ্গে বিদ্ধ হইল। মাতঙ্গ রণক্ষেত্র হইতে রাজাকে পৃষ্ঠে করিয়া পলায়ন করিল। অমনি হিন্দুসৈন্য ছত্র-

ভঙ্গ হইয়া পড়িল। মামুদ বহুসংখ্যকের প্রাণ বধ করিলেন এবং সেই পলায়মানদিগের অনুসরণে আসিয়া পঞ্জাবের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তথা হইতে যাইয়া কোট কাঙ্‌ড়ার সন্নিহিত নগরকুটের মন্দিরের বহুকাল-সঞ্চিত বিপুল সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া, গজনিতে পরাবৃত্ত হইলেন এবং তিন দিবস মহা মহোৎসব করিয়া তৎসমুদায় প্রদর্শন পূর্ব্বক, প্রজাপুঞ্জের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

১০১০ খৃঃঅব্দে মামুদ পঞ্চম বার ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হন এবং মূলতান প্রদেশ অধিকার করিয়া যান। পর বর্ষে আবার ভারতবর্ষে আসিয়া থানেশ্বর নগর লুণ্ঠন ও অসংখ্য হিন্দুকে বন্দী করিয়া স্বস্থানে পরাবর্ত্তন করেন। তদনন্তর দুইবার অবরোহণ করিয়া ভূলোক-স্বর্গ কাশ্মীরের লুণ্ঠনের প্রয়াস পান। তদবসানে কিছু কাল স্বীয় রাজ্যের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশে যাত্রা করেন। তথায় জাইহুন ও সাইহুন নদীর অন্তর্বর্ত্তী যাবতীয় ভূভাগ আত্মসাৎ করিয়া আবার ভারতবর্ষে আগত ও দস্যুবৃত্তির অনুসরণে প্রবৃত্ত হন।

পূর্ব্বের অষ্টম বারের আক্রমণে পঞ্জাবই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। অনন্তর, পুনঃ পুনঃ জয়লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া, তিনি অন্তর্গঙ্গ প্রদেশের সম্পত্তি হরণ সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে, ১০১৭ খৃঃ অব্দে, ১,০০,০০০ অশ্ব ও ২০,০০০ পদাতিক সমভিব্যাহারে পেশোয়ার হইতে নির্গত হইয়া, হিমালয়ের তলে তলে আসিয়া, যমুনা অতিক্রম করিলেন। পরে দক্ষিণমুখীন হইয়া, অকস্মাৎ প্রবল প্রবাহের ন্যায়, সুপ্রসিদ্ধ কান্যকুব্জে উত্তীর্ণ হইলেন। তত্রত্য রাজার যুদ্ধের কোন আয়োজন ছিল না, তিনি আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন দেখিয়া মামুদের

শরণাপন্ন হইলেন। মামুদ তাঁহার সহিত মৈত্রী করি-লেন এবং তদীয় নগরের অণুমাত্র অনিষ্ট না করিয়া, উত্তরাস্যে যাইয়া, মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তথায় বিংশতি দিবস অবস্থিতি করিয়া নগরের সর্ব্বস্বাপহরণ এবং বহুসংখ্যক বন্দী গ্রহণপূর্ব্বক প্রীত হইলেন।

মামুদের সহিত মৈত্রীনিবন্ধন কনোজরাজ হিন্দুভূপাল-সমাজে ঘৃণা ও নিগ্রহের ভাজন হইয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে গজনিপতি, শরণাগতের প্রতিপালন সঙ্কল্পে, দশম বার ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কালিঞ্জরাধিপতি কনোজ-রাজের প্রাণসংহার সম্পন্ন করেন। মামুদ সেই মিত্রহন্তার বিরুদ্ধেই চলিলেন। কিন্তু কেবল এবারে কিছুই করিতে পারিলেন না এমন নহে, পর বৎসর আর একবার আসিয়াও বিফল-প্রযত্ন হইয়া ফিরিয়া গেলেন। মামুদ যখন দশমবার ভারতবর্ষে আগমন করেন, লাহোরপতি অনঙ্গপালের উত্তরাধি-কারী দ্বিতীয় জয়পাল তাঁহার পথরোধের প্রয়াস পাই-য়াছিলেন। সেই অপরাধচ্ছলে মামুদ সমগ্র লাহোর-রাজ্য গজনির অধীন করিলেন। সিন্ধু নদীর এ পারে মুসলমান রাজত্বের সেই প্রথম সূত্র।

১০২৪ খৃঃ অব্দে মামুদ আবার ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। এই তাঁহার শেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ অভি-নির্যাণ। গুর্জ্জর প্রদেশে সাগরকূলে সোমনাথ নামে অতিশয় জাগ্রৎ মহাদেবের মন্দির ছিল। তথায় দিগ্‌দিগন্তর হইতে অসংখ্য যাত্রী সমাগত হইত এবং বহুকাল হইতে বিপুল সম্পত্তি সঞ্চিত হইয়া আসিতে ছিল। অর্থগৃধ্নু মামুদ সেই সম্পত্তি অপহরণ উদ্দেশে মূলতানে উপস্থিত হইলেন। তথায় অন্তর্ব্বর্ত্তী মরুস্থলী

অতিক্রমণের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে অর্ব্বলী পর্ব্বত-প্রস্থে, আজমীর নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার পঁহুছিবার পূর্ব্বেই আজমীরের রাজা ও নগর-বাসীরা পলায়ন করিয়াছিলেন। মামুদ নগর লুণ্ঠন করিলেন; পরে অর্ব্বলীর পশ্চিম প্রান্ত ধরিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া গুর্জ্জরের রাজধানী পত্তন নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানকার রাজাও নগর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মামুদ তথায় অধিক কাল বিলম্ব না করিয়া সোমনাথ-পত্তনের অভিমুখীন হইলেন। পঁহুছিয়া দেখিলেন, সোমনাথের মন্দির তিন দিকে সাগর-পরিখায় বেষ্টিত, চতুর্থ দিক এক সুরক্ষিত যোজক দ্বারা মূল গুর্জ্জরের সহিত যুক্ত। মুসলমানেরা বার বার ধাবিত হইল, মন্দির-রক্ষকেরাও বিপুল সাহসের সহিত তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল। তৃতীয় দিবসে সন্নিহিত রাজারা সোমনাথের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন। মামুদকে মন্দিরের অবরোধ স্থগিত করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল; এমন সময়ে পত্তনপতি আসিয়া হিন্দুদিগের সপক্ষ হইলেন। মুসলমানেরা হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িল। তখন মামুদ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বীয় দেবতার বন্দনা করিলেন। তদনন্তর লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া, স্বীয় সেনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেনারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না; প্রত্যুত তাহারা এমন বেগে ধাবিত হইল যে, প্রতিপক্ষেরা আর নিবারণ করিতে পারিলেন না। হিন্দু সৈন্যের প্রায় পঞ্চ সহস্র ভূতল-শায়ী হইল, অবশিষ্টেরা পোতারোহণে পলায়ন করিল।

মন্দির-মধ্যে প্রবেশিয়া মামুদ তাহার শোভা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। প্রথিত আছে সুনিপুণ কারুকার্য্য ও বিবিধ উজ্জ্বল মণি সমন্বিত ষট্‌পঞ্চাশৎ স্তম্ভোপরি মন্দিরের ছাদ নির্ম্মিত ছিল; সেই ছাদের মধ্যস্থলে বিলক্ষণ স্থূল স্বর্ণশৃঙ্খলে একমাত্র দীপ লম্বমান ছিল। সেই দীপের আলোক মণি-পরম্পরায় প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত প্রাসাদ উদ্দীপ্ত করিত। দেবদ্বেষী মামুদ স্বহস্তে সোমনাথের প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন। পাণ্ডারা অনেক বিনয় অনুনয় করিল এবং অবশেষে মূর্ত্তির রক্ষার জন্য বিস্তর অর্থ প্রদান করিতে চাহিল। মামুদ ক্ষণকাল ইতিকর্ত্তব্যতা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অমাত্যেরা অর্থ গ্রহণ পক্ষেই পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পরিশেষে মামুদ, "আমি প্রতিম-বিক্রেতার অপেক্ষা প্রতিমা-নাশক নামেই পরিচিত হইতে বাসনা করি" এই বলিয়া, দণ্ড উত্তোলন-পূর্ব্বক, আঘাত করিলেন, অমাত্যেরাও অবিলম্বে প্রভুর অনুবর্ত্তন করিলেন। মূর্ত্তি শূন্যগর্ভ ছিল, ভগ্ন হওয়াতে তন্মধ্য হইতে রাশীকৃত মহামূল্য মণি নির্গত হইল। সুতরাং মামুদ পাণ্ডাদিগের অঙ্গীকৃত নিষ্ক্রয় অপেক্ষাও অধিক লাভ করিলেন *। সোমনাথের

* মুসলমান পুরাবিদ ফেরেস্তা সোমনাথের বিষয়ে যেরূপ লিখিয়াছেন, মূলে তদনুরূপই লিখিত হইল, কিন্তু বস্তুতঃ সোমনাথ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট মূর্ত্তি ছিল না, উহা তিন হস্ত পরিমিত এক শিবলিঙ্গ মাত্র ছিল শিবলিঙ্গের অভ্যন্তর শূন্যগর্ভ ও তন্মধ্যে বিপুল সম্পত্তি লুক্কায়িত থাকা সম্ভব নহে। সংস্কৃত শাস্ত্রবিশারদ উইলসন সাহেবের মতে সোমনাথের উদরে মণি মুক্তাদি নিহিত থাকার বিবরণ নিরবচ্ছিন্ন অমূলক।

প্রতিমূর্ত্তির দুই খণ্ড মক্কা ও মদিনায়, আর দুই খণ্ড গজ্‌নিতে প্রেরিত হইল। চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মন্দিরের প্রকাণ্ড কপাট বহুকাল গজ্‌নিতে ছিল। সম্প্রতি লর্ড এলেনবরার সময়ে, ১৮৪২ খৃঃ অব্দে, গজ্‌নি ইংরেজদিগের অধিকৃত হইলে সেই কপাট পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আনীত হয়। অধুনা উহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। মামুদ গুর্জ্জরের জল বায়ু ও ভূমির উর্ব্বরতায় এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি একদা তথায় স্বীয় রাজধানী সংস্থাপনের কল্প করেন, কিন্তু অবশেষে, সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া, এক ব্রাহ্মণের হস্তে রাজত্বভার দিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। যাহা হউক, তাঁহার প্রতিগমনের অত্যল্প পরেই গুর্জ্জরবাসীরা প্রাচীন রাজকুলেরই বশীভূত হইল। মামুদ প্রতিগমনসময়ে সিন্ধুর দক্ষিণবর্ত্তী মরুস্থলে, প্রখর রৌদ্রে ও ক্ষুৎপিপাসায়, যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অনেকে উন্মত্ত প্রায় হইয়া প্রাণত্যাগ করে। মুলতান-নিবাসী যদুবংশীয়েরাও তাঁহার বিস্তর নিগ্রহ করিয়াছিল। অবশেষে বহু কষ্টে তিনি গজ্‌নিতে উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু যাদবদিগের দৌরাত্ম্য তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিল। পর বৎসর বহুসংখ্যক রণতরির সহিত আসিয়া তিনি তাহাদিগকে বিনাশ ও বন্ধন করিয়া একপ্রকার নির্ম্মূল করিয়া যান। ইহার পর তিনি আর ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। পারস্য রাজ্য দারুণ বিশৃঙ্খল হইয়াছিল; তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা সেই দিকেই নিয়োজিত হইল এবং তিন বৎসরের মধ্যে তিনি প্রায় তাবৎ অধিকার করিলেন। অবশেষে ১০৩০ খৃঃ অব্দে তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া উঠিল। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি যাবতীয় মহার্হ সামগ্রী

সম্মুখে বিন্যাস করিতে আদেশ করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সুলতান মামুদ আপনার সমকালবর্ত্তীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজা ছিলেন। তিনি গোঁড়া মুসলমান, সুতরাং হিন্দুদিগের দারুণ বিদ্বেষী ছিলেন এবং তাহাদের ধন প্রাণ অপহরণে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করেন নাই। প্রত্যুত তাহাতে পৌরুষ ও পুণ্য-সঞ্চয়ই জ্ঞান করিতেন। কিন্তু আপন প্রজাদিগের মধ্যে তিনি ন্যায়বান্ ও সর্ব্বথা প্রশংসনীয় রাজা ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে অনেক লোকের প্রাণ-সংহার করিয়াছিলেন বটে তথাপি তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলা যায় না। যেহেতু সম্মুখ সংগ্রামে ভিন্ন তিনি কখনই লোকের উপর উৎপীড়ন করেন নাই। তিনি বিদ্যার পরমোৎসাহী ছিলেন। গজনিতে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও বহুসঙ্খ্যক বিদ্যাবিশারদদিগের প্রতিপালন করেন। মামুদ আপন রাজধানী সুরম্য হর্ম্ম্যে অলঙ্কৃত করেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে তাঁহার অমাত্যেরাও ঐ বিষয়ে পরমোৎসাহী হইয়া উঠেন। তিনি বিলক্ষণ প্রফুল্লচিত্ত ও সকলেরই পক্ষে অধিগম্য ছিলেন। তাঁহার সদ্বিচার ও ন্যায়পরতার অনেক আখ্যান শ্রুত হইয়া থাকে।

একদা এক সামান্য পুরুষ আসিয়া অভিযোগ করিল, মহারাজ! এক সৈনিক বলপূর্ব্বক আমাকে আপন আলয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমার পত্নীর ধর্ম্ম নষ্ট করে।” মামুদ কহিলেন সে পুনর্ব্বার আসিলে সম্বাদ দিও। এক রজনীতে অভিযোগকারী আসিয়া সেইরূপ সম্বাদ দিল। মামুদ নিষ্কোষ অসি ধারণ পূর্ব্বক তাহার আলয়ে উপস্থিত

হইলেন। দেখিলেন লম্পট সৈনিক উপপত্নীর ক্রোড়ে নিদ্রিত রহিয়াছে। মামুদ দীপ নির্ব্বাণ করিতে আদেশ করিলেন। পরে এক আঘাতেই সৈনিকের প্রাণবধ করিয়া পুনর্ব্বার প্রদীপ জ্বালিতে কহিলেন। প্রদীপ আসিলে মামুদ সৈনিকের ছিন্ন মুণ্ড নিরীক্ষণ করিয়াই পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন। অভিযোগকারী জিজ্ঞাসিল "মহারাজ প্রথমেই প্রদীপ নির্ব্বাণ ও এক্ষণে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ প্রদানের কারণ কি!" মামুদ কহিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম আমার ভ্রাতৃপুত্রই এরূপ গর্হিত কর্ম্ম করে। পাছে তাহার মুখ দেখিলে বাৎসল্য-বশতঃ দোষের উপযুক্ত দণ্ড দিতে না পারি এই ভয়ে প্রথমে প্রদীপ নির্ব্বাণ করাইয়াছিলাম, এক্ষণে দেখিলাম সে নহে, এজন্যই পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি।"

—০—

নবম অধ্যায়।

মামুদের উত্তরাধিকারি-বর্গ।

সুলতান মামুদের দুই পুত্র ছিল, মহম্মদ ও মসায়ুদ। প্রথমে মহম্মদ রাজ্যাধিকার করেন কিন্তু অত্যল্প কাল পরেই মসায়ুদ তাঁহাকে পদচ্যুত, কারারুদ্ধ ও অন্ধ করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হন। কালসহকারে দৈব আবার মহম্মদের অনুকূল হয় এবং তিনি আর একবার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর গজনিতে অনেক উপপ্লব ও অন্যান্য ঘটনা উপস্থিত হয়, কিন্তু ভারত-

বর্ষের সহিত তৎসমুদায়ের অধিক সংস্রব নাই এবং সেই সমুদায় পাঠে বিরক্তি ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না, এজন্য তৎসমুদায়ের বিবরণ পরিত্যক্ত হইল।

মামুদের মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় রাজারা প্রায় দেড়শত বৎসর গজনিতে রাজত্ব করেন। পরে ১১৫২ খৃঃ অব্দে গোরীয় রাজারা তাঁহাদিগকে উৎসন্ন করেন। এই তাবৎকাল লাহোর নগর গজনির রাজাদিগের ভারত-বর্ষীয় অধিকারের প্রধান স্থান ছিল। কোন কোন রাজার সময়ে গজনির সেনারা অনুগঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্তও আক্রমণ করে। অবশেষে গজনির বিনাশ সম্পন্ন হইলে তত্রত্য শেষ দুই রাজার লাহোর মাত্র সম্বল থাকে এবং তাঁহারা তথায়ই আসিয়া অবস্থিতি করেন।

হিন্দুকুশ পর্ব্বত-প্রস্থে তিব্বত ও তুরানের সন্নিধানে গোর নামে প্রদেশ আছে। সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশের অধিবাসীরা অতিশয় কষ্টসহ। তাহাদের সাহায্যে গোরীয় সামন্তেরা ক্রমে ক্রমে গজনির প্রভুতা হইতে স্বাধীন হইয়া উঠেন এবং অবশেষে তাতার ও খোরা-সানের কোন কোন অংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। ১১১৮ খৃঃ অব্দে বেহ্রাম নামে পুরুষ গজনির সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। ইনি অসূয়া-পরবশ হইয়া চাতুর্য্যবলে তদানীন্তন গোরীয়পতির প্রাণ-সংহার করেন। সেই নৃশংস ব্যাপারের প্রতিশোধ-চেষ্টায় কয়েক বার গজনি ও গোরীয়দিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। অবশেষে ১১৫২ খৃঃঅব্দে, গোরীয়দিগের ভাগ্য প্রবল হইয়া উঠে। গোররাজ আলাউদ্দিন আসিয়া গজনি লুণ্ঠন এবং বহ্নি ও অসি দ্বারা উৎসন্ন করেন। কিন্তু তদ-নন্তর গোরে প্রতিগত হইয়া, কোন বৈদেশিক জাতির

আক্রমণে, আলাউদ্দিন অনবরত পাঁচ বৎসর ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। পরিণামে সেই বিপজ্জাল হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। তখন তাঁহার পুত্র গজ্‌নিরাজ্যের অধীশ্বর হন, কিন্তু অনধিক কাল মধ্যেই অপঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর ১১৫৭ খৃঃঅব্দে আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র গায়েস্‌-উদ্দিনগজ্‌নিরাজ্যের অধিপতি হইয়া, স্বীয় ভ্রাতা মহম্মদ সবাবুদ্দিনকে আপনার সহকারী করিলেন। সবাবুদ্দিন্ মহম্মদ গোরী নামেই অধিক খ্যাত। ইনি বারম্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং তথায় এত স্থান অধিকার করেন যে ইহঁাকেই ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রভুতার প্রকৃত স্থাপনকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।

গজ্‌নির বিনাশের পর বেহ্রামের পুত্র খসরু লাহোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহম্মদ গোরী প্রথমতঃ তদ্দেশ অধিকার ও খসরুকে সপরিবারে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। পরে গজ্‌নির রাজবংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃশঙ্ক হইয়া হিন্দু-স্বাধীনতার বিনাশ-সাধনে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার সেনারা পর্ব্বতবাসী, কষ্টসহ ও সমরচতুর; এদিকে হিন্দু রাজারা পরস্পর অনৈক্যদূষিত, তাঁহাদের সৈনাকুল অপেক্ষাকৃত শান্ত ও বিশৃঙ্খল; সুতরাং মহম্মদ স্বল্পায়াসেই জয়লাভ করিবেন আপাততঃ এরূপ বোধই হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। প্রায় কোন হিন্দু রাজাই ঘোর সংগ্রাম বিনা স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করেন নাই। বিশেষতঃ রজঃপুতেরা কখনই পরাভূত হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সম্পন্ন হইয়াছে; রজঃপুতেরা অদ্যাপিও স্বাধীন রহিয়াছে।

মহম্মদ গোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্ব্বে দিল্লীর রাজার মৃত্যু হয়। আজমীর ও কনোজ উভয়ত্রের রাজা-রাই তাঁহার দৌহিত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি আজমীর-পতিকেই দিল্লী রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ইহাতে কনোজরাজ মহাক্রুদ্ধ হইয়া বারম্বার আজমীরা-ধিপতির সহিত সংগ্রাম করেন। সেই সকল অন্তর্ব্বিবাদ মহম্মদের জয়লাভের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

মহম্মদ প্রথমতঃ দিল্লী ও আজমীরের তদানীন্তন অধিপতি পৃথুকে আক্রমণ করেন। থানেশ্বর ও কর্ণালের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। মহম্মদ সমরে তুরুস্ক-প্রণালী অবলম্বন করেন। সেই প্রণালীতে পার্ষ্ণি হইতে ক্রমাগত নূতন নূতন অশ্বদল শত্রুর সম্মুখীন হইয়া আক্রমণ করে এবং ক্লান্ত হইলেই পার্ষ্ণিদেশে চলিয়া যায়। হিন্দুদিগের প্রণালীতে সেনারা একত্র থাকে এবং শত্রুসৈন্যের পার্শ্বদেশ ঘুরিয়া একেবারে পরিবেষ্টন করিবার চেষ্টা পায়। এই যুদ্ধে হিন্দুপ্রণালীই অধিক ফলোপধায়িনী হইয়াছিল। সবাবুদ্দিন হিন্দু-ব্যূহের মধ্যভাগে নিয়ত আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রতিপক্ষেরা ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। সেই প্রক্রিয়ায় ও হিন্দুদিগের হস্তিযূথের ভীম-নাদে মুসলমানেরা একান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তাহাদের প্রধান প্রধান আমিরেরা অনেকে সদলে পলায়ন করিলেন। মহম্মদ অসীম সাহসে শত্রুসৈন্যের তুম্প বেশ ভাগ আক্রমণ করিয়া রাজার ভ্রাতাকে বিক্ষত করিলেন, অবশেষে স্বয়ং আহত হইয় পতনোন্মুখ হইলে অনু-চরবর্গ তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল। হিন্দুরা কিংশতি

ক্রোশ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়াইয়া গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

গজনিতে যাইয়া, কিছুকাল আমোদ প্রমোদের পর, মহম্মদ আবার ভারতবর্ষ আক্রমণের আয়োজনে তৎপর হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব বারের পরাভবের অবমান নিয়ত জাগরূক ছিল। তখন যে সকল আমির পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগের ভূয়োভূয়ঃ নিগ্রহ দ্বারা ভবিষ্যতে তাদৃশ আচরণের বিলক্ষণ প্রতিবিধানের পর মহম্মদ, বহুসঙ্খ্যক সমরকুশল সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা পৃথুও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সৈন্যের সহিত তাঁহার প্রত্যুদগমন করিলেন। উভয় দল সম্মুখীন হইলে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে পূর্ব্ব বারের পরাভব স্মরণ করাইয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন "পলায়ন ভিন্ন তোমাদের উপায়ান্তর নাই, মহম্মদ সদ্‌বুদ্ধির বশীভূত হইয়া তাহা করিলে আমরা তাঁহার উপর কোনরূপ উপদ্রব করিব না।" এই অহমিকায় চতুর মুসলমান ভয়ের ভান করিয়া উত্তর পাঠাইলেন, "আমার ভ্রাতা রাজা, আমি তাঁহার অধীন সেনানী মাত্র। ভ্রাতার অনুমতি বিনা আমার আপন ইচ্ছায় প্রতিগমনের সাধ্য নাই। অতএব যাবৎ সেই অনুমতি না আইসে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাবৎ কাল সন্ধিস্থাপন করিলে পরম আহ্লাদিত হই"। হিন্দুরা তচ্ছ্রবণে সর্ব্বথা সতর্কতা-পরিশূন্য হইয়া রজনীতে উৎসব করিতে লাগিলেন। মুসলমান সেনানী নিয়ত লক্ষ্য করিয়া যেমন দেখিলেন হিন্দুরা অতিশয় বীতশৃঙ্খল হইয়াছে, অমনি অন্ধকারের সুযোগে, তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু হিন্দুশিবির এরূপ বিস্তৃত ছিল যে কিয়দংশ সৈন্য

ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতেই অবশিষ্ট ভাগ ব্যূহীভূত হইয়া সম্মুখীন হইল। তখন মুসলমান সেনানায়ক জয়ক-চাতুর্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি পর্য্যায়ক্রমে একবার ধাবিত, আরবার পলায়িত হইতে লাগিলেন। অবশেষে সায়ংকালে হিন্দুদলকে নিতান্ত ক্লান্ত দেখিয়া আপাদ মস্তক বর্ম্মপরিহিত দ্বাদশ সহস্র অতি তেজস্বী অশ্বারোহী ধাবিত করিলেন। এপর্য্যন্তও ইহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই তাহাদের প্রথম উদ্যম। তাহারা এমন বেগে আক্রমণ করিল যে, আয়োধনশ্রান্ত হিন্দুরা আর নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাহাদের সেনা শ্রেণী-ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

এই সময়ে অনেক হিন্দু সামন্ত পতিত হইলেন। পৃথু রাজা কিছুকাল বন্দীদশায় থাকিলেন, অবশেষে মুসলমানদিগের নিষ্ঠুর হস্তে অপঘাতে প্রাণত্যাগ করি-লেন। আজমীর মুসলমানদিগের অধিকৃত হইল। উহার কিয়দংশ অধিবাসীর মস্তকচ্ছেদ, অবশিষ্ট দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ ও নির্ব্বাসিত হইল। তদনন্তর মহম্মদ, কুতবুদ্দিন নামা সেনানীর উপরে ভারতবর্ষের কর্তৃত্বভার অর্পণ করিয়া গজনিতে প্রস্থান করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই কুতব দিল্লী নগর অধিকার করিয়া মুসলমান-রাজত্ব বদ্ধ-মূল করিলেন। ১১৯৩ সালে এই সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হয়।

পর বৎসর মহম্মদ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং কুতবের সমভিব্যাহারে কনোজ-পতিকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া বারাণসীতে উত্তীর্ণ হন। সেই পবিত্র তীর্থের অধিকাংশ দেবমূর্ত্তির চূর্ণীকরণ ও বিপুল ধন লুণ্ঠনের পর, চারি সহস্র উষ্ট্র বোঝাই করিয়া, কিছু-কালের জন্য স্বস্থানে প্রতিগমন করেন। অবশেষে

আসিয়া গোয়ালিয়ার অবরোধ করিলেন। কিন্তু স্বদেশে গোলযোগ উপস্থিতির সংবাদ আসাতে কুতবের প্রতি গোয়ালিয়ার জয় করণের ভার দিয়া প্রস্থান করিলেন। কুতব সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন। অনধিক কাল পরেই সম্বাদ আসিল গুর্জ্জর প্রভৃতির রাজা, সবাবুদ্দিনের রোপিত আজমিরের সামন্তকে অতিশয় বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন। কুতব অবিলম্বে তাঁহার সাহায্যে গমন করিলেন, কিন্তু পরাভূত ও আহত হইয়া বহুকষ্টে আজমীরে প্রবিষ্ট হইলেন। যাহা হউক, ত্বরায় গজনি হইতে সাহায্য আসাতে কুতব আজমীরের অবরোধকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া গুর্জ্জরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তত্রত্য রাজধানী অধিকার করিলেন। এদিকে কুতবের প্রেরিত সেনারা, অযোধ্যা ও বিহার জয় করিয়াছে এই সম্বাদ পাঠাইল; তচ্ছ্রবণে কুতব স্বয়ং গুর্জ্জর হইতে আসিয়া বিহারের অবশিষ্ট ভাগ ও বাঙ্গালার অধিকাংশ অধিকার করিলেন। কুতবের যে সেনানী বাঙ্গালা পরাজয় করেন, তাঁহার নাম বক্তিয়ার খিলিজি। ইংরেজী ১২০৩ শালে এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়।

ইতিপূর্ব্বে ১২০২ খৃঃ অব্দে, জ্যেষ্ঠের প্রাণবিয়োগ হওয়াতে, সবাবুদ্দিন স্বয়ং রাজেশ্বর হন। তৎকালে তিনি কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্ব্বদিকে, খারিজম প্রদেশের অভিনব রাজকুলের সহিত সমরে লিপ্ত ছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি একান্ত পরাস্ত হন। আর এরূপ জনরব উঠে যে, তিনি নিহত হইয়াছেন। তৎশ্রবণমাত্র তাঁহার কর্ম্মচারীরা অনেকে আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিলেন। মুলতান ও গজনির শাসনকর্ত্তারা আপন আপন অধিকারে স্বস্বপ্রধান রাজা হইয়া বসিলেন এবং

গোক্কুরেরা কোহিস্তান হইতে অবরোহণ করিয়া পঞ্জাব লুণ্ঠন ও লাহোর নগর অধিকার করিল। কিন্তু কুতব সম্পূর্ণ প্রভুপরায়ণ রহিলেন। অল্পকাল মধ্যেই সবাবুদ্দিন সমুদায় বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রতিরোপিত হইলেন। গোক্কুরেরা পরাজিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তদনন্তর মহম্মদ গোরী গজ্‌নি যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সিন্ধুতটে উপস্থিত হইলে গ্রীষ্মের আতিশয্য হেতু, নদীর সমীপে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, বায়ুসঞ্চালনের জন্য, চতুর্দ্দিকের যবনিকা উত্তোলন পূর্ব্বক, একদা যামিনীতে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এদিকে গোক্কুরেরা সমরে আত্মীয় স্বজনের বধের প্রতিফল দিবার জন্য নিয়তই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, সেই রাত্রিতে বিংশতি জন আসিয়া, বহির্ভাগস্থিত সান্ত্রীর প্রাণ-সংহার পূর্ব্বক নিঃশব্দে মহম্মদের শয়নালয়ে প্রবেশ করিয়, সহসা তাঁহার বক্ষঃস্থলে বহুল ছুরিকা নিমজ্জিত করিল। সুলতান ক্ষতবিক্ষত শরীরে প্রাণত্যাগ করিলেন (১২০৬)।

সবাবুদ্দিনের কলেবরের সহিত তাঁহার বংশেরও ধ্বংস হইল। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু নামমাত্র ছয় বৎসর রাজত্বের পর মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন; তৎপরে বহুল বিগ্রহ উপস্থিত হইল। পরিশেষে খাবিজিমের রাজারা সিন্ধুর পশ্চিম দিকের তাবৎ অধিকার আত্মসাৎ করিলেন। কুতব স্বাধীন হইয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

—০—

দশম অধ্যায়।

দাসরাজশ্রেণী—পাঠানবংশ।

আদৌ কুতব ও তাঁহার দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী দাসত্ব-বদ্ধ ছিলেন, এজন্য তাঁহাদের বংশজাত রাজারা দাস-রাজা নামে খ্যাত। ইহাঁরা সকলেই পাঠানজাতীয় বলিয়া পরিচিত।

কুতব শৈশবকালে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে আনীত হন। এক ধনবান্ ব্যক্তি তাঁহাকে ক্রয় করিয়া আরব ও পারস্য ভাষায় শিক্ষিত করেন। সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর কোন বণিক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সবাবুদ্দি-নকে প্রদান করেন। তিনি ক্রমশঃ সবাবের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং এক সামান্য সংগ্রামে প্রচুর বীরতা প্রকাশ করেন। অবশেষে আজমীরের জয়ের পর তাঁহার উপরে ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হয়। তিনি নিয়তই প্রভুর অনুরক্ত ছিলেন, প্রভুও কখন তাঁহার প্রতি অণুমাত্র অবিশ্বাস করেন নাই। প্রভুর মৃত্যুর পর স্বাধীন হইয়া কুতব চারি বৎসরমাত্র জীবিত থাকেন; কিন্তু কেবল সেই চারি বৎসরই তাঁহার রাজত্ব এমন নহে, ভারতবর্ষে নিযুক্ত হওয়া অবধিই রাজকার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনকল্প হইয়াই চলিয়া-ছিলেন। এজন্য শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োগের দিবস হইতেই তাঁহার রাজত্ব গণনা করা যাইতে পারে।

কুতব পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র আরাম সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি অতিশয় অনুপ-

যুক্ত ছিলেন, অল্পকালমধ্যেই তাঁহারভগিনীপতি আল্টমাস তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন (১২১১)। আল্টমাসও আদৌ কুতবের ন্যায় ক্রীতদাস ছিলেন; পরে আপন বুদ্ধিবলে ক্রমশঃ কুতবের অনুগ্রহভাজন হইয়া উঠেন ও তদীয় পুত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। কুতবের মৃত্যুকালে তিনি বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অনেক যুদ্ধে বিলক্ষণ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

আল্টমাসের রাজত্ব সময়ে, ১২১৭ খৃঃ অব্দে এক অতি অসাধারণ ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহাতে সমস্ত আসিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। তাতার দেশে মাঞ্চু, মোগল ও তুরুস্ক এই তিন প্রধান জাতীয় মনুষ্যের বাস। অতি পূর্ব্ব ভাগে মাঞ্চু, তাহার পশ্চিমে মোগল ও সর্ব্ব পশ্চিমে তুরুস্ক। জেঙ্গিস খাঁ নামে মোগলজাতির মধ্যে একজন অতি সামান্য রাজা ছিলেন। কালসহকারে তিনি নিজ বাহুবলে তাতারের তিন জাতির অদ্বিতীয় প্রভু হইয়া উঠিলেন এবং অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক, দুরন্ত মত্তকুঞ্জরের ন্যায়, মুসলমানদিগের রাজ্যে অবতীর্ণ হইলেন। মনুষ্য জাতির যত বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে মোগলদিগের এই অবরোহণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করিয়াছে। ধর্ম্ম বা সভ্যতার বিস্তার, করগ্রহণ বা রাজ্যস্থাপন, এ সমুদায়ের কোনটীই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না; নরহত্যা ও সর্ব্বনাশসাধনই তাহাদের একমাত্র প্রিয় সঙ্কল্প ছিল। যে যে হতভাগ্য দেশ তাহাদের পদে অঙ্কিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় বহুকাল একমাত্র হৃদয়বিদারক হাহাকারে প্রতিধ্বনিত থাকে। সৌভাগ্যের বিষয় এই সেই ভয়ঙ্কর বাত্যা ভারতবর্ষ স্পর্শ করে নাই।

জেঙ্গিস আসিয়ার অধিকাংশ লুঠ করিয়া পরে খারিজিন-পতিকে আক্রমণ করেন। তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে পলায়িত হন। আল্টমাস তাঁহাকে আশ্রয়দানে অস্বীকৃত হইয়াই তৎকালে মোগলদিগের ঘোর উপদ্রব হইতে ভারতভূমির রক্ষা সম্পাদন করেন।

আল্টমাস, মালবদেশ পরাজয় ও আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশে দিল্লীর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া, ১২৩৬ খৃঃ অব্দে লোকান্তর গমন করেন। তৎপরে উপর্য্যুপরি চক্রান্ত, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের শ্রেণী উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার পুত্র রকনুদ্দিন সিংহাসনে আরোহিত, কিন্তু স্বল্পকালমধ্যেই ব্যসনাসক্ত ও সিংহাসনচ্যুত হন। তখন তাঁহার পুত্রী রিজিয়া রাজচ্ছত্র গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের মুসলমান-রাজাসনে পূর্ব্বে বা পরে আর কখনই স্ত্রী-লোকের উপবেশন দেখা যায় নাই।

প্রথিত আছে, রিজিয়া যাবতীয় রাজগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার ঈদৃশ শাসনবৈপুণ্য ছিল যে, আল্টমাস দূরদেশ-যাত্রাকালে পুত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া তাঁহা-রই হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া যাইতেন। রিজিয়া সিংহাসনে উঠিয়া, পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক সভা-মণ্ডপে বসিয়া, যথানিয়মে রাজকার্য্যের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। বিষয়কর্ম্মে তাঁহার বুদ্ধি ও অধ্যবসায় পুরুষোচিত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় স্ত্রীত্ব পরি-ত্যাগ করে নাই। স্বল্পকালমধ্যেই একজন আবিসিনীয় দাস অসামান্য অনুগ্রহ ভাজন হইয়া উঠিল। রিজিয়ার শত্রুরাও স্বীকার করেন, তিনি স্ত্রীজাতির পরম পবিত্র ধর্ম্মের অতিবর্ত্তন করেন নাই। যাহা হউক, প্রিয় দাস ক্রমশই উন্নমিত হইতে লাগিল; অবশেষে সমুদায়

অভিজাত অমাত্যের উপরে কর্ত্তা হইয়া উঠিল। তাঁহারা বিরক্ত হইয়া চক্রান্তজাল বিস্তার করিলেন। সংগ্রামেপরাস্ত হইয়া রিজিয়া অবনমিত ও কারারুদ্ধ এবং প্রিয়পাত্র নিহত হইলেন। বলে নিষ্ফল হইয়া রিজিয়া ছল অবলম্বন করিলেন। তিনি যে অমাত্যের কারাগৃহে সমর্পিত হইয়াছিলেন, প্রণয় বা প্রলোভনে তাঁহাকে বশ ও বিবাহ করিয়া সেই অভিনব স্বামীর সাহায্যে সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। দুই বার তুমুল সংগ্রাম হইল। পরিণামে রিজিয়া স্বামীর সহিত ধৃত ও নিহত হইলেন। তিনি সার্দ্ধ তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন।

রিজিয়ার ভ্রাতা বেহ্রাম তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু সুদৃঢ় হইয়া বসিবার পূর্ব্বেই এক দল মোগল-সৈন্য আসিয়া লাহোর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। তজ্জন্য সৈন্যসংগ্রহ ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। অবশেষে নূতন রাজা সার্দ্ধ দুই বৎসরের মধ্যেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও অপহত হইলেন। ইহাঁর উত্তরাধিকারী মসায়ুদের দুই বৎসরের রাজত্ব প্রাগুক্ত ঘটনাবলীরই পুনরভিনয় মাত্র। এই রাজত্বকালে এক দল মোগল-সেনা তিব্বত দিয়া বাঙ্গালায় অবরোহণ করে। পূর্ব্বে বা পরে আর কখনই এই পথে মোগলদিগের অবতরণ দেখা যায় নাই।

মসায়ুদের পদচ্যুতির পর নাজিরউদ্দিন শূন্য সিংহাসনে উত্থাপিত হন। ইনি আলুটমাসের পৌত্র; পিতামহের মৃত্যুর পর কারাবাসে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় গ্রন্থপ্রতিলিপিকরণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। সিংহাসনে আসিয়াও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। ইনি সামান্য বস্তু ভোজন, সামান্য শয্যায় শয়ন এবং ইন্দ্রিয়-

সংযম বিষয়ে রাজদণ্ডধারীর অপেক্ষা ত্রিদণ্ডধারীরই অধিক অনুরূপ ছিলেন। তাঁহার একমাত্র স্ত্রী ছিল, তিনি যাবতীয় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। একদা রুটী প্রস্তুত করিতে করিতে অঙ্গুলি দগ্ধ করিয়া স্বামীর নিকট একজন পরিচারিকা প্রার্থনা করায়, নাজির উত্তর করিলেন "আমি রাজ্যের ন্যাসাধার মাত্র, অনাবশ্যক বিষয়ে প্রকৃতিপুঞ্জের গচ্ছিত ধন অপচয় করিতে পারি না।" তিনি এরূপ শিষ্টাচারী ছিলেন যে, একদা কোন গ্রন্থপ্রতিলিপি করিয়া এক জন অমাত্যকে দেখাইলে অমাত্য কতকগুলি অশুদ্ধি দেখাইয়া দিলেন, রাজা তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় শোধন করিলেন। পরে অমাত্য বিদায় হইলে পূর্ব্বের লিখন পুনরুদ্ধার করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে অমাত্যের কথাক্রমে কেন অশুদ্ধির ভান করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসিত হইলে, বলিলেন, গ্রন্থ পূর্ব্বাবধিই বিশুদ্ধ ছিল, কিন্তু সদভিপ্রায় পরামর্শদাতার কথা অবহেলন করিয়া তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করার অপেক্ষা তাঁহার মতে সম্মতি প্রদর্শন করা ভাল ; এই বিবেচনাতেই তাদৃশ ব্যবহার করিয়াছিলাম। নাজির বিদ্যাবিষয়ে পরমোৎসাহী ও দীনহীনের একান্ত উপকারী ছিলেন।

নাজির বিংশতি বর্ষ রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে তাঁহার অধীন হিন্দু সামন্তেরা নানা স্থানে বিদ্রোহ, সভাসদেরা চক্রান্ত এবং মোগলেরা উপর্য্যুপরি আক্রমণ করে। কিন্তু নাজির আপনার কর্ম্মদক্ষ মন্ত্রী বুলবনের শৌর্য্য ও বুদ্ধি কৌশলে তত্তাবৎ নিরাকৃত করেন। বস্তুতঃ শাসনবিষয়ে বুলবনই সর্ব্বেসর্ব্বা, নাজির সাক্ষিগোপাল মাত্র ছিলেন। এজন্য, ১২৬৬ খৃঃঅব্দে, নাজির নিঃসন্তান লোকান্তর গমন করিলে, বুলবন অনায়াসেই সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

গিয়াসুদ্দিন বুলবন প্রথমতঃ সামান্য দাস ছিলেন, পরে আল্টমাসের সময় হইতে ক্রমশঃ উত্থিত হন এবং তৎপরবর্ত্তী যাবতীয় চক্রান্ত ও উপপ্লবের অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া আসেন। প্রথমাবস্থায় বুলবন, পরস্পরের সহায়তার জন্য, ঊনচল্লিশ জন প্রধান প্রধান দাসের সহিত নিয়ম স্থাপন করেন। ইহারা প্রায় সকলেই উন্নত পদে আরূঢ় হইয়াছিল। বুলবন দেখিলেন ইহারা ক্ষমতাপন্ন থাকিলে পরিণামে তাঁহার নিজ পরিবারের রাজ্যলাভ দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। অতএব তিনি বিবিধ কৌশলে তাহাদিগকে নিপাত করিয়া, এই নিয়ম করিলেন যে অভিজাত ব্যক্তি ভিন্ন কেহই উন্নত পদ প্রাপ্ত হইবেন না; নীচবংশজদিগের সহিত সামান্য সংলাপেও ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং যত্নপূর্ব্বক হিন্দুদিগকে প্রধান প্রধান কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। তিনি যৌবনকালে বিলক্ষণ সুরাসক্ত ছিলেন, এক্ষণে পরিমিত মদিরাপায়ীর প্রতিও গুরুতর দণ্ড বিধান করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে বহুকাল-প্রচলিত রাজনীতির নিয়মানুসারে, তল্লিপ্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে মাত্র শাস্তি দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, তৎসংসৃষ্ট অতি সামান্য জনদিগের উপরেও বৈরনির্যাতন করিতেন।

এই আত্মম্ভরি, ক্ষুদ্রচিত্ত, দুরাচার, ঘটনাক্রমে বদান্য ও সদ্‌গুণযুত নৃপতির ভেক ধারণ করে। মোগলদিগের দৌরাত্ম্যে বহুসংখ্য মুসলমান রাজা, স্বস্বদেশচ্যুত হইয়া স্বধর্ম্মাক্রান্ত অন্য ভূপতির অভাবে, বুলবনেরই আশ্রিত হন। রাজন্যের অপেক্ষাও আশ্রিত বিদ্বান্‌গণের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। বুলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার মহম্মদ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদ তদানীন্তন তাবৎ

প্রধান প্রধান পারসীক গ্রন্থকারের আলয় হইয়া উঠে।

এই রাজত্বে, গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগে, হিন্দু দস্যুরা রাজদ্রোহী ও উপদ্রবী হইয়া উঠে। বুলবন শোণিতস্রোত প্রবাহিত করিয়া তাহাদিগকে দমন করেন। প্রথিত আছে, একস্থানেই লক্ষ লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেক দূর পর্য্যন্ত জঙ্গলও পরিষ্কার করিয়া দেন। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা টোগ্রল রাজদ্রোহী হইয়া ক্রমান্বয়ে দুই বার বুলবনের প্রেরিত সেনাদিগকে পরাস্ত করেন। অবশেষে সম্রাট স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে পরাভূত ও তাঁহার প্রতি অসাধারণ গুরু দণ্ড বিধান করিলেন। যখন তিনি স্বয়ং পূর্ব্বভাগে নিযুক্ত, তখন পশ্চিমে তাঁহার পুত্র মহম্মদ মোগলদিগের আক্রমণ নিবারণ করিতেছিলেন। একদল পরাস্ত হইল, আর এক দল আসিয়া উপস্থিত। কুমার ইহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন; কিন্তু প্রকৃতিকুলের দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনিও নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই ব্যথিত এবং বুলবনের পাষাণহৃদয়ও উদ্বেজিত হইল। তিনি অশীতিবর্ষ বয়সে মুমূর্ষু অবস্থায় অবশিষ্ট পুত্র বখর খাঁকে আহ্বান করিলেন। বখর বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তথা হইতে আসিয়া, পিতার আশুমৃত্যুর সম্ভাবনা না দেখিয়া অনুমতি গ্রহণ বিনা ফিরিয়া গেলেন। তাহাতে বুলবন রাগান্ধ হইয়া, মহম্মদের পুত্র খসরুকে সিংহাসনের অধিকারী জানাইয়া, অল্পকালমধ্যেই কাল-কবলে পতিত হইলেন। অমাত্যেরা রাজপরিবারে আত্মবিগ্রহ নিবারণ মানসে বখরের পুত্র কৈকোবাদকে সিংহাসনে বসাইয়া খসরুকে মূলতানের শাসনকর্ত্তৃত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন (১২৮৬)।

অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্ক কেকোবাদ সিংহাসনে আসিয়া, একান্ত ব্যসনাসক্ত হইলেন। তাঁহার ধূর্ত্ত উজির নিজাম-উদ্দিন প্রভুর সর্ব্বনাশ করিয়া স্বীয় ভাগ্যস্থাপন মানসে নিয়তই তাঁহার কুক্রিয়াসক্তি প্রদীপ্ত করিতে লাগিল; এবং সেই নির্ব্বোধ ভূপতির সম্মতিচ্ছায়ায় অনায়াসেই খস্রুর ও স্বপক্ষ ভিন্ন তাবৎ অমাত্যের প্রাণসংহার করিয়া উঠিল।

বখরখাঁ এই সমস্ত সম্বাদ পাইয়া, পুত্রের মঙ্গলসাধন সঙ্কল্পে, সসৈন্য দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উজিরের দুষ্ট পরামর্শে পিতা পুত্রে সংগ্রামের আয়োজন হইল। উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইলে, বখর এমন করুণ বচনে, পুত্রের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিলেন যে, পাষণ্ড উজির আর তাহার অন্যথা করিতে পারিল না। তথাপি এমন অবমানকর আদব-কায়দার প্রস্তাব করিল যে, সে ভাবিল তৎসমুদায়ে বখর খাঁ অতিশয় রুষ্ট হইবেন। কিন্তু উদারচিত্ত বখর সমুদায়েই সম্মত হইলেন। অবশেষে বারম্বার প্রণিপাতের পরও পুত্রকে সিংহাসনে অবিচলিত দেখিয়া, তাদৃশ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আচরণ-নিবন্ধন রোদন করিয়া উঠিলেন। বিলাসীরা লঘুচিত্ত, কিন্তু প্রায়ই পাষাণহৃদয় নহে। কেকোবাদ পিতাকে অশ্রু-নয়ন দেখিবামাত্র সিংহাসন হইতে লম্ফ দিয়া তদীয় চরণ-ধারণে ধাবমান হইলেন এবং পিতা পুত্র কিয়ৎকাল পরস্পরের বাহুবদ্ধ হইয়া বাষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত সভাসদগণেরই হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। অনন্তর কেকোবাদ পিতাকে সিংহাসনে বসাইয়া বিধিমতে ভক্তি ও প্রীতি প্রদর্শন করিলেন। যুদ্ধের প্রসঙ্গ একেবারে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু অনেক দিন একত্র

বাসের পরও বখর দেখিলেন, কেকোবাদ উজিরের যেরূপ বশীভূত, তাহাতে সহজে তাহার প্রাধান্যের বিনাশ করিবার উপায় নাই। বখর স্বয়ং যুদ্ধ করিতে অসম্মত বা অপারগ ছিলেন, এজন্য পুত্রের কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ অপ্রতিবিধেয় জানিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কেকোবাদ এমনি ব্যসনাসক্ত হইয়াছিলেন যে অল্প বয়সেই তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল এবং মন্ত্রীকেই তাবৎ অমঙ্গলের নিদান জানিয়া, বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রাণবধ করিলেন। কিন্তু তিনি নিজে রাজ-ক্ষমতা রক্ষা করিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মন্ত্রীর মৃত্যুতে কেবল অন্য লোকেরই উপকার হইল। তুরুষ্ক ও পাঠান দুই জাতীয় অমাত্যেরাই রাজপদ লাভের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। অবশেষে পাঠানেরা প্রবল হইয়া কেকোবাদের সংহার পূর্ব্বক জেলালউদ্দিনকে সিংহাসনে আরোপিত করিলেন। দুর্ভাগ্য কেকোবাদ দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পাঠান-বংশ।

জেলালউদ্দিন খিলিজি সোত্তর বৎসর বয়সে রাজপদ প্রাপ্ত হন (১২৮৮)। তিনি নিন্দিত ও নৃশংস অনুষ্ঠান দ্বারা ঐ অভিলাষ সম্পন্ন করেন বটে, কিন্তু রাজ্যাভিষেকের

পর বিন্দুমাত্রও বিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রত্যুত তিনি স্বভাবতঃ শান্ত ও দয়াবান্ ছিলেন এবং তদনুসারে তাঁহার রাজত্বে রাজবিদ্রোহীদিগের ক্ষমা ও অপর অপরাধীদিগের লঘু দণ্ড হইতে লাগিল। ফলতঃ তিনি ঈদৃশ অসাধারণ মৃদুতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দর্শনে স্বল্পকালমধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন ভাগের শাসন-কর্ত্তারা রাজস্ব প্রেরণে শিথিল-প্রযত্ন হইয়া উঠিলেন এবং দস্যুরা নিঃশঙ্কচিত্তে সর্ব্বত্র তাহাদের জঘন্য ব্যবসায়ের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, জেলাল স্বভাবতঃ ভীত বা অদক্ষ ছিলেন না। এক দল মোগলসৈন্য পঞ্জাব আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রকৃত স্বভাব স্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি প্রভূত শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া আগন্তুকদিগকে পরাভূত করিলেন ; পরে কৃপা-পরবশ হইয়া যুদ্ধের হতাবশিষ্টদিগকে নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রস্থান করিতে দিলেন। জেলাল রাজা হইয়া বিলাসী ও গর্ব্বিত হন নাই। সামান্য অবস্থায় প্রাচীন মিত্রবর্গের সহিত যেরূপ অমায়িক ব্যবহার করিতেন, রাজ-চ্ছত্র ধারণ করিয়াও অবিকল সেইরূপ করিয়াছিলেন।

জেলালউদ্দিনের সময়েই দাক্ষিণাত্য, মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক প্রথম বার আক্রান্ত হয় (১২৯৪)। আলাউদ্দিন নামে জেলালের ভ্রাতৃপুত্র ছিল। তাহার চরিত্র পিতৃ-ব্যের চরিত্রের একান্ত বিপরীত ছিল। তথাপি পিতৃব্য তাহাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। আলা, করার শাসনকর্ত্তৃত্বে ও বুন্দেলখণ্ডের রাজদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হন। শেষোক্ত কার্য্য সমাধা করিয়া, পিতৃব্যের অনুমতি বিনা আলা, আট হাজার অশ্বারোহী লইয়া, বুন্দেলখণ্ড ও দাক্ষিণাত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী জঙ্গল অতিক্রম করিলেন এবং

মহারাষ্ট্রের তদানীন্তন রাজধানী দেবগিরিতে উপস্থিত হইলেন। তখন তত্রত্য রাজার কোন শত্রু উপস্থিত ছিল না, সুতরাং তিনি সর্ব্বথা যুদ্ধোদ্যোগ-বিহীন ছিলেন। আলা প্রচার করিয়া দিলেন, তাঁহার সমভিব্যাহারীরা দিল্লীপতির প্রেরিত সেনার পুরোগ ভাগমাত্র, মূল সৈন্য পশ্চাৎ আসিতেছে। হিন্দুরাজ সেই বিভীষিকায় ভীত হইলেন। আলা তাঁহার নগর লুণ্ঠন ও পরে এক অনুকূল দৈববলে নগরীর রক্ষার্থ সমাগত সৈন্য পরাজয় করিয়া বিপুল অর্থের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

আলার দাক্ষিণাত্যে গমন ও অবস্থান কালে, তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে এবং তাহার অভিসন্ধিই বা কি জেলাল ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। পরে যখন শুনিলেন ভ্রাতৃপুত্র বিভব ও গৌরবে সমুজ্জ্বল হইয়া পরাবৃত্ত হইতেছে, তখন তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ভিন্ন অণুমাত্রও ভাবান্তর উপস্থিত হইল না। মন্ত্রীরা তাঁহাকে ভ্রাতৃপুত্রের দুরাকাঙ্ক্ষা হইতে আত্মরক্ষার্থ সতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু আলার উপর জেলালের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এজন্য মন্ত্রিদিগের পরামর্শের অনুরূপ কোন কার্য্যই করিলেন না। অধিকন্তু সেই বৎসল বর্ষীয়ান্ ধূর্ত্ত আলার প্রবর্ত্তনায়, করায় উপস্থিত হইলেন এবং বহুকাল পরে স্নেহভাজন ভ্রাতৃপুত্রের দর্শন পাইয়া তাহাকে সানুরাগ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সেই পামরের নিযুক্ত কতিপয় দুরাত্মা আসিয়া জেলালের প্রাণ সংহার করিল (১২৯৫)। পরে আলার আদেশে অপহৃত ভূপতির ছিন্ন মুণ্ড, বর্ষার অগ্রভাগে বিদ্ধ হইয়া শিবির ও নগরে ভ্রামিত হইল। অবিলম্বে পাষণ্ড আলা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিল এবং পিতৃব্যের সমস্ত পরি-

বারকে আপনার ক্ষমতায় আনিয়া, তাঁহার দুই পুত্রেরই বিনাশ সাধন করিয়া উঠিল। জেলাল সাত বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন।

প্রাগুক্ত বিগর্হিত উপায়পরম্পরায় রাজ্যলাভের পর আলা ন্যায়পরতা ও দুষ্টদমন শিষ্টপালন প্রভৃতি দ্বারা প্রজাপ্রিয় হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; এবং বস্তুতঃও তাঁহার একবিংশতি বর্ষ রাজত্বকালে ভারতবর্ষীয় মুসলমান-সাম্রাজ্য প্রচুর প্রতাপ ও অভ্যুদয় সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তি প্রযুক্ত আলার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সময়ে সময়ে তাঁহার কুপ্রবৃত্তি ও স্বেচ্ছাচারিতা বিলক্ষণ উদ্রিক্ত হইয়া উঠিত। এজন্য অভিলষিত লোকানুরাগ-লাভে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদাই ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহে উদ্বেজিত হইতে হইয়াছিল। এমন কি, অতিবিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও আত্মপরিবারের প্রতিও তিনি বীতসন্দেহ হইতে পারেন নাই। অবশেষে অপরিমিত আহার বিহারে তাঁহার শরীর রুগ্ন হইয়া উঠিল। তখন তিনি অতিশয় কোপন ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিলেন। যাহারা পৃথিবীশুদ্ধ লোককে অবিশ্বাস করে, তাহারা চরমে প্রায়ই একজন শঠশিরোমণির কপট ঔদার্য্যে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আলাও সেইরূপ হইয়াছিলেন। তিনি যে ব্যক্তির কপট-জালে পতিত হন তাহার নাম কাফুর। আদৌ এই ব্যক্তি এক সামান্য বর্ব্বর ছিল। পরে আলার প্রিয়পাত্র ও উচ্চপদারূঢ় হইয়া উঠে এবং ক্রমে তাহার অপরিমিতকার্য্যদক্ষতাও প্রকাশ হয়। তাহার দুষ্টাভিসন্ধির ইয়ত্তা ছিল না; সে রাজাকে আপন ক্রীড়নক করিয়া, পরিণামে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার বাসনায়, ক্রমে ক্রমে তাবৎ

প্রধান অমাত্যের প্রাণ সংহার করিল। অবশেষে রাজ্ঞী ও রাজকুমারদের উপরেও রাজার দারুণ ক্রোধ জন্মাইয়া দিল। ১৩১৬ খৃঃ অব্দে আলার মৃত্যু ঘটে। অনেকে বলেন কাফুরের প্রদত্ত বিষেই তাঁহার আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে।

আলা একান্ত নিষ্ঠুর ও দুরন্ত ছিলেন। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র শান্তি ও সৌভাগ্য বিরাজ করিয়াছিল। নূতন নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ ও বিবিধ বিলাস-দ্রব্যের বিপুল বিক্রয়ে, প্রজাবর্গের ধনবৃদ্ধিরও ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আর সৈনিক প্রতাপে তাঁহার রাজত্ব যে অতিশয় উজ্জ্বল ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি গুর্জ্জর দেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বশীভূত করেন। রাজপুতানারও কোন কোন দুর্গে তাঁহার পতাকা উড্ডীন হয়। মোগলেরা বারম্বার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে, কিন্তু তিনি নিয়তই তাহাদিগকে দূর করিয়া দেন। একবারের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত ভীষণ হইয়া উঠে। মোগলসেনারা দিল্লী পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। অবশেষে আলার সেনানী জাফর খাঁর শৌর্য্যে তাহারা পরাভূত হইল। ইতিপূর্ব্বেই জাফর স্বীয় ক্ষমতার আধিক্য হেতু সম্রাটের চক্ষের শূল হইয়াছিলেন। এক্ষণে মোগলদিগের আক্রমণ নিরাকরণ দ্বারা তিনি সম্রাটের মহোপকার করিলেন। দুরাত্মা সম্রাট স্থিরচিত্তে প্রত্যুপকার স্বরূপে তাঁহারই বধের চক্রান্ত করিলেন। জাফর মোগলদিগের দমনের পর তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এদিকে সম্রাটের প্রতিষেধ-নিবন্ধন সেই সেনানীর সমভিব্যাহারে অধিক লোক প্রেরিত হইল না। প্রতিপক্ষেরা তাহাকে স্বল্পসৈন্য

পাইয়া অনায়াসেই বিনাশ করিল। এই সকল সংগ্রামের পর আলা, দাক্ষিণাত্যের প্রতি মনোনিবেশ-পূর্ব্বক, কাফুরের বাহুবলে, তৈলঙ্গ, কর্ণাট ও মলবারের অধিকাংশ পরাজয়, আর মহারাষ্ট্রে করস্থাপন করেন। উপর্য্যুপরি জয়লাভে আলা অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া উঠেন। তিনি এরূপ নিরক্ষর ছিলেন যে, সিংহাসনে উঠিয়া পড়িতে শিখেন। তথাপি এমন দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেন যে অতি বহুজ্ঞ মন্ত্রীরাও তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধ কথনে সাহস করিতেন না এবং তাঁহার সভাস্থিত প্রধান প্রধান বিদ্যাবানেরা তাঁহার ব্যুৎপত্তির অতিরিক্ত বিদ্যার প্রসঙ্গ করিতে পারিতেন না। একদা আলার মনে উদয় হয় যে আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া প্রচার ও এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করেন। সে খেয়াল গত হইলে, দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডার এই উপাধি গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্যরূপে ভুবনবিজয় প্রস্তাবের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন।

আলার মৃত্যুর পর কাফুর মৃত সম্রাটের এক কৃত্রিম নির্দ্দেশপত্র বাহির করিল। তাহার মর্ম্ম এই—ভূপতির সর্ব্বকনিষ্ঠ অত্যল্প-বয়স্ক কুমার রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন এবং কাফুর তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। সেইরূপ তাবৎ অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু তাহাতেও কাফুরের দুরাশা পরিতৃপ্ত হইল না। সে আপন পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব প্রভুর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের চক্ষুরুৎপাটন করিল এবং তৃতীয় পুত্র মোবারিকের বিনাশ সম্পাদনের জন্য, সেই যুবরাজের সন্নিধানে, ঘাতক পাঠাইয়া দিল। কিন্তু ঘাতকেরা সেই অপকর্ম্ম হইতে নিবারিত হইয়াছিল এবং কাফুর পুনশ্চেষ্টার সময় পাইবার পূর্ব্বে রাজসৈনিকেরা তাহারই প্রাণসংহার করিল।

মোবারিক অবিলম্বে সিংহাসনে আরোহিত হইলেন কিন্তু স্বস্তিবাচনেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার চক্ষুরুৎপাটন ও নিজের উন্নমনকারী অমাত্যবর্গের জীবনদণ্ড বিধান করিলেন। তিনি কয়েকটী সৎকর্ম্মও করিয়াছিলেন। তৎসমুদায়ের মধ্যে পিতার নিষ্ঠুরদণ্ডে বন্দীকৃত ১৭,০০০ ব্যক্তির কারা-মোচন, বাজে আপ্ত ভূমির খালাস ও বাণিজ্যের শুল্ক রদ্ করণ প্রধান। তিনি কয়েকবার বিলক্ষণ শৌর্য্যশালিত্বও প্রকাশ করেন। যাহা হউক, তিনি অল্পকালমধ্যেই অতি হেয় ও কুৎসিত ব্যসন-পরম্পরায় একান্ত আসক্ত হইয়া উঠেন। খসুরু নামে তাঁহার এক অমাত্য ছিল। এই ব্যক্তি হিন্দু-কুল-জাত, কিন্তু মুসলমান-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। রাজা ক্রমে ক্রমে তাহাকে সর্ব্বাধিকারী পদ প্রদান করেন এবং সে রাজ্যসংক্রান্ত তাবৎ বিষয়েরই প্রকৃত নিয়ন্তা হইয়া উঠে। অবশেষে মোহান্ধচিত্ত প্রভুর প্রাণসংহার করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হয়। খসুরু আলাউদ্দিনের বংশ সমূলে ধ্বংস করে, কিন্তু অল্পকাল-মধ্যেই পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা টোগলক খাঁর হস্তে স্বয়ং নিধন প্রাপ্ত হয় (১৩২১)। প্রাচীন রাজবংশের কেহই জীবিত না থাকাতে টোগলক, গিয়াসউদ্দিন নাম ধারণ-পূর্ব্বক, স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

গিয়াসউদ্দিন টোগলক, বুলবন সম্রাটের এক জন দাসের পুত্র। তিনি বিলক্ষণ প্রতাপে ও সদ্বিচারে রাজত্ব করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চারি বৎসর মধ্যেই অপঘাতে নিধন প্রাপ্ত হন। গিয়াসউদ্দিনের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। গিয়াস তন্নি-বারণার্থ আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনাখাঁকে বরঙ্গলে প্রেরণ করেন। জুনা প্রথম বার নিষ্ফল ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া

পরাবৃত্ত হন, পর বৎসর যাইয়া বিদর্ভ ও বরঙ্গল পরাজয় করেন। তদনন্তর সম্রাট্ স্বয়ং বাঙ্গালায় যাত্রা করেন। তথায় তখনও বখর-খাঁ শাসন-কর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি, পিতার দাসপুত্র কর্তৃক, স্বীয় কর্ম্মে দৃঢ়ীকৃত ও রাজাভরণ-ধারণে অনুমত হইলেন। প্রত্যাগমন-সময়ে গিয়াসউদ্দিন পথিমধ্যে মিথিলা (ত্রিহুত পরাজয় করিয়া আইসেন। তাঁহার পুনরাগমনের অভিনন্দন জন্য জুনা খাঁ দিল্লীতে এক মহতী শোভার কাষ্ঠময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তন্মধ্যে আসীন হইলে সহসা উহা ভগ্ন হইয়া তাঁহাকে সংহার করিল। অনেকে সন্দেহ করেন, জুনার দুষ্ট অভিপ্রায়ে এই শোচনীয় ব্যাপার উপস্থিত হয় (১৩২৫)।

পিতার মৃত্যুর পর জুনা সিংহাসনে আরোহণ এবং মহম্মদ সা নাম ধারণ করিলেন। তিনি অতিশয় আড়ম্বরে অভিষিক্ত হন। পরে আত্মীয় স্বজন ও বিদ্যাবানদিগের উপরে ধনবর্ষণ এবং স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় ও দাতব্যশালা স্থাপন করেন। তিনি তৎকালবর্ত্তী যাবতীয় রাজার অপেক্ষা পণ্ডিত, বাগ্মী, বিবিধ-ভাষাবিদ্, কাব্য, গণিত ও দর্শন শাস্ত্রে বিশারদ, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে একান্ত তৎপর, জিতেন্দ্রিয় এবং বীর, বদান্য ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত প্রধান ও অতিপ্রশংসনীয় গুণগ্রামের সহিত ঈদৃশ বুদ্ধিবৈকল্য সম্মিলিত ছিল যে তাঁহাকে উন্মত্ত ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। তিনি অনুচিত দুরাকাঙ্ক্ষাসেবায় যুক্তিবহির্ভূত সঙ্কল্পপরম্পরায় নিয়ত আরূঢ় হন এবং অণুমাত্রও বিবেচনা না করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের রাশি রাশি দুঃখ সমুৎপন্ন করেন। রাজত্বের প্রারম্ভেই দাক্ষিণাত্যের পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়া

উঠে। তখন জুনা, ভারতবর্ষে কিছুই জয়ার্হ না দেখিয়া পারস্য ও চীনের প্রতি দুরাকাঙ্ক্ষা বিস্তার করিলেন। প্রথমতঃ পারস্যের আক্রমণ-জন্য বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ হইল; তাহারা রাজকোষ নিঃশেষ করিল; পরে বেতনের অভাবে রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে লাগিল। তখন চীনের লুণ্ঠন দ্বারা শূন্য কোষ পরিপূরণ বাসনায়, বিচক্ষণ ভূপতি, হিমালয়ের ভিতর দিয়া লক্ষ অশ্বারোহী পাঠাইলেন। চীনের সীমাস্থলে যাইয়া ভারতবর্ষীয়েরা এত বিপক্ষ-সেনা উপস্থিত দেখিল যে, তাহারা ভয়ে পরাবর্ত্তন আরম্ভ করিল। পথিমধ্যে পর্ব্বত-বাসীদিগের অত্যাচারে, অনুগামী চীনসৈন্যের দৌরাত্ম্যে, ভোজন-সামগ্রীর অভাবে, বর্ষাকালীন বৃষ্টি ও পরীবাহে এবং দুর্ভেদ্য-জঙ্গল-অতিক্রমণে এত কষ্ট উপস্থিত হয় যে, পঞ্চদশ দিবস পরে, তাহাদের একজন ভগ্নদূতও অবশিষ্ট ছিল কি না সন্দেহ।

অনন্তর কোষ পরিপূরণার্থ মহম্মদের মনে এক নূতন খেয়ালের উদয় হয়। তিনি শুনিয়াছিলেন চীন দেশে টাকার পরিবর্ত্তে কাগজ অর্থাৎ নোট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিনি স্বীয় রাজ্যে এক এক তাম্রখণ্ড সেইরূপে চালাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু রাজকোষের ধন-গৌরব না থাকায়, পরিণামে প্রতারিত হইবার ভয়ে, কেহই উহা গ্রহণ করিল না। লাভের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ এবং রাজস্বের বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ তাম্রখণ্ড সংগৃহীত হইল। তখন সম্রাট অনন্যোপায় হইয়া অসঙ্গত করবৃদ্ধির ঘোষণা করিলেন। কৃষকেরা ভূমি পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে লুক্কায়িত হইল। রাগোন্মত্ত ভূপতি অন্ততঃ বৈর-নির্য্যাতন সঙ্কল্প করিলেন, তিনি সসৈন্য যাইয়া, মৃগয়া-

ব্যাপারের ন্যায়, এক এক খণ্ড বিস্তৃত জঙ্গল অবরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং চতুর্দ্দিক হইতে ক্রমশঃ তাহার মধ্য ভাগে ধাবিত হইয়া, তন্মধ্যস্থিত নিরাশ্রয় কৃষকদিগকে, বন্য পশুর ন্যায়, সংহার করিতে লাগিলেন। কৃষকদিগের নিষ্পীড়নে দুর্ভিক্ষ ও তাহার অনুচর ভয়ানক কষ্টসকল সর্ব্বত্র উপস্থিত হইল। শাসিতার দোষ ও দৌরাত্ম্যেই রাজদ্রোহের উৎপত্তি। অতএব মহম্মদের রাজত্বে বারম্বার রাজদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, আশ্চর্য্য কি। পঞ্জাব ও মালবের বিদ্রোহ সহজেই নিরাকৃত হইল কিন্তু বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া উঠিলেন (১৩৪০)। দাক্ষিণাত্যেও তৈলঙ্গ ও কর্ণাট স্বাধীনতা অবলম্বন করিল; তন্মধ্যে কর্ণাটের রাজা বিজয়নগরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। পরবর্ত্তী দুই শত বৎসর বিজয়নগরের রাজারা বিলক্ষণ পরাক্রান্ত থাকেন। জুনার এক ভ্রাতৃপুত্র মালবদেশে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া পরে দাক্ষিণাত্যে পলায়িত হন। নিষ্ঠুর সম্রাট্ তাহাকে পরাভূত করিয়া শরীরের ত্বগুন্মোচন দ্বারা তাহার প্রাণ-সংহার করিলেন।

মহম্মদ দেবগিরি নগর দর্শন করিয়া এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, তন্নগরে সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন মনস্থ করিলেন; এবং সেই খেয়ালের আবেশমাত্র দিল্লীর অধিবাসীদিগকে তথায় যাইয়া বাসের আজ্ঞা দিলেন। দেবগিরির নাম দৌলতাবাদ রাখিলেন। অনন্তর দিল্লীর অধিবাসীরা দুই বার দিল্লীতে পরাবর্ত্তনে অনুমত ও দুই বার প্রাণসংহারভয়ে তাহা পরিত্যাগে বাধিত হয়। তন্মধ্যে, দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এমন সময়ে এক বারের নিষ্ক্রমণ আজ্ঞপ্ত হওয়াতে, যৎপরোনাস্তি কষ্ট উপস্থিত

হইয়াছিল। অবশেষে দেবগিরিতে রাজধানী-স্থাপনের সঙ্কল্পও, চীনের আক্রমণের ন্যায়, নিষ্ফল হইল।

ভারতবর্ষীয় মুসলমান-রাজাদিগের সৈন্যমধ্যে সময়ে সময়ে অনেক মোগল প্রবেশিত হইয়া আসিতেছিল। মহম্মদের দৌরাত্ম্যে তিরোভূত হইয়া ইহারা গুর্জ্জরে বিদ্রোহী, পরে তথা হইতে তাড়িত হইয়া দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইল; এবং ইস্মেল খাঁ নামা একজন পাঠান সেনানীকে রাজা করিয়া, স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিল। মহম্মদ ইহাদের বিরুদ্ধে যাইয়া প্রবলকক্ষ হইলেন। তখন বিদ্রোহী রাজা ইস্মেল অমাত্যবর্গের সহিত দৌলতাবাদে আশ্রয় লইলেন। মহম্মদ তন্নগর অবরোধ করিলেন। এদিকে গুজরাটে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে সম্বাদ আসিল। মহম্মদ একজন অমাত্যের উপরে দৌলতাবাদের অবরোধের ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং গুর্জ্জরে গমন করিলেন। পার্ষ্ণিশত্রুরা তাঁহার নিযুক্ত অমাত্যকে পরাভূত ও দূরীকৃত করিল। তাহাদের রাজা ইস্মেল স্বয়ং সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, জাফর খাঁ নামা একজন অতিদক্ষ অমাত্যকে স্বীয় পদে অভিষিক্ত করিলেন। মহম্মদ দাক্ষিণাত্যে পুনর্গমন ও জাফরকে দমন করিবার পূর্ব্বেই ১৩৫১ শালে শরীরীদিগের চরম দশায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ২৭ বৎসর রাজত্ব অর্থাৎ ভারতবর্ষ জ্বালাতন করেন।

জাফর পাঠানবংশসম্ভূত ছিলেন। তাঁহার আদিম নাম হাসন। তিনি দিল্লীর কোন জ্যোতির্জ্ঞ ব্রাহ্মণের দাস অথবা কৃষাণ ছিলেন। প্রথিত আছে একদিন ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে ভূগর্ভে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, এবং তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাহা নিয়োগ্য ব্রাহ্মণকে প্রদান

করেন। সেই ব্রাহ্মণের সম্রাট্‌সভায় প্রতিপত্তি ছিল। তিনি হাসনের সাধুতায় প্রীত হইয়া, তাহার মঙ্গলসাধনের জন্য, সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। হাসন সম্রাট-প্রসাদে ক্রমশঃ উত্থিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে স্বয়ং রাজা হইয়া উঠিলেন। তখন পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ প্রভুর গৌরববর্দ্ধন-মানসে বাহমনি এই উপাধি গ্রহণ করিয়া সেই প্রভুকে উজির করিলেন। হাসনের উত্তরাধিকারীরা বাহমনি বংশ নামেই খ্যাত।

মহম্মদ টোগলকের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ফিরোজ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরোজ বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্য, দিল্লীর অনধীন বলিয়া স্বীকার পান। ইনি কতিপয় অতি উৎকৃষ্ট আইন প্রচলিত করেন; এবং সেতু, স্নানকুণ্ড, পান্থনিবাস, চিকিৎসালয়, মসিদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি অনেক প্রকারের বহুসংখ্য সাধারণ কার্য্যও সম্পন্ন করিয়া যান। তৎসমুদায়ের মধ্যে যমুনা হইতে গাগর নদী পর্য্যন্ত, তাঁহার স্বনামখ্যাত কৃত্রিম সরিৎ অতিশয় প্রসিদ্ধ এবং তাহাতে কৃষিকার্য্যের প্রচুর উপকার সাধিত হইয়াছে। ফিরোজ ১৩৮৮ খৃঃ অব্দে লোকান্তর গমন করেন। তৎপরবর্ত্তী ছয় বৎসরে টোগলক-বংশীয় চারি জন রাজা ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শেষ জনের নাম মামুদ। ইহার রাজত্বে দিল্লীপতির প্রতাপ এরূপ নিস্তেজ হইয়া আইসে যে অধিকাংশ প্রদেশেরই শাসনকর্ত্তারা স্বাধীন হইয়া উঠেন, এবং অবশেষে এক অতিভীষণ বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে সমস্ত ভারতভূমির হৃৎকম্প উপস্থিত হয় (১৩৯৮)। সেই শত্রুর নাম টাইমুর বা টামরলেন।

আসিয়ায়, স্বল্পকালমধ্যে যেরূপ নূতন নূতন রাজকুলের অভ্যুদয় ও বিলয় হইয়াছে, ভূমণ্ডলের অন্যান্যভাগে সেরূপ দেখা যায় না। আসিয়িক রাজ্য সমুদায় প্রায়ই এইরূপে সমুৎপন্ন—এক জন দক্ষ ও উজ্জ্বল সেনানী নিজ বাহুবলে দিগ্বিজয় করিয়া একটী রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সন্তানেরা তাঁহার সিংহাসনে আরোহিত হন এবং ক্রমে ক্রমে ভোগ-সুখে একান্ত আসক্ত হইতে থাকেন। দুই চারি পুরুষ মধ্যে দণ্ডধারীর সন্ততি ঈদৃশ বিলাসী, কাপুরুষ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠেন যে তাঁহাদের রাজ-উপাধিমাত্র অবশিষ্ট থাকে; যাবতীয় প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রী ও অমাত্যদিগের করে উপস্থিত হয়। ইহারা সকলে অসার প্রভুর হস্তস্খলনোন্মুখ রাজদণ্ড ধারণে লুব্ধচিত্ত হয়; এবং সকলেই এক বস্তুর প্রার্থী হওয়াতে পরস্পর অসূয়া-পরবশ হইয়া উঠে। অতঃপর আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হইয়া অমাত্যেরা অনেকেই আপন আপন চক্রে স্বস্বপ্রধান হন, অথবা তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রবল হইয়া দণ্ড অপকর্ষণ পূর্ব্বক আবার চক্রবর্ত্তীর নাম সম্মানার্হ করিয়া তুলেন। এই দুয়ের অন্যতরই সচরাচর ঘটে। কিন্তু কখন কখন প্রাগুক্তরূপে রাজপ্রতাপের অবসাদ হইলে, জনৈক প্রবল-প্রতাপ বৈদেশিক আসিয়া রাজা, মন্ত্রী ও অমাত্যকুল সকলকেই এক কালে নির্ম্মূল করিয়া উঠেন। ইহাঁর সন্ততিও আবার যথাকালে অবসন্ন হইলে বর্ণিত ব্যাপারের পুনরভিনয় পরিদৃষ্ট হয়। আসিয়ার মধ্যেও আবার ভারতবর্ষ, জিগীষুর পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনুকূল ক্ষেত্র। অন্যান্য দেশে অধিবাসীরা সহজে আগন্তুকের শাসন স্বীকার করে না। কিন্তু যে সে আসিয়া রাজদণ্ড ধারণ

করিলেই ভারতবর্ষীয়েরা অমনি তাঁহার বশীভূত হন; এবং তাঁহার দৌরাত্ম্যে একান্ত পীড়িত হইলেও তাঁহার দমনের চেষ্টা করেন না। এজন্যই ইতিপূর্ব্বে মামুদ ও মহম্মদ গোরী সহজেই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে টাইমুর তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে ধাবমান হইয়া আসিলেন।

টাইমুর তুরান দেশে মুসলমানধর্ম্মাক্রান্ত এক তুরুস্ক-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে সমরকণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে জঙ্গিসের ন্যায়, তাতারের সকল জাতীয় লোকের উপরে কর্ত্তা হইয়া উঠেন। ইহাঁর সময়ে তাতারের সন্নিহিত সমুদায় রাজ্য উপরি-বর্ণিত অবসন্ন দশায় উপস্থিত হইয়াছিল। টাইমুর, দুর্নিবার দাবদাহের ন্যায়, তৎসমুদায় ভস্মীভূত করিয়া, অবশেষে, কাবুলের পথে, ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। লুণ্ঠন ও নরহত্যা তাঁহার নিয়ত অনুচর ছিল। কৌতুক এই যে, তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত আত্মবৃত্তে, তাবৎ হত্যাব্যাপারই তাঁহার মতের বিরুদ্ধে বা জ্ঞানের অগোচরে, সেনাদিগেরই উচ্ছৃঙ্খলতায় আরোপিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই, বিড়াল-তপস্বীর ন্যায়, জীবহিংসায় একান্ত অরুচি ও অপ্রবৃত্তির ভান করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, জঙ্গিস ও টাইমুর উভয়েই মানবজাতির মহাশত্রু ছিলেন সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, প্রথমোক্ত অধিক দুর্দ্দান্ত ও প্রচণ্ড, শেষোক্ত অপেক্ষাকৃত কপটচূড়ামণি ও বিশ্বাসঘাতী।

টাইমুর পথিমধ্যে প্রাপ্ত তাবৎ নগর লুণ্ঠন, এবং নিঃসন্দেহই আপনার অমতে কিন্তু অবাধে, তৎসমুদায়ের নিবাসীদিগকে নিহনন করিয়া, অবশেষে দিল্লীর সমীপে

উপস্থিত হইলেন। মামুদ টোগলক নিবারণ চেষ্টায় বিফল হইয়া গুজ্জর দেশে পলায়ন করিলেন। দিল্লীর অধিবাসীরা ধন-প্রাণ-রক্ষার প্রচুর অঙ্গীকার পাইয়া, নগরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিল। টাইমুর সদলে প্রবিষ্ট হইলেন। সেনারা লুণ্ঠনে হস্ত প্রসারিত করিল; নগরবাসীরা নিবারণ চেষ্টা পাওয়ায় অসি ও অগ্নি প্রয়োগ আরম্ভ হইল। সেনাদের মার্‌ মার্‌ শব্দে ও নাগরিকদের হাহাকারে দিল্লী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অবশ্যই এ সমস্ত টাইমুরের অজ্ঞাত ও অনভিপ্রেত ছিল; সেই নিদারুণ নৃশংস ব্যাপারের সময়ে তিনি আর কি করিবেন, আপনার জয়ের জন্য মহা সমারোহে, উৎসব করিতে লাগিলেন। পঞ্চ দিবস পরে সেনারা শোণিত পানে বীততৃষ্ণ হইলে টাইমুর, টোগলক-নির্ম্মিত রম্য মসিদে, একান্ত অকপট ও কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, সর্ব্বান্তর্যামীর ধন্যবাদ করিয়া, প্রস্থানের আদেশ করিলেন। তিনি অমিত সম্পত্তি ও পুং স্ত্রী উভয় জাতীয় অসংখ্য বন্দী সঙ্গে লইয়া পরাবৃত্ত হইলেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অরাজকতা পশ্চাতে তদীয় অনুপম মহত্ত্বের কীর্ত্তন করিতে লাগিল। টাইমুর দিল্লী হইতে মিরহট্টে পঁহুছিয়া তন্নগরীয়দিগকে বলিদান দিলেন, পরে গঙ্গা পার হইয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে হিমালয়ের ধারে ধারে যাইয়া অবশেষে, জম্মু রাজ্য দিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

উপরি উক্ত ভয়ঙ্কর দাবদাহ নির্ব্বাণ হইলে, মামুদ দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতাপ একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল, আর পুনরুদিত হইল না। ১৪১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী পনর মাস

দৌলত খাঁ নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করেন। তৎপরে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা খিজির খাঁ নামা সায়দ * তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। ইনি টাইমুরকে ভারতবর্ষের সম্রাট্ ও আপনাকে তাঁহার অধীন শাসনকর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করেন। ইহাঁর পর ইহাঁর বংশোদ্ভব আর তিন জন সায়দ দিল্লীর রাজকার্য্যে অভিষিক্ত হন। ইহাঁদের সময়ে দিল্লীর অধিকার ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া প্রায় নগর-প্রাকারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন অন্ত্য সায়দরাজ আলাউদ্দিন পঞ্জাবপতি বিলোল খাঁ লোডির হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং বদাউন নগরে যাইয়া বসতি করিলেন।

বিলোল পাঠান জাতীয় লোডি বংশে উৎপন্ন। তাঁহার পিতামহ এক জন ধনবান্ বণিক্ ছিলেন। সেই বণিক ফিরোজ সম্রাটের সভায় এরূপ প্রতিপন্ন হইয়া উঠেন যে, মুলতানের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। তাঁহার পুত্রেরা বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র বিলোল পঞ্জাবের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলে, দুর্ব্বল সায়দ রাজারা লোডি বংশের ধ্বংস করিবার উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে লোডিরাই প্রবল হইলেন। তখন অন্তিম সায়দ রাজা অগত্যা বিলোলকে সিংহাসন প্রদান করিয়া স্বয়ং অপসৃত হইলেন। বিলোল ঊনচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার শৌর্য্যে সাম্রাজ্যের সীমা পুনর্ব্বার অনেক বিস্তৃত হয়। কিন্তু তখনও গঙ্গা ও বারাণসীর পূর্ব্বাঞ্চল, দিল্লী-সাম্রাজ্যে পুনর্যোজিত হইল

---

* মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের বংশসম্ভূত ব্যক্তিদিগকে সায়দ কহে। সায়দেরা বংশমর্য্যাদায় মুসলমান-সমাজে অতিশয় মান্য।

ন্দা। বিলোল রাজপদ পাইয়াও এত নম্র ছিলেন যে প্রায়ই সিংহাসনে উপবেশন বা রাজাভরণ ধারণ করিতেন না; তিনি বলিতেন যখন লোকে আমাকে রাজা বলিয়া জানে তখন আর বৃথা আড়ম্বরে প্রয়োজন কি। তিনি স্বয়ং বিদ্বান্ ছিলেন না, কিন্তু বিদ্বানদিগের প্রতি বিলক্ষণ বদান্যতা ও আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেন।

পর সম্রাট্ সেকেন্দর বিলোলের পুত্র। ইনিও দক্ষ এবং সামান্যতঃ বদান্য ও ন্যায়বান্ ছিলেন, কিন্তু ইহাঁরই রাজত্বে হিন্দুধর্ম্মের উপরে গুরুতর অত্যাচার প্রথম দেখা যায়। ইতিপূর্ব্বে মুসলমান রাজারা তদ্ধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ট করেন নাই। সেকেন্দর তীর্থ-পর্য্যটন, ও পর্ব্বাহে গঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র সরিতে স্নান নিষেধ এবং নানাস্থানের দেবালয় চূর্ণ করিলেন। একদা কোন ব্রাহ্মণ ঘোষণা করেন, "কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠান করিলে সকল প্রকার ধর্ম্মই পরমেশ্বরের সমান গ্রাহ্য"। সেকেন্দর তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন এবং তিনি আপনার অনন্যবিদ্বেষী মত পরিত্যাগে অস্বীকৃত হইলে, নিষ্ঠুর নৃপতি তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। কোন ইষ্টনিষ্ঠ মুসলমান তীর্থযাত্রা-প্রতিষেধ অন্যায় বলাতে "পাষণ্ড! পৌত্তলিকদিগের পোষকতা করিতেছিস্" বলিয়া রাজাকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইলে, তিনি উত্তর করিলেন "না, আমি তাহা করিতেছি না, আমি বলিতেছি রাজাদিগের প্রজাপীড়ন অতিশয় অন্যায়"। তচ্ছ্রবণে সেকেন্দর ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লীর অধিকার বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত পুনর্ব্বিস্তৃত হয়। বুন্দেলখণ্ডের দিকেও তিনি কতিপয় ভূভাগে দিল্লীর পতাকা উড্ডীন করেন। ১৫০৯ খৃঃ অব্দে সেকেন্দরের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

তখন তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।*

ইব্রাহিম সাহস ভিন্ন পিতার অন্য কোন গুণ দোষ অধিকার করেন নাই। তিনি অতিশয় অহঙ্কৃত ছিলেন। সর্ব্বদাই এই বলিতেন "রাজাদিগের কুটুম্ব নাই, অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সকলেই তাঁহাদের দাস"। ইতিপূর্ব্বে লোডিবংশীয় অমাত্যেরা রাজসমীপে আসন প্রাপ্ত হইতেন। ইঁহার সময়ে তাঁহাদিগকেও যোড়করে সিংহাসনপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে হইল। রাজার ঈদৃশ ব্যবহারে পুনঃ পুনঃ রাজদ্রোহ ও উপপ্লব উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ ইব্রাহিম তৎসমুদায় নিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোডি, টাইমুরের বংশোদ্ভব সুলতান বাবরকে আহ্বান করিলেন। তখন বাবর কাবুলের অধিপতি ছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি টাইমুরের স্বত্বাধিকারী বলিয়া ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য দাওয়া করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রফুল্লচিত্তে দৌলত খাঁর আহ্বান গ্রহণ করিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি এক দল প্রতিকূলসৈন্য পরাজয়পূর্ব্বক লাহোর ও অন্যান্য নগর অধিকার করিলেন এবং দিল্লীর অভিমুখে যাইতে লাগি-

---

* সেকেন্দরের রাজত্বসময়ে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবদিগের প্রবর্ত্তক চৈতন্য প্রাদুর্ভূত হন। বিলোলের রাজত্বকালে, ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গমস্থলে নবদ্বীপ নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে চৈতন্যের জন্ম হয়। তাঁহার চরিত্র অতি বিনীত ও বিশুদ্ধ ছিল। চৈতন্যের প্রাদুর্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিখগুরু নানক এবং নানকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একাত্মবাদী কবীর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অধুনা কবীর-শিষ্যেরা কবীরপন্থী নামে খ্যাত। শিখ ও বঙ্গ বৈষ্ণবদিগের ন্যায় কবীরপন্থীরাও সকল জাতীয় লোকদিগকেই আপনাদের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

লেন। কিন্তু পথিমধ্যে শুনিলেন বাহ্লিক প্রদেশে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তন্নিবারণার্থে কাবুলে ফিরিয়া গেলেন। অনধিক কালেই তত্রত্য গোলযোগ নিরাকরণ করিয়া, আবার ভারতবর্ষে আসিয়া পানীপথ নগরে ইব্রাহিমের লক্ষ যোদ্ধা ও সহস্র হস্তী পরিগণিত সেনা সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে দ্বাদশ সহস্র মাত্র সেনা ছিল, অতএব তিনি আত্মরক্ষাবিধানের উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। ইব্রাহিমও প্রথমতঃ সেই রূপ করিলেন, কিন্তু অধিককাল তদবস্থায় না থাকিয়া সেনাদিগকে আক্রমণের আজ্ঞা দিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইব্রাহিমের যোধগণ প্রথমতঃ তাড়িত, পরে পরাজিত ও পলায়িত হইল। তাঁহার অপরিমিত সেনা সমরশায়ী হইল, তন্মধ্যে তিনি স্বয়ংও নিপাতিত হইলেন। তিনিই ভারতবর্ষে পাঠানবংশীয় শেষ রাজা। এদেশের তৎপরবর্ত্তী মুসলমান রাজাদিগকে মোগলবংশীয় কহে। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদের আদি পুরুষ বাবর মোগল-ঔরস-সম্ভূত নহেন। তাঁহার জননী মোগলজাতীয়া ছিলেন বটে, কিন্তু পিতা তুরুষ্কজাতীয় টাইমুরের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। মাতৃসম্পর্ক-নিবন্ধনও মোগলদিগের প্রতি বাবরের বিশেষ অনুরাগ ছিল না, বরং তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বৃত্ততা জন্য তিনি তাহাদিগের অপ্রশংসাই করিতেন। অতএব তাঁহার স্থাপিত রাজবংশ মোগলবংশ নামে পরিচিত হওয়া বিস্ময়কর বোধ হয়। যাহা হউক, তাঁহার সময়ে পাঠান ভিন্ন সন্নিহিত অপরাপর জাতিবা ভারতবর্ষে মোগল এই সাধারণ নামেই উক্ত হইত। বোধ হয় সেই জন্যই তাঁহার বংশ মোগলবংশ নামে খ্যাত হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মোগল বংশ।

সুলতান বাবর।

সুপ্রসিদ্ধ টাইমুর খাঁর প্রপৌত্র আবু-সায়দের বহু পুত্র ছিল, তন্মধ্যে একজন সমরকণ্ড ও বুখারার, এক জন বাহ্লিকের, ও অন্য একজন কাবুলের অধিপতি হন। চতুর্থ পুত্র অমরশেখ মির্জ্জা প্রথমতঃ কাবুলের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন, পরে সমরকণ্ড ও কাশগড়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী ফর্গনা নামক প্রদেশে অভিষিক্ত হন। অমর, জঙ্গিস-খাঁর বংশজাতা কোন রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবর সেই বিবাহের সন্তান। তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া ফর্গনার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। অবিলম্বে তাঁহার সমরকণ্ডের পিতৃব্য ও মাতুল মামুদ মির্জ্জা তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ফল হইলেন। পরে স্বল্পকাল মধ্যেই সমরকণ্ডপতির আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। তাঁহার ভ্রাতা বাহ্লিক-রাজ সমরকণ্ডের ছত্র ধারণ করিলেন। কিন্তু অধিক দিন রাজত্ব করিবার পূর্ব্বেই তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন সমরকণ্ডে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সেই সুযোগে, পঞ্চদশবর্ষ-বয়স্ক বাবর তন্নগর আক্রমণ করিলেন। তিনি কয়েকবার নিষ্ফল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার অধ্যবসায় সকল অন্তরায়ের শিরে পদাঘাত করিল (১৪৯৭)।

বাবর সমরকণ্ড জয় করিলেন, কিন্তু অধিককাল রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার অধিক অর্থ সংস্থান ছিল না;

সৈনিকেরা বেতন অভাবে দলে দলে কর্ম্মত্যাগ ও সর্ব্বত্র অসন্তোষ বিস্তার করিতে লাগিল। অবশেষে টাম্বল নামে তাঁহার এক প্রধান অমাত্য, ফর্গনার সেনাদিগকে হস্তগত করিয়া, রাজবিদ্রোহী হইল। বাবর সেই বিদ্রোহ দমনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, শত দিবস অধিকারের পর, সমরকণ্ড হইতে নির্গত হইলেন। কিন্তু শত পদ যাইতে না যাইতেই সমরকণ্ডবাসীরা তাঁহার বশ্যতা অস্বীকার করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে বাবর সঙ্কট পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। বহুকৃচ্ছ্রে তাহা হইতে নিস্তার পাইয়া দেখিলেন সমরকণ্ড ও ফর্গনা উভয়ই অপহৃত হইয়াছে। তথাপি তিনি হতাশ হইলেন না, মাতুলের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যে সমরকণ্ড ও ফর্গনা উভয়েরই পুনর্লাভের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অবশেষে (১৪৯৯) শেষোক্ত রাজ্য অধিকৃত হইল এবং অল্পকাল মধ্যেই সমরকণ্ডবাসীরাও তাঁহাকে আহ্বান করিল। কিন্তু তথায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে শুনিলেন, উজবেকেরা আসিয়া তম্রগর ও বুখারা অধিকার করিয়াছে। এদিকে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে টাম্বল আবার ফর্গনা আত্মসাৎ করিয়া উঠিল। তখন বাবর দুই কূল হারাইয়া, অনন্যগতি হইয়া ফর্গনার দক্ষিণবর্ত্তী দুর্গমপর্ব্বত-পরম্পরায় আশ্রয় লইলেন। তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে সম্বাদ আসিল, উজবেক-ভূপতি সৈবানি সমরকণ্ড হইতে কোন দূরতর প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন। অমনি উদ্যোগী বাবর তম্রগর অধিকারের সঙ্কল্প করিলেন। তখন তাঁহার ২৪০ মাত্র সৈন্য ছিল। তিনি সেই স্বল্পবল ও রাত্রির অন্ধকার সহায় করিয়া, সমরকণ্ডে প্রবেশ-পূর্ব্বক সান্ত্রীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিলেন। নগরবাসীরা তাঁহার তাদৃশ

কার্য্য দর্শনে মনে করিল, তাঁহার সঙ্গে বিপুল সৈন্য আসিয়াছে, এজন্য তাহারা তাঁহারই স্বপক্ষ হইল। ক্রমে সমস্ত প্রদেশ তাঁহার প্রভুতা স্বীকার করিল। সৈবানি এতাবৎ শ্রবণে, অতি সত্বর ফিরিয়া আসিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। অগত্যা বুখারায় যাইয়া আশ্রয় লইলেন। বাবর সন্নিহিত রাজাদিগকে, সকলের সাধারণ শত্রু উজবেকদিগের প্রতিকূলে একযোগ করিবার নিমিত্ত বিস্তর বিফল চেষ্টা পাইলেন। অবশেষে তাঁহাকে একাকীই সংগ্রামে উজবেকদিগের সম্মুখীন হইতে হইল। তাঁহার দলভুক্ত অর্থপিশাচ মোগল সৈনিকেরা, কার্য্যকালে যুদ্ধে বিমুখ হইয়া, প্রতিপক্ষীয় শিবিরের দ্রব্যসামগ্রী লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল; বাবর একান্ত পরাজিত হইলেন। তখন সমরকণ্ডের সমুদায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া, তন্মধ্যে বদ্ধ থাকিলেন। সৈবানি নগর বেষ্টন করিলেন। বাবর চারি মাস কাল দুঃখ ও দুর্ভিক্ষ সহ্য করিয়া, অবশেষে পলায়ন করিলেন। অনন্তর, প্রায় দুই বৎসর বাবর মহাকষ্টে ও দারিদ্র্যে কালহরণ করেন। তাহাতে একদা নিতান্ত নিরাশ হইয়া, রাজ্যলালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক, চীনে যাইয়া হীন ও সামান্য অবস্থায় জীবনক্ষেপণ পর্য্যন্তও মানস করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, অবশেষে দৈববশে আর একবার ফর্গনার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তখন টাম্বল উজবেকদিগের সাহায্য যাচঞা করিল; তাহারা আসিলে নগরমধ্যে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল; অনন্তর বাবর পলায়ন করিলেন। পলায়নকালে ধৃত হইয়া বহু কষ্টের পর পুনর্ম্মোচন লাভ হইলে, সাইহুন নদীর উত্তরবর্ত্তী তাবৎ ভূভাগ উজবেকদিগের অধিকৃত দেখিয়া, প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দক্ষিণমুখে যাত্রা করিলেন।

তখন তাঁহার অনধিক তিন শত মাত্র অনুচর ছিল। অনেকের কেবল যষ্টি ভিন্ন অন্য অস্ত্র ছিল না। তাঁহার দুইটি মাত্র শিবির ছিল; তন্মধ্যে উৎকৃষ্টটি জননীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাবর বাহ্লিকে আসিলে তত্রত্য সেনারা তাঁহার অনুগত হইল। তিনি তাহাদের সাহায্যে কাবুলে প্রবেশ ও আধিপত্য স্থাপন করিলেন (১৫০৪)। তদবধি ঐ দেশ তাঁহার যাবজ্জীবন অধীন থাকে। বাবরের এত ভাগ্য-পরিবর্ত্ত বর্ণিত হইল, তথাপি কাবুল অধিকার করার সময়েও তাঁহার বয়স তেইশ বৎসরের অধিক হয় নাই।

কাবুলে থাকিয়া প্রাচীন শত্রু উজবেক, আফগানিস্তানের পর্ব্বতবাসী এবং টাইমুরবংশীয় নিজ জ্ঞাতি রাজাদিগের সহিত, বাবর অনেকবার সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং সময়ে সময়ে দারুণ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনাও ঘটে। যাহা হউক পরিশেষে তিনি ভারতবর্ষের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং স্বল্পকালমধ্যেই এদেশের অধিপতি হইয়া উঠেন।

পানীপথের যুদ্ধের পর দিল্লী ও আগরা বাবরের বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু গঙ্গার পূর্ব্বদিকের তাবৎ ভূভাগ এবং যমুনার পশ্চিমেরও অনেক স্থান অনধীন রহিল। তৎসমুদায় ভূতপূর্ব্ব পাঠান রাজাদিগের অমাত্য-কুলের অধিকৃত ছিল। ভারতবর্ষের গ্রীষ্মকাল শীতলদেশীয়দিগের পক্ষে স্বভাবতই দুঃসহ, বিশেষতঃ সে বার অসামান্য প্রচণ্ড হইয়া উঠে। বাবরের সেনারা তাহাতে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রতিনীত হইবার জন্য গোলযোগ করিতে লাগিল; কেহ কেহ বিনা অনুমতিতে যাইতে উদ্যত হইল। তখন বাবর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগকে একত্র করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষ লাভের জন্য আমরা

বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি ; এক্ষণে এত দূর সম্পন্ন করিয়া এই দেশ পরিত্যাগ করা নিতান্ত অব্যবস্থিতের কর্ম্ম। অতএব আমি প্রাণান্তেও ইহা হইতে অপসৃত হইব না, যাহাদের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা ফিরিয়া যাউন! বাবরের তাদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ ফলোপধায়িনী হইল। কেহ কেহ প্রতিগমনে সঙ্কল্প করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন। পাঠান বংশীয় অমাত্যেরাও দেখিলেন, বাবরের আক্রমণ টাইমুরের আক্রমণের ন্যায়, স্বল্পকালের জন্য নহে। পরন্তু নূতন নেতা ভারতবর্ষেই রাজত্ব করিবেন। অতএব তাঁহার প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশে পরিণামে বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। এই বিবেচনায় অনেকে আপনাহইতেই বশীভূত হইলেন। অবশিষ্টদিগকে যুবরাজ হুমায়ুন পরাজিত করিলেন।

মুসলমানেরা বশীভূত হইলে হিন্দুদিগের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আলাউদ্দিন খিলিজির সময় হইতে মেওয়ারের রজঃপুত রাজারা ক্রমশই পুনর্ব্বর্দ্ধন-শীল হইয়া আসিতেছিলেন। অধুনা সেই রজঃপুত-বংশীয় রাজা সঙ্গ মেওয়ারের অধিপতি, মালব দেশেরও পূর্ব্বভাগের করগ্রাহী এবং জয়পুর, মাড়োয়ার প্রভৃতির তাবৎ রজঃপুত রাজাদিগের অধিনায়ক হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। সঙ্গ নিয়তই দিল্লীশ্বরের অনিষ্ট কামনা করিতেন। যখন ইব্রাহিম দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, বাবর আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, সঙ্গ বাবরেরই শুভানুধ্যায়ী হন। কিন্তু এক্ষণে বাবর আর দিল্লীশ্বরের শত্রু নহেন, তিনি স্বয়ংই দিল্লীশ্বর। অতএব সঙ্গ তাঁহাকে পরম শত্রু জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

সঙ্গ, অন্যান্য রজঃপূত রাজা ও মামুদ নামে লোডি-বংশীয় এক জন রাজকুমারের সহিত মিলিত হইয়া, আগরার নয় ক্রোশ দক্ষিণে, শিক্রিতে উপস্থিত হইলেন এবং বাবরের প্রেরিত সেনার পুরোভাগ পরাস্ত করিলেন। তখন সেই ভয়াতুরদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলে অনায়াসেই জয়-লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তাহাতে বাবর সময় পাইয়া আপনার শিবির এরূপ রক্ষাকার্য্যে পরিবেষ্টিত করিলেন যে, তাঁহাকে আক্রমণ করা আর সহজ রহিল না। যাহা হউক, বাবরের দুর্ভাগ্যবশতঃ তৎকালে কাবুল হইতে এক জন বিখ্যাত কাকচরিত্র আসিয়া তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি, নভোমণ্ডলের আকার নিরীক্ষণ করিয়া, বাবরের সম্পূর্ণ পরাজয় হইবে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহার সেন ও সেনাপতিরা ভগ্নোদম হইল এবং কেহ কেহ পলায়ন করিতে লাগিল। কাকচরিত্রের গণনায় বাবরের অণুমাত্রও বিশ্বাস হয় নাই, তথাপি তাদৃশ ভয়াবহ বাক্যে যে, সেনাদিগের মন নিতান্ত ভীত হইবে, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। সেনারা ভীত হইলেই বা কোন্ বলে যুদ্ধ করিবেন। অতএব আশঙ্কা দূরীভূত করিয়া তাহাদের মনে সাহস সঞ্চার করিবার উদ্দেশে, বাবর দৈবানুকূল্য সাধন সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে মদ্যপান পরিত্যাগ ও শ্মশ্রুধারণ ব্রতগ্রহণ, দরিদ্রদিগকে সুবর্ণ ও রজত পানপাত্র বিতরণ, মুসলমানদিগের পক্ষে শুল্কের লাঘব করণ, ইত্যাদি স্বধর্ম্মানুমোদিত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের পর, তিনি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক, রণে ভঙ্গ দেওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম, আর জীবন

নশ্বর, কিন্তু কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী এই মর্ম্মে এক বক্তৃতা করিলেন। তচ্ছ্রবণানন্তর কর্ম্মচারীরা একবাক্য হইয়া শরীর পাতন অথবা রণে জয়সাধন উভয়ের অন্যতর প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর বাবর শিবির-সম্মুখে দণ্ডব্যূহ বিন্যাসপূর্ব্বক, অশ্বপৃষ্ঠে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বল্গিত হইয়া, সামান্য সেনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এদিকে হিন্দুরা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু বাবরের রণচাতুর্য্যে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। তাহাদের পক্ষে অনেক রাজার প্রাণবিয়োগ হইল এবং সঙ্গ অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। সমরাবসানে নির্লজ্জ কাকচরিত্র আসিয়া জয়লাভের জন্য অভিনন্দন করিতে লাগিল। বাবর প্রচুর গালি বর্ষণ করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে দূরীভূত হইবার আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু সে বহুকালের ভৃত্য, এই বিবেচনায় কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন।

রাজা সঙ্গের সহিত সংগ্রাম কালে বাবরের ভারতবর্ষীয় অধিকারের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ছয় মাসে তিনি তৎসমুদায়ের প্রতিকার করিয়া, অযোধ্যা ভিন্ন অবশিষ্ট সর্ব্বত্র আপনার আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে অযোধ্যার জয়ের জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। স্বয়ং মেদিনী নামে রাজার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। মেদিনী রজঃপূতবংশ-সম্ভূত এবং রাজা সঙ্গের মিত্র ছিলেন; বুন্দেলখণ্ডের প্রান্তে চন্দেরী নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। বাবরের আগমনে তত্রত্য রজঃপূতেরা আপনাদের অভ্যস্ত প্রথানুসারে আত্মঘাত করিল, চন্দেরী বাবরের হস্তগত হইল। অনন্তর তিনি অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন এবং তত্রত্য বিদ্রোহীদিগকে বাঙ্গালায় তাড়াইয়া দিলেন।

পরে, বিহার প্রদেশ সম্যক্‌রূপে আত্মসাৎ করিয়া, নিজ রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত লোডি বংশীয় মামুদ আসিয়া বিহার প্রদেশ আক্রমণ করাতে, বাবরকে তথায় উপস্থিত হইতে হইল। বাবরের আগমনেই মামুদের সেনারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং তিনি স্বয়ংও পলায়িত হইলেন।

মহম্মদ টোগলকের রাজত্ব কালে, পাঠানবংশীয় কোন অমাত্যের অধীনে, বাঙ্গালা প্রদেশ, দিল্লীর অধীনত উচ্ছেদ করিয়া, একটী স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া উঠে। বাবর বিহারের অন্যান্য ভাগ, অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত উত্তর খণ্ড বাঙ্গালা রাজ্যের অধীন ছিল; বঙ্গরাজ সেই ভাগ রক্ষার্থ দৃঢ় সঙ্কল্প করেন। বাবরও তদ্‌গ্রহণার্থ বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হন। চরমে বাবরের অধ্যবসায়ই সফল হয়। তিনি বঙ্গরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং গঙ্গা ও গর্ঘরা নদী পার হইয়া, বঙ্গ সেনাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দেন। তখন বঙ্গরাজ সন্ধিপ্রার্থনায় কৃতকার্য্য হইয়া নিস্তার পান। অতঃপর বাবর আগরা প্রতিগমনের উদ্‌যোগ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে কয়েক জন পাঠান লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিয়াছে সম্বাদ আইসে। বাবর অবিলম্বে তথায় যাইয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করেন এবং সেই পলায়মান বিদ্রোহীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একদল সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন।

ইতিপূর্ব্বেই বাবরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। অধুনা ক্রমশই পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সময়েই তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সঙ্কট রোগে আক্রান্ত হইলেন। বৈদ্যেরা তাঁহার প্রতিকার সাধনে নিরাশ হইল। তখন বাবর

আত্মজীবন সমর্পণ করিয়া পুত্রের প্রাণরক্ষার সঙ্কল্প করিলেন। কতকগুলি লোকের বিশ্বাস আছে মুমূর্ষু ব্যক্তির বিনিময়ে কেহ আত্মজীবন বিসর্জ্জনে স্বীকৃত হইয়া কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিধানের অনুষ্ঠান করিলে প্রথমোক্তের রোগমুক্তি ও শেষোক্তের মৃত্যু হয়। বাবর সেই সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন; তাহাতে পিতা পুত্র উভয়েরই মনে দৃঢ় সংস্কার জন্মিল যে তৎসমুদায় সফল হইয়াছে। হুমায়ুন সুস্থ হইয়া উঠিলেন, বাবর ক্রমে ক্রমে মৃতকল্প হইয়া আসিলেন। তখন পুত্র ও মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া, আপনার অন্তিম অভিপ্রায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, পরস্পর ঐক্য ও প্রীতি রক্ষার্থে অনুনয় করিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন ১৫৩০)। মৃত্যুসময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর। ভারতবর্ষে তিনি চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বাবরের প্রচুর শৌর্য্য ও দক্ষতা তদীয় কার্য্য-পরম্পরা বিলক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছে এবং তাঁহার স্বহস্তলিখিত আত্মোক্তিবৃত্তে তদীয় মনস্বিত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সেই সুলিখিত অকপট আখ্যায়িকায় জ্ঞাত হওয়া যায় তাঁহার চিত্ত অতি প্রফুল্ল ও অক্ষুব্ধ ছিল, কোনরূপ ভাগ্যবিপ্লবে বিমনা হইত না। তিনি বন্ধুবর্গের প্রতি সদয় ও বৎসল ছিলেন এবং তাহাদিগকে আপনার সমান মর্য্যাদাপন্নের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার স্বভাব বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী ও অতিশয় আসঙ্গলিপ্সু ছিল। তিনি তরুলতাকুসুমশোভিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে একান্ত প্রীত হইতেন এবং অতি ব্যস্ততার সময়েও রম্য স্থানে উপস্থিত হইলে উহা অনবলোকিত রাখিয়া যাইতেন না। আহারাদি বিষয়ে তাঁহার কিছুই আড়ম্বর ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন "সমরকণ্ড হইতে অপসারিত হইলে

পর, যে দিন উদরপূরিয়া আহার এবং চিন্তা ও উৎকণ্ঠা-শূন্য চিত্তে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে পাইলাম, সেই দিন যেমন নির্ম্মল সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম তেমন আর কখনই হয় নাই। তিনি কিছুমাত্র বিলাসী ছিলেন না। নদী পার হইবার সময়ে প্রায়ই জলযান ব্যবহার করিতেন না, স্বয়ং সন্তরণ দ্বারা পার হইতেন। তিনি বহু-পর্য্যটন করিতেও ভাল বাসিতেন। প্রবল দোষের মধ্যে তিনি অতিশয় সুরাসক্ত ছিলেন। শেষ বয়সে সেই দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যৌবন কালের অমিতাচারেই তাঁহার আয়ুষ্কাল সঙ্ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। যাহা হউক, সমুদায় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাবরের তুল্য মহান্ সম্রাট্ ভারতবর্ষে অধিক হয় নাই। ফলতঃ মোগলবংশের শিরোভূষণস্বরূপ মহারাজ আকবর ভিন্ন, আর কাহাকেই বাবরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হুমায়ুন।

হুমায়ুন ভিন্ন কামরান, হিণ্ডাল ও মির্জ্জা আস্করি নামে বাবরের আর তিন পুত্র ছিল। কামরান কাবুলের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। হিণ্ডাল ও আস্করির উপরে কোন ভার সমর্পিত ছিল না। পিতৃবিয়োগের পর হুমায়ুন তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং বিদ্রোহ না ঘটে এই মানসে, কামরানকে পঞ্জাব ও তৎপশ্চিমস্থ তাবৎ রাজ্যের আধিপত্য এবং হিণ্ডাল ও আস্করিকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত দুই প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান

করিলেন। রাজত্বের আরম্ভেই, জোয়ানপুর ও বিহারে কতিপয় পাঠান বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করে, কিন্তু সম্রাটের স্বল্প আয়াসেই তাহারা পুনর্ব্বশীভূত হইয়া আইসে। তদনন্তর গুজরাটের রাজা পাঠান-বংশোদ্ভব বাহাদুর সাহার সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তৎকালে বাহাদুরের প্রবল প্রতাপ, তিনি মালব দেশ পরাজয় এবং দাক্ষিণাত্যের সন্নিহিত ভাগের রাজাদিগের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আপনা হইতেই অকৃতাপরাধ সম্রাটের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হন। হুমায়ুন প্রতিকারসঙ্কল্পে গুজরাটে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শত্রুসৈন্য মন্দিসর নগরে, সুরক্ষিত শিবিরে, অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে অনেক গোলাগুলিও রহিয়াছে, এবং তৎসমুদায়ের প্রয়োগ জন্য এক জন কন্সটান্টিনোপলবাসী তুরুষ্ক ও কতিপয় পর্টুগিজ নিযুক্ত আছে। ভারতবর্ষীয় সংগ্রামে ইয়ুরোপীয়দিগের সেই প্রথম সংস্রব। হুমায়ুন শত্রুশিবির আক্রমণ না করিয়া অবরোধ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই আসার প্রসার * রুদ্ধ হওয়ায় দুর্ভিক্ষ-ভয়ে বাহাদুর, আপনার সমুদায় কামান বিনষ্ট করিয়া, রাত্রিযোগে প্রায় একাকীই, পলায়ন করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার সেনারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তিনি প্রথমতঃ মান্দু, পরে চাম্পানর, তথা হইতে খাম্বাজে পলায়িত হইয়া, অবশেষে ডিউ নগরে আশ্রয় লইলেন। হুমায়ুন সেই পলায়মান রাজার অনুসরণে ক্ষান্ত হইয়া, গুজরাট দেশ স্ববশে আনয়ন জন্য মনোনিবেশ করিলেন। সমতলভাগ সহজেই অধিকৃত

* আসার মিত্রসৈন্য, প্রসার তৃণ কাষ্ঠাদির প্রবেশ। আসার-প্রসার মিত্রসৈন্য এবং তৃণ কাষ্ঠ ও ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রবেশ।

হইল, কিন্তু চাম্পানরের গিরিদুর্গ বহুকাল তাঁহার সমস্ত যত্ন বিফল করিল। অবশেষে এক রজনীতে স্বয়ং, ২৯৯ সাংযুগীনের সহিত, পর্ব্বত-কটকে লৌহ-কীলক প্রোত করিয়া, আরোহণ করিলেন। এদিকেও অবশিষ্ট সেনারা দুর্গের এক দ্বার আক্রমণ করিল। তখন দুর্গ গৃহীত হইল (১৫৩৫)।

চাম্পানরের অধিকারের অল্পকাল পরেই, বিহারে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে এই বার্ত্তা শ্রবণে, হুমায়ুন, মির্জা আস্করির উপরে গুজরাটের ভার সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং আগরায় যাত্রা করিলেন। সম্রাট বিবৃত্তমুখ হইবা-মাত্রেই তন্নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা গুজরাটে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে ব্যতিব্যস্ত হইল। সেই সুযোগে বাহাদুর তাহা-দিগকে অনায়াসে দূর করিয়া দিলেন। এদিকে হুমায়ুন আগরায় আসিয়া স্বল্পকালমধ্যেই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

সেই শত্রুর নাম সের খাঁ। তিনি পাঠানবংশীয় এক জন অমাত্যের পুত্র; বিহার দেশ তাঁহার জন্মস্থান। তিনি অতিশয় দক্ষ ও চতুর ছিলেন। সের, বাবরের সময় হইতে আপন ভাগ্যোন্নয়নে সযত্ন হন। বিবিধ বিপ্লবের পর তিনি বিহারের কর্ত্তা হইয়া উঠেন। তৎপরে বঙ্গ দেশের পরাজয়-সাধন-মানসে, তত্রত্য রাজধানী গৌড় অবরোধ করেন; এমন সময়ে হুমায়ুন আসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সের, পথিমধ্যে সম্রা-টকে ব্যাপৃত রাখিয়া, নির্ব্বিঘ্নে বাঙ্গালার পরাজয় সম্পা-দন সঙ্কল্পে, বারাণসীর সন্নিকর্ষে, গঙ্গার তটস্থ চণ্ডাল-গড়ে দীর্ঘকাল অবরোধ-সহনোপযোগী তাবৎ উপকর-ণের সহিত, বহুসঙ্খ্য সেনা স্থাপন করিলেন। হুমায়ুন

আত্মজীবন সমর্পণ করিয়া পুত্রের প্রাণরক্ষার সঙ্কল্প করিলেন। কতকগুলি লোকের বিশ্বাস আছে মুমূর্ষু ব্যক্তির বিনিময়ে কেহ আত্মজীবন বিসর্জ্জনে স্বীকৃত হইয়া কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিধানের অনুষ্ঠান করিলে প্রথমোক্তের রোগমুক্তি ও শেষোক্তের মৃত্যু হয়। বাবর সেই সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন, তাহাতে পিতা পুত্র উভয়েরই মনে দৃঢ় সংস্কার জন্মিল যে তৎসমুদায় সফল হইয়াছে। হুমায়ুন সুস্থ হইয়া উঠিলেন বাবর ক্রমে ক্রমে মৃতকল্প হইয়া আসিলেন। তখন পুত্র ও মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া, আপনার অন্তিম অভিপ্রায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, পরস্পর ঐক্য ও প্রীতি রক্ষার্থে অনুনয় করিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন (১৫৩০)। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর। ভারতবর্ষে তিনি চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বাবরের প্রচুর শৌর্য্য ও দক্ষতা তদীয় কার্য্য-পরম্পরা বিলক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছে এবং তাঁহার স্বহস্তলিখিত আত্মোক্তিবৃত্তে তদীয় মনস্বিত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সেই সুলিখিত অকপট আখ্যায়িকায় জ্ঞাত হওয়া যায় তাঁহার চিত্ত অতি প্রফুল্ল ও অক্ষুব্ধ ছিল, কোনরূপ ভাগ্য বিপ্লবে বিষণ্ন হইত না। তিনি বন্ধুবর্গের প্রতি সদয় ও বৎসল ছিলেন এবং তাহাদিগকে আপনার সমান মর্য্যাদাপন্নের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার স্বভাব বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী ও অতিশয় আসঙ্গলিপ্সু ছিল। তিনি তরুলতাকুসুমশোভিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে একান্ত প্রীত হইতেন এবং অতি ব্যস্ততার সময়েও রম্য স্থানে উপস্থিত হইলে উহা অনবলোকিত রাখিয়া যাইতেন না। আহারাদি বিষয়ে তাঁহার কিছুই আড়ম্বর ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন "সমরকণ্ড হইতে অপসারিত হইলে

পর, যে দিন উদর পূরিয়া আহার এবং চিন্তা ও উৎকণ্ঠা-শূন্য চিত্তে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে পাইলাম, সেই দিন যেমন নির্ম্মল সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম তেমন আর কখনই হয় নাই। তিনি কিছুমাত্র বিলাসী ছিলেন না। নদী পার হইবার সময়ে প্রায়ই জলযান ব্যবহার করিতেন না, স্বয়ং সন্তরণ দ্বারা পার হইতেন। তিনি বহু-পর্য্যটন করিতেও ভাল বাসিতেন। প্রবল দোষের মধ্যে তিনি অতিশয় সুরাসক্ত ছিলেন। শেষ বয়সে সেই দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যৌবন কালের অমিতাচারেই তাঁহার আয়ুষ্কাল সঙ্ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। যাহা হউক, সমুদায় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাবরের তুল্য মহান্ সম্রাট ভারতবর্ষে অধিক হয় নাই। ফলতঃ মোগলবংশের শিরোভূষণস্বরূপ মহারাজ আকবর ভিন্ন, আর কাহাকেই বাবরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হুমায়ুন।

হুমায়ুন ভিন্ন কামরান, হিণ্ডাল ও মির্জ্জা আস্করি নামে বাবরের আর তিন পুত্র ছিল। কামরান কাবুলের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। হিণ্ডাল ও আস্করির উপরে কোন ভার সমর্পিত ছিল না। পিতৃবিয়োগের পর হুমায়ুন তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং বিদ্রোহ না ঘটে এই মানসে, কামরানকে পঞ্জাব ও তৎপশ্চিমস্থ তাবৎ রাজ্যের আধিপত্য এবং হিণ্ডাল ও আস্করিকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত দুই প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান

করিলেন। রাজত্বের আরম্ভেই, জোয়ানপুর ও বিহারে কতিপয় পাঠান বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করে, কিন্তু সম্রাটের স্বল্প আয়াসেই তাহারা পুনর্ব্বশীভূত হইয়া আইসে। তদনন্তর গুজরাটের রাজা পাঠান-বংশোদ্ভব বাহাদুর সাহার সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তৎকালে বাহাদুরের প্রবল প্রতাপ, তিনি মালব দেশ পরাজয় এবং দাক্ষিণাত্যের সন্নিহিত ভাগের রাজাদিগের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আপনা হইতেই অকৃতাপরাধ সম্রাটের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হন। হুমায়ুন প্রতিকারসঙ্কল্পে গুজরাটে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শত্রুসৈন্য মন্দিসর নগরে, সুরক্ষিত শিবিরে, অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে অনেক গোলাগুলিও রহিয়াছে, এবং তৎসমুদায়ের প্রয়োগ জন্য এক জন কন্সটান্টিনোপলবাসী তুরুষ্ক ও কতিপয় পর্টুগিজ নিযুক্ত আছে। ভারতবর্ষীয় সংগ্রামে ইয়ুরোপীয়দিগের সেই প্রথম সংস্রব। হুমায়ুন শত্রুশিবির আক্রমণ না করিয়া অবরোধ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই আসার প্রসার * রুদ্ধ হওয়ায় দুর্ভিক্ষ-ভয়ে বাহাদুর, আপনার সমুদায় কামান বিনষ্ট করিয়া, রাত্রিযোগে প্রায় একাকীই, পলায়ন করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার সেনারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তিনি প্রথমতঃ মান্ডু, পরে চাম্পানর, তথা হইতে খাম্বাজে পলায়িত হইয়া, অবশেষে ডিউ নগরে আশ্রয় লইলেন। হুমায়ুন সেই পলায়মান রাজার অনুসরণে ক্ষান্ত হইয়া, গুজরাট দেশ স্ববশে আনয়ন জন্য মনোনিবেশ করিলেন। সমতলভাগ সহজেই অধিকৃত

* আসার মিত্রসৈন্য, প্রসার তৃণ কাষ্ঠাদির প্রবেশ। আসারপ্রসার মিত্রসৈন্য এবং তৃণ কাষ্ঠ ও ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রবেশ।

হইল, কিন্তু চাম্পানরের গিরিদুর্গ বহুকাল তাঁহার সমস্ত যত্ন বিফল করিল। অবশেষে এক রজনীতে স্বয়ং, ২৯৯ সাংযুগীনের সহিত, পর্ব্বত-কটকে লৌহ-কীলক প্রোত করিয়া, আরোহণ করিলেন। এদিকেও অবশিষ্ট সেনারা দুর্গের এক দ্বার আক্রমণ করিল। তখন দুর্গ গৃহীত হইল (১৫৩৫)।

চাম্পানরের অধিকারের অল্পকাল পরেই, বিহারে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে এই বার্ত্তা শ্রবণে, হুমায়ুন, মির্জা আস্করির উপরে গুজরাটের ভার সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং আগরায় যাত্রা করিলেন। সম্রাট বিমুখ হইবা-মাত্রেই তন্নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা গুজরাটে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে ব্যতিব্যস্ত হইল। সেই সুযোগে বাহাদুর তাহা-দিগকে অনায়াসে দূর করিয়া দিলেন। এদিকে হুমায়ুন আগরায় আসিয়া স্বল্পকালমধ্যেই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

সেই শত্রুর নাম সের খাঁ। তিনি পাঠানবংশীয় এক জন অমাত্যের পুত্র; বিহার দেশ তাঁহার জন্মস্থান। তিনি অতিশয় দক্ষ ও চতুর ছিলেন। সের, বাবরের সময় হইতে আপন ভাগ্যোন্নয়নে সযত্ন হন। বিবিধ বিপ্লবের পর তিনি বিহারের কর্ত্তা হইয়া উঠেন। তৎপরে বঙ্গ দেশের পরাজয়-সাধন-মানসে, তত্রত্য রাজধানী গৌড় অবরোধ করেন; এমন সময়ে হুমায়ুন আসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সের, পথিমধ্যে সম্রা-টকে ব্যাপৃত রাখিয়া, নির্ব্বিঘ্নে বাঙ্গালার পরাজয় সম্পা-দন সঙ্কল্পে, বারাণসীর সন্নিকর্ষে, গঙ্গার তটস্থ চুণাল-গড়ে দীর্ঘকাল অবরোধ-সহনোপযোগী তাবৎ উপকর-ণের সহিত, বহুসংখ্যা সেনা স্থাপন করিলেন। হুমায়ুন

আসিয়া সেই গড় নিরুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে উহা গৃহীত হইল, এদিকে সেরও বাঙ্গালা জয় করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখনও সমুদায় অভিপ্রেত বন্দোবস্ত সম্পন্ন না হওয়ায়, বাঙ্গালার ক্ষেত্র, সিক্রাগলিতে কিয়দংশ সৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক আরও কিছুকাল হুমায়ুনের আগমন ব্যাঘাত করিলেন। এবং সেই অবসরে, আপনার পরিবার ও সম্পত্তি রোটাসগড়ে আনিয়া, বাঙ্গালা হইতে বহির্গত হইলেন। তখন সিক্রাগলির সেনারাও সেরের পূর্ব্ব আদেশানুসারে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। হুমায়ুন নির্ব্বিঘ্নে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া, বিনা যুদ্ধে, গৌড় অধিকার করিলেন। বর্ষাকালও উপস্থিত হইল। দেশ প্লাবিত হওয়াতে সৈনিক কার্য্য একবারে বন্ধ হইয়া উঠিল এবং সম্রাটের সেনারা তৎকালীন কদর্য্য জল বাতাসে পীড়িত হইতে লাগিল। অবশেষে বর্ষার অবসানমাত্র আপন আপন দেশে পলায়ন আরম্ভ করিল। তখন হুমায়ুন দেখিলেন প্রতিগমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে সের খাঁও আপনার আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন এবং বিহার, বারাণসী ও চণ্ডালগড় অধিকার পূর্ব্বক কনোজ পর্য্যন্ত সেনা প্রেরণ, ও জোয়ানপুর অবরোধ করিলেন। অধিকন্তু আপনার নির্ভীকতাপ্রদর্শনজন্য এই সময়েই রাজ-উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৫৩৮)।

হুমায়ুন স্বয়ং প্রতিগমন আরম্ভ করার পূর্ব্বে কিয়দংশ সৈন্যের সহিত একজন প্রধান সেনানীকে অগ্রে পাঠাইয়াছিলেন। সেই পুরোগ সৈন্য মুঙ্গের পঁহুছিলে, সের খাঁর প্রেরিত সেনারা তাহাদিগকে পরাজয় করিল। পরে হুমায়ুন স্বয়ং আসিয়া বক্সারে উপস্থিত হইলে, সেরও

স্বয়ং আসিয়া তথায় উত্তীর্ণ হইলেন। সের, সে দিন ষোল ক্রোশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, সম্রাটের কর্ম্মচারীরা সেই ক্লান্ত অবস্থায় তাঁহাকে আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। হুমায়ুন তাহা করিলেন না। কিন্তু পর দিন দেখিলেন সেরের শিবির রক্ষাকার্য্যে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তখন সম্রাটও আপন শিবির তদ্রূপ করিলেন এবং গঙ্গার উপরে নৌসেতু সঙ্ঘটন করিতে লাগিলেন। সের দুই মাস পর্য্যন্ত কোনরূপ বিঘ্নচেষ্টা করিলেন না; তৎপরে একদা আপন শিবির হইতে কিয়দংশ সৈন্যের সহিত গুপ্তভাবে হুমায়ুনের পার্শ্বদেশে আসিয়া, রাত্রিযোগে ধাবিত হইয়া, প্রত্যূষে তাঁহার শিবির আক্রমণ করিলেন। হুমায়ুন কেবল অশ্বপৃষ্ঠে উঠিতে অবসর পাইলেন। তিনি আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইতে যাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে আত্মরক্ষার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন এবং একজন অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া তাঁহাকে নদীর তটে টানিয়া আনিলেন। হুমায়ুন, সন্তরণ দ্বারা পার হইবার মানসে গঙ্গায় অবরোহণ করিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া তাঁহার অশ্ব ক্লান্ত ও নিমগ্ন হইল। তাঁহারও তদ্রূপ দশা ঘটিত, কিন্তু অনুকূল দৈববশে অনতিদূরে একজন ভিস্তিওয়ালা আপনার ভিস্তি স্ফীত করিয়া তদুপরি পার হইতেছিল। সে সম্রাটকে তাহার পার্শ্বে তুলিয়া লইল। হুমায়ুন স্বয়ং আগরায় পঁহুছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিহত অথবা জলনিমগ্ন হইল এবং তাঁহার রাজ্ঞী সেরের হস্তে পতিত হইলেন। সের প্রগাঢ় সম্মান ও ভদ্রতা প্রদর্শন করিয়া, সেই বন্দীভূতা সম্রাটসীমন্তিনীকে এক নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন (১৫৩৯)।

অতঃপর সের বাঙ্গালার বন্দোবস্ত করিতে গেলেন।

হুমায়ুন, কামরানের সাহায্যে, আর এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। আট নয় মাস পরে উভয়ে, কনোজের সন্নিধানে, গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন পারে আসিয়া আবার সম্মুখীন হইলেন। হুমায়ুনের সৈনিকেরা কেহ কেহ তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ আরম্ভ করায় তিনি, নৌসেতু দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া, যুদ্ধার্থী হইলেন। দৈব আবার তাঁহার উপর বাম হইল, তাঁহার সমস্ত সৈন্য পরাভূত ও নদীগর্ভে দূরীকৃত হইয়া আসিল। হুমায়ুনের অশ্ব আহত হওয়ায় তিনি এক করিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক হস্তিপককে পারে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। সে অস্বীকার করিল; তখন হুমায়ুন তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া দৈবাগত এক বর্ব্বরকে তাহার স্থানে বসাইলেন। করী পরপারে উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু তথাকার তট এমনি বন্ধুর যে জল হইতে উঠিতে পারিল না। সম্রাট্ সম্পূর্ণ বিপন্ন হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার দুইজন সৈনিক আসিয়া, তাহাদের পাগড়ি পরস্পর জড়াইয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে উত্তোলন করিল। অল্পকালমধ্যেই হিণ্ডাল, আস্কেরি ও কিয়দংশ সেনা আসিয়া তাঁহার সহিত একত্র হইল। সকলে সত্বরপদে আগরায় উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় দিল্লী ও আগরার সঞ্চিত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করিতে না করিতে, সেরের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে হুমায়ুন লাহোরে পলায়ন করিলেন।

জ্যেষ্ঠ স্বীয় রাজ্যে আসিলে কামরান, অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত, পঞ্জাব সমর্পণ দ্বারা, সেরখাঁর সহিত সন্ধি করিয়া স্বয়ং কাবুলে প্রস্থান করিলেন। হুমায়ুন কিছুকাল সিন্ধুদেশে আপনার আধিপত্য স্থাপনের বিফল চেষ্টা পাইলেন। অবশেষে মাড়োয়ার-পতি মালদেবের শরণাপন্ন হইতে বাসনা করিলেন। কিন্তু

অন্তর্ব্বর্ত্তী মরুস্থল অতিক্রমণ দ্বারা, যোধপুরে পঁহুছিয়া দেখিলেন, রাজা তাঁহার প্রতি অণুমাত্রও অনুকূল নহেন। তখন অমরকোঠে যাইতে মনস্থ করিলেন। মধ্যবর্ত্তী মরুভূমির পর্য্যটনে তাঁহার অনুচরবর্গের ভয়ঙ্কর কষ্ট উপস্থিত হয়। অন্যত্র সুবর্ণ যেরূপ মহার্ঘ ও দুর্লভ, তথায় সামান্য জল সেইরূপ। তৎপ্রাপ্তির জন্য তত্রত্য অধিবাসিদের সহিত আগন্তুকদিগের সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবশেষে শেষোক্তেরা লোকালয় অতিক্রমণ করিয়া মরুগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, বহুল অশ্বসেনা তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। পরে যখন অবধারিত হইল যোধপুরের যুবরাজ তৎসমুদায়ের নেতা তখন আর ভয়ের পরিসীমা রহিল না। অধিকন্তু মহিলাগণ সমভিব্যাহারে থাকায় হুমায়ুনের তাবৎ কুচিন্তাই উদ্রিক্ত হইল। ক্রমে রাজপুতেরা আসিয়া সমুদায় কূপ অধিকার করিল; মুসলমানেরা একবারে হতাশ হইয়া পড়িল; কিন্তু "বিপন্ন শত্রুর উৎপীড়ন অনুচিত," হিন্দুরা পূর্ব্বপুরুষদিগের এই পবিত্র নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলেন না। তাঁহারা অবিগ্রহসূচক শ্বেত পতাকা উড্ডীন করিয়া, মুসলমানদিগের সমীপস্থ হইলেন এবং রাজার অনুমতি বিনা যোধপুরে প্রবেশ ও তথায় গোহত্যা করার জন্য ভৎসনা করিয়া, অবশেষে জলোত্তোলন ও নির্ব্বিঘ্নে গমনে অনুমতি দিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তখনও মরুস্থলের স্বাভাবিক ভীষণ যন্ত্রণার বিরাম হইল না, সকলেই তাহাতে অভিভূত হইল, অনেকের মৃত্যুও ঘটিল। অবশেষে যখন হুমায়ুন অমরকোঠে উত্তীর্ণ হইলেন তখন তাঁহার সাত জন মাত্র সমভিব্যাহারী ছিল। পরে ক্রমশঃ অবশিষ্টেরা আসিয়া মিলিত হইল। অমরকোঠবাসী রাণাপ্রসাদ হুমায়ুনের

যথেষ্ট অভ্যর্থনা এবং সিন্ধুদেশ জয় করণেও সহায়তা অঙ্গীকার করিলেন।

এই দুঃখের সময় বিখ্যাত আকবর ভূমিষ্ঠ হইলেন। তিনি এক পারসীক সীমন্তিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন (১৫৪২)। রাজ্যচ্যুত হুমায়ুন যৎকালে অনুসিন্ধু প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে এক দিন বিমাতার অন্তঃপুরে সেই রমণীকে দেখিয়া তদীয় রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হন এবং তাঁহাকে অনূঢ়া পাইয়া ত্বরায় তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। মরুস্থলী অতিক্রমণ সময়ে তিনি প্রায় পূর্ণগর্ভা হইয়াছিলেন। হুমায়ুনের এক জন অমাত্য তাঁহাকে একটী ঘোটক প্রদান করিয়াছিল, তিনি তদুপরি আসিতেছিলেন; এমন সময়ে সেই অমাত্যের স্বীয় ঘোটক ক্লান্ত হইয়া উঠিল। তখন সে সেই পূর্ণগর্ভা আতপ-তাপিতা রাজ্ঞীকে অগ্নিবৎ বালুকায় অবরোহণ করাইয়া, প্রদত্ত ঘোটক ফিরাইয়া লইল। হুমায়ুন অগত্যা রাজ্ঞীকে আপন তুরঙ্গ দিয়া স্বয়ং পার্শ্বে পার্শ্বে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। অবশেষে একটা ভারবাহী উষ্ট্র প্রাপ্ত হইলেন। যখন অমরকোঠে আকবরের জন্ম হয়, তখন হুমায়ুন সিন্ধুদেশে গমন করিয়াছিলেন। নবকুমার হইয়াছে সম্বাদ আসিল। হুমায়ুনের একটী কস্তুরীশিশি ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না যে বন্ধুবর্গকে তৎসময়োচিত উপহার প্রদান করেন। অগত্যা সেই শিশিটী ভগ্ন করিয়া "যেমন ইহার সদ্‌গন্ধ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে তেমনি যেন আমার পুত্রের যশঃ জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়" এই বলিয়া শিশির আধেয় বন্ধুবর্গকে বিতরণ করিলেন।

সিন্ধুদেশের জয়ের জন্য হুমায়ুনের নিজের শত জন সেনাও ছিল না, কিন্তু রাণাপ্রসাদ তাঁহার সহিত মিলিত

হওয়ায় সন্নিহিত অপরাপর হিন্দুরাজারাও সপক্ষ হইলেন। সমুদায়ে প্রায় ১৫,০০০ অশ্বারোহী একত্র হইল। কিন্তু হুমায়ুনের মন্দভাগ্য বা মন্দ বুদ্ধি সেই সমুদয় আয়োজন বিফল করিল। একজন মোগল রাণাপ্রসাদকে বিদ্রূপ করায়, তিনি হুমায়ুনের নিকট অভিযোগ করিলেন, কিন্তু তাহাতে এত অল্প প্রতিকার হইল যে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বগণ সহিত চলিয়া গেলেন। তখন হুমায়ুন স্বীয় ক্ষমতায় সিন্ধুদেশের পরাজয় চেষ্টা বিফল জানিয়া, কাণ্ডাহারে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কামরানের অধীনে, মির্জা আস্করি ঐ স্থানের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হুমায়ুন প্রচার করিলেন কাণ্ডাহারে পুত্রকে রাখিয়া স্বয়ং মক্কা তীর্থে গমন করিবেন। কাণ্ডাহারের আটান্ন ক্রোশ দক্ষিণে উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার কোন প্রাচীন বন্ধুর প্রেরিত একজন অশ্বারোহী বেগে আসিয়া সম্বাদ দিল "আপনাকে বন্দী করিবার অভিসন্ধিতে, আস্করি সন্নিহিত হইতেছে, শীঘ্র পলায়ন করুন।" হুমায়ুন কেবল রাজ্ঞীকে আপনার অশ্বে তুলিয়া লইতে অবসর পাইলেন, আকবরকে অগত্যা তাহার পিতৃব্যের করুণায় সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আস্করি আসিয়া, নিজের কোন অসদভিপ্রায় ছিল না, এই ভান করিলেন এবং ভ্রাতৃপুত্রের প্রতি স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া কাণ্ডাহারে পরাবৃত্ত হইলেন। এ দিকে হুমায়ুন পারসীকরাজের অধিকারে প্রবিষ্ট এবং তন্নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা দ্বারা মহাসমাদরে গৃহীত হইয়া, ভূপতির আজ্ঞা প্রতীক্ষার জন্য, রাজধানী হিরাতে প্রেরিত হইলেন (১৫৪৩)। তথায় তাঁহার অনুচরবর্গ অনেকে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সের সাহা ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ।

হুমায়ুনকে পরাজয় করিয়াই সের, "সাহা" এই উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক, দিল্লীর সাম্রাজ্য এবং পঞ্জাব দেশ অধিকার করেন। পরে তৎকালোপস্থিত বাঙ্গালার রাষ্ট্রবিপ্লব নিরাকরণপূর্ব্বক, আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ ভাগের হিন্দুরাজা-দিগের পরাভব সাধনে কৃতসঙ্কল্প হন। মালব বশীভূত হইল। অনন্তর সের ভূপালের অন্তর্গত রাইসীন দুর্গ অবরোধ করিলেন। দুর্গরক্ষকেরা ধনপ্রাণসমেত নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হইতে পাইবে, এই নিয়মে অবরোধকারীদিগকে দুর্গ সমর্পণ করিয়া, তদ্বহির্ভাগে আসিয়া, শিবির সন্নিবেশ করিল। তখন মুসলমানেরা পূর্ব্বকৃত নিয়ম অসিদ্ধ, এই ভান করিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা অতিশয় সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু অবশেষে পরাস্ত ও মুসলমানদিগের নিষ্ঠুর হস্তে নিহত হইল। এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে টাইমুর ভিন্ন অন্য কোন মুসল-মান জেতা নিয়মভঙ্গ-রূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করেন নাই। সেরের এই বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্রূরতার বিশেষ উদ্দেশ্য কি ছিল জানা যায় না। যাহা হউক, পরিণামে তাঁহাকে এই ঘোর অপরাধের জন্য বিলক্ষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

রাইসীন আত্মসাৎ করার পর, সের মাড়োয়ার আক্রমণ করেন এবং শঠতাজাল বিস্তার করিয়া, আপন অমাত্য-দিগের প্রতি তদ্রত্য রাজার দারুণ অবিশ্বাস জন্মাইয়া

দেন, কিন্তু তাহাতে তিনি লূতার ন্যায় স্বজালেই বদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একজন তেজীয়ান রজঃপূত অমাত্য প্রভুর অবিশ্বাস নিবন্ধন অভিমানী হইয়া, তদীয় শক্রপক্ষের অনিষ্ট সম্পাদন দ্বারা, নিজ প্রভুপরায়ণতার প্রতিপাদন সঙ্কল্পে, স্বগণ সহিত সেরের শিবিরে আসিয়া, এমনি তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন যে শক্রসৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে সের, কৃচ্ছ্রে তাঁহার বৈরনির্যাতন হইতে নিস্তার পাইয়া, মাড়োয়ারের অনুর্ব্বরতা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আমি মুষ্টিমাত্র ভুট্টার প্রয়াসে এখনি ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য হারাইয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি তথা হইতে আসিয়া কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিলেন। এখানে, দুর্গ সমর্পণ করিলে তদধিবাসীদিগের উপরে কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না, এই নিয়মের প্রসঙ্গ করাতে, তাহারা উত্তর করিল, তাঁহার কথায় বিশ্বাস নাই, তিনি নিয়ম স্থাপন করিয়া যথোচিত প্রতিপালন করেন না। সের অগত্যা বাহুবল অবলম্বন করিলেন। পরে আপনার গোলাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দুর্গ হইতে একটা জ্বলৎকন্দুক আসিয়া তাঁহার এক শস্ত্রাগারে পতিত হওয়াতে, তত্রত্য বারুদরাশি অগ্নিসংযুক্ত হইয়, তাঁহাকে এরূপ দগ্ধ করিল যে, তিনি সেই দিনেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দগ্ধ হইয়াও দুর্গ অধিকার করণের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উহার অধিকার সম্পন্ন হইয়াছে সম্বাদ আসিল। সেরও "পরমেশ্বর! তোমার ধন্যবাদ করি" এই বলিয়া জন্মের মত নীরব হইলেন (১৫৪৫)।

সের সাহা অতিদক্ষ ও বিচক্ষণ ভূপতি ছিলেন। তিনি দুর্নিবার দুরাকাঙ্ক্ষা-হেতু ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুরোধ বিসর্জ্জন

করিতেন বটে, কিন্তু আপন প্রজাদিগের হিতসাধনে বিলক্ষণ কৃতী ও তৎপর ছিলেন। তিনি পঞ্চ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। কিন্তু সেই অল্প সময়েই দীর্ঘকালস্থায়িনী অনেক কীর্ত্তি করিয়া যান। তৎসমুদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত রাজবর্ত্মের নির্ম্মাণ সমধিক প্রসিদ্ধ। সের পথিকদিগের সুবিধার জন্য সেই বর্ত্মের দুই পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, প্রতি আড্ডায় রাজব্যয়ে প্রাপ্য আহারসামগ্রী পূর্ণ পান্থনিবাস স্থাপন, অর্দ্ধক্রোশ অন্তর কূপ খনন এবং স্থানে স্থানে মসিদ পর্য্যন্তও নির্ম্মাণ করেন। সম্বাদ বহন সৌকর্য্যার্থে তিনিই ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন। তাঁহার রাজত্বে দস্যুভয় এত নিরাকৃত হইয়াছিল যে প্রথিত আছে, পথিক ও বণিকেরা রাজপথে আপনাদিগের দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইত।

সেরের জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল খাঁ, রাজকার্য্যে অদক্ষ ছিলেন। তিনি অমাত্যদিগের প্রবর্ত্তনায়, আপন ভরণপোষণের জন্য কিঞ্চিৎ ভূম্যধিকার পাইবার পণ করিয়া কনিষ্ঠ জেলাল খাঁকে সিংহাসন সমর্পণ করিলেন। সেই পণের যথাবিহিত রক্ষা হয় এজন্য চারি জন অমাত্য প্রতিভূ রহিলেন। জেলাল সেলিম উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পরে ভ্রাতার সহিত পণভঙ্গের উপক্রম করায়, প্রতিভূরা অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বিদ্রোহী হইলেন। সেলিম তাঁহাদিগকে দমন করিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল নির্ব্বিবাদে বিগত হইয়াছিল।

মৃত্যুকালে (১৫৫৩) সেলিমের দ্বাদশবর্ষবয়স্ক একমাত্র পুত্র ছিল। সের সাহার একজন ভ্রাতৃপুত্র, তাহাকে নিহত করিয়া মহম্মদ খাঁ এই উপাধি গ্রহণ পুরঃসর, সিংহাসনে আরোহণ করিল। এই ব্যক্তির চরিত্র অতীব

অযন্য ; এ অতিশয় মূর্খ এবং নীচ জনের সংসর্গ ও কুৎসিত ব্যসনে একান্ত আসক্ত ছিল। হিমু নামে নীচবংশোদ্ভব একজন হিন্দু মহম্মদের প্রধান মন্ত্রী হইয়া উঠে। মন্ত্রীর আকুল যেমন হীন, আকার আবার তদপেক্ষাও কুৎসিত ছিল; কিন্তু তিনি রাজকার্য্য-নির্ব্বাহোপযোগী গুণগ্রামে বিলক্ষণ অলঙ্কৃত ছিলেন এবং তাঁহারই দক্ষতা ও শৌর্য্যে তাঁহার অসার প্রভুর রাজত্ব কথঞ্চিৎ চলিয়াছিল।

মহম্মদের অতিব্যয়ে স্বল্পকাল মধ্যেই রাজকোষ শূন্য হইয়া উঠিল। তখন সম্রাট আপনার ব্যয় নির্ব্বাহ ও অনুগ্রহভাজনদিগের উপরে অর্থ বর্ষণ করিবার জন্য, অমাত্যকুলের ভূসম্পত্তি অপহরণ আরম্ভ করিলেন। রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ইব্রাহিম সুর নামে তাঁহার আত্ম পরিবারের একজন দিল্লী ও আগরা অধিকার করিলেন। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই সেকন্দর নামা অন্য এক ব্যক্তি পঞ্জাব প্রদেশে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক, দিল্লীতে আসিয়া, ইব্রাহিমকে তাড়াইয়া দিলেন। মহম্মদ আপন রাজ্যের পূর্ব্বভাগে আশ্রয় লইলেন। তদনন্তর বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। হিমু তাঁহার বিরুদ্ধে যাইতেছিলেন এমন সময়ে শুনিলেন মালবে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে এবং হুমায়ুনও পরাবৃত্ত হইয়া সেকন্দরকে পরাজয়পূর্ব্বক, দিল্লী ও আগরা পুনরধিকার করিয়াছেন। হিমু অগ্রে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাকে পরাভূত ও কারারুদ্ধ করিলেন। তৎপরে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ধাবমান হইবার মানসে বাঙ্গালা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে সম্বাদ আসিল হুমায়ুন কালকবলে পতিত হইয়াছেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী তের বৎসর বয়স্ক আকবর পঞ্জাবে রহিয়াছেন। এই সম্বাদে প্রোৎসাহিত

হইয়া হিমু অবিলম্বে আগরায় গমন করিলেন। পরে অব-রোধ দ্বারা তন্নগর পুনরধিকার করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য মোগল-সেনাদিগকে পরাস্ত করিয়া সেখানেও আপন প্রভুর আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিলেন, তদনন্তর তিনি লাহোরের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এই সংবাদশ্রবণে আকবরের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে কাবুল পলায়নের পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম-সচিব বেহ্রাম সেই সকল পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া, একদল সৈন্য সহিত পানীপথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেনার সংখ্যা হিমুর সেনার অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল। হিমুও যুদ্ধে শৌর্য্যপ্রকাশে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, অবশেষে বেহ্রাম জয়ী হইয়া হিমুকে বন্দী করিলেন (১৫৫৬)। তদবধিই মহম্মদ খার রাজত্ব শেষ হইল এবং তিনিও অল্পকালমধ্যেই বঙ্গদেশে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হুমায়ুনের পুনরধিকার।

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে হুমায়ুন পারস্যের রাজধানী হিরাত নগরে উত্তীর্ণ হন। তথায় তাঁহার যে সকল ঘটনা উপস্থিত হয় তৎসমুদায়ের বোধসৌকর্য্যার্থে সিয়া ও সুন্নিদিগের স্থূল বিবরণ অবগত হওয়া আবশ্যক। মুসল-মানেরা সিয়া ও সুন্নি নামে দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মুসলমানধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের মৃত্যুসময়ে প্রাপ্তবয়স্ক স্ব-সম্পর্কীয় পুরুষের মধ্যে তাঁহার আলি নামে একমাত্র

জামাতা ছিলেন; কিন্তু তিনি মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তদীয় উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই। আলিকে অতিক্রম করিয়া ক্রমান্বয়ে তিন জন খলিফা বিগত হইলে পর, অবশেষে তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হয়। সেই তিন জনের সহিত মহম্মদের তাদৃশ নিকট সম্পর্ক ছিল না। সিয়ারা সেই তিন জনকেও ন্যায়ানুগত খলিফা বলিয়া সম্মান করেন, কিন্তু সুন্নিরা তাঁহাদিগকে প্রতারক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। সিয়া ও সুন্নিদিগের অপর প্রভেদ এই যে, সিয়ারা কেবল কোরানের অন্তর্গত নিষেধ-বিধির প্রতিপালন করেন, সুন্নিরা তৎসমুদায় ভিন্ন, মহম্মদ সময়ে সময়ে যে সমস্ত বাচনিক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তত্তাবৎও, কোরানের ন্যায়, পালন করিয়া থাকেন। সিয়া ও সুন্নিদিগের পরস্পর দারুণ বিদ্বেষ এবং তন্নিবন্ধন সময়ে সময়ে ঘোর বিদ্রোহও হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবদিগের যেমন তিলক ও তুলসীমালা, তেমনি সিয়াদিগের কাজলবাস নামে এক প্রকার লাল টুপি আছে। পারসীকেরা প্রায় সকলেই সিয়া; ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নি। সুন্নিরা শ্বেত বর্ণের টুপি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যখন হুমায়ুন পারস্যে প্রবিষ্ট হন, তখন সাহা তমাস্প নামা ভূপতি তত্রত্য সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি হুমায়ুনকে আপন সভায় আহ্বান করিয়া তাঁহার প্রতি পরম সমাদর প্রকাশ করিলেন। সিয়া মতে তমাস্পের ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। তিনি হুমায়ুনকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। প্রথম আলাপের পরেই তমাস্প তাঁহাকে কাজলবাস ধারণ করিতে কহিলেন। হুমায়ুন স্বীকৃত হইলেন, অমনি সাড়ম্বর

বাদ্যোদ্যমে সেই ব্যাপার রাজ-প্রাসাদের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। নির্ব্বাসিত সম্রাট কাজলবাস ধারণ করিলেন বটে, কিন্তু সিয়া মত পরিগ্রহণে তদনুরূপ তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না; কেন না, পর দিবস তমাস্প ভ্রমণে নির্গত হইয়া হুমায়ুনের বাসার নিকটে আসিলে, হুমায়ুন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তমাস্প তাঁহার প্রতি দৃকপাতও না করিয়া চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দিবস পরে পারস্যপতি হুমায়ুনের আবাসে প্রচুর ইন্ধন প্রেরণ করিয়া, তাহার সঙ্গে বলিয়া পাঠাইলেন সিয়ামতগ্রহণে এখনও অস্বীকৃত রহিলে এই ইন্ধন হুমায়ুনের চিতার ইন্ধন হইবে। পরে হুমায়ুনের মক্কা যাইবার প্রার্থনা জানাইলে তমাস্প তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, আরও বলিলেন তাঁহাকে সিয়া মত গ্রহণ করিতে অথবা তদস্বীকরণ-জন্য দণ্ডভাগী হইতে হইবে।

অবশেষে হুমায়ুনের প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল। তিনি সিয়া-মত-সম্বন্ধ একখানি পত্রিকায় স্বাক্ষর করিলেন। ভারতবর্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, সেখানেও কালক্রমে সেই মত প্রচলিত করিবেন পত্রিকায় এমন অঙ্গীকারও লিপিবদ্ধ ছিল। আর যদি পারসীক রাজের সাহায্যে কাণ্ডাহার অধিকৃত হইযা উঠে তাহা তাঁহাকে সমর্পণ করিবেন এমন পণও লিখিয়া দিলেন। সাহাতমাস্প দ্বাদশ সহস্র অশ্বসেনা প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। এই সকল ব্যাপারের পর, কিছুদিন বিলম্ব করিয়া ও আর একবার তমাস্প কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া, অবশেষে (১৫৪৪) হুমায়ুন পারস্য রাজ্যের প্রান্তস্থিত সিস্তান নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায তমাস্পের পুত্র মোরাদ মির্জ্জার অধীনে ১৪,০০০ অশ্বসেনা আসিয়া মিলিত হইল। তথা হইতে

হুমায়ুন তাহাদিগের সমভিব্যাহারে কাণ্ডাহার রাজ্যে আসিয়া, হেলমণ্ড নদীর তীরবর্ত্তী একটী দুর্গ অধিকার এবং তদনন্তর কাণ্ডাহার নগর অবরোধ করিলেন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে কামরান, মির্জা আস্করির উপরে কাণ্ডাহারের শাসনভার সমর্পিত করেন। এপর্য্যন্ত আস্করি সেই কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। হুমায়ুন আসিয়া নগর নিরোধ করিলে আস্করি পাঁচ মাস তাহার রক্ষাচেষ্টা করেন। সেই কালের মধ্যেও সন্নিহিত আমিরেরা কেহই আসিয়া হুমায়ুনের স্বপক্ষ হইলেন না। এজন্য পারসীকেরা কাণ্ডাহার গ্রহণে নিরাশ হইয়া, অবরোধে ভঙ্গ দিয়া স্বদেশে প্রতিগমনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আমিরেরা কেহ কেহ হুমায়ুনের সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরেও দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তত্রত্য সেনাদিগের কিয়দংশ পলায়িত ও কিয়দংশ অবরোধকদিগের সহিত মিলিত হইল। মির্জা আস্করি অগত্যা নগর সমর্পণ করিলেন। তখন হুমায়ুন, তমাস্পের সহিত যে পণ করিয়াছিলেন তদনুসারে, কাণ্ডাহার নগরের দুর্গ ও রাজকোষ পারসীকদিগকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তরপারসীক সেনার অধিকাংশই স্বদেশে প্রতিগমন করিল, কেবল নগররক্ষোপযোগী কতিপয় যোদ্ধা মোরাদের সমভিব্যাহারে রহিল। অল্প দিন পরে অকস্মাৎ সেই যুবরাজের মৃত্যু ঘটিল। অমনি হুমায়ুন কৌশলক্রমে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, কিয়দংশ পারসীক সৈন্যের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক, অবশিষ্টদিগকে স্বদেশ-পরাবর্ত্তনে অনুমতি দিয়া কাণ্ডাহার আত্মসাৎ করিলেন। তাঁহার সেই কার্য্য যে ন্যায় ও সন্নীতির নিতান্ত বিরুদ্ধ হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

অনন্তর হুমায়ুন কাবুলের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার আগমনে কামরান পলায়ন করিলেন। কিন্তু অল্প-কালমধ্যেই, জ্যেষ্ঠ স্থানান্তর গমন করাতে, কামরান প্রত্যাগত হইয়া কাবুল পুনরধিকার করিয়া উঠিলেন। হুমায়ুন ফিরিয়া আসিয়া তন্নগর অবরোধ করিলেন। কামরান, আকবরকে তোপের মুখে নিক্ষেপ করিবেন এই ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তিনি অনতি-বিলম্বে পলায়িত, ও কিছুদিন পরে, হুমায়ুনের শরণাগত হইলেন। জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু অনধিক-কালমধ্যেই কামরান আবার বিদ্রোহী হইয়া, হুমায়ুনকে পরাস্ত ও কাবুল হইতে অপসারিত করিয়া উঠিলেন। পরে হুমায়ুন পুনর্ব্বার তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। তখন (১৫৫৩) কামরান গক্কুরদিগের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া হুমায়ুনের হস্তে সমর্পণ করিল। হুমায়ুন দুই তিন দিন তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করিলেন। অনন্তর তাঁহার চক্ষুরুৎপাটন দণ্ড বিধান করা স্থির হইল। তদনুসারে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা বারম্বার তাঁহার দুই চক্ষু বিদ্ধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ কামরান কিছুমাত্র আর্ত্তনাদ না করিয়া সেই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। অবশেষে, তাঁহার ক্ষত বিক্ষত চক্ষে লবণ ও লেবুর রস নিক্ষিপ্ত হইলে, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হে পরমেশ্বর! আমি যে কিছু অপরাধ করিয়াছি ইহ লোকে তাহার সম্পূর্ণ শাস্তি পাইলাম, পরলোকে আমার প্রতি সদয় হইও"। তদনন্তর কামরান মক্কায় যাত্রা করিলেন, কিন্তু অধিক কাল জীবিত ছিলেন না। দুর্ভাগ্য কামরান বারম্বার বিদ্রোহ করণ অপরাধে দণ্ডার্হ হইয়াছিলেন অবশ্যই বলিতে হইবে; কিন্তু তিনি

যেরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে তাঁহার সকল দোষ বিস্মৃত হইয়া, হুমায়ুনের ক্রূরতারই নিন্দা করিতে হয়। তাদৃশ দণ্ডাপেক্ষা শিরশ্ছেদ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ সন্দেহ নাই।

উপরি উক্ত রূপে কামরানের প্রতি ক্রূর দণ্ডবিধানের কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে, মহম্মদ খাঁর কদর্য্য শাসনে, ভারতবর্ষে অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, হুমায়ুন তদ্দেশের পুনরধিকার চেষ্টায় প্রোৎসাহিত হইলেন এবং ১৫৫৫ সালে পঞ্জাব পরাজয় করিলেন। অনন্তর সর্হিন্দ প্রদেশে সেকেন্দর সুরকে পরাভূত করিয়া আবার দিল্লী ও আগরার অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু তিনি অধিক কাল সেই সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। পুনরধিকার প্রাপ্তির ছয় মাস পরে তিনি একদা স্বীয় পুস্তকালয়ে অলিন্দ হইতে হর্ম্ম্যের বহির্ভাগস্থিত অধিরোহণী দ্বারা আরোহণ করিতেছিলেন এমন সময়ে মুসলমানদিগের উপাসনার কালোচিত আহ্বান শ্রবণ করিয়া রীতিমত উপবেশন ও ভজনা করিয়া, অবশেষে যষ্টির উপরে ভর দিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। যষ্টি মার্জ্জিত মার্ব্বলে স্খলিত হইল, হুমায়ুন পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তদনন্তর চতুর্থ দিবসে ঊনপঞ্চাশ বর্ষ বয়সে, (১৫৫৬) পরলোক যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

আকবরের রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অবস্থা।

মহম্মদ টোগলকের সময় অবধি দিল্লীর সাম্রাজ্য ভগ্ন হইতে আরম্ভ হয়। পরে, ক্রমশঃ এক এক অংশ স্বাধীন হইয়া, আকবরের রাজ্যাভিষেক সময়ে ভারতবর্ষে বিস্তর

স্বস্বপ্রধান রাজ্য হইয়া উঠে। নিম্নে তৎসমুদায়ের অতি সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

মহম্মদ টোগলকের সম্রাটচ্ছত্র গ্রহণ সময়ে, রজঃপুত্র-দিগের দেশ ভিন্ন, অবশিষ্ট সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। দাক্ষিণাত্যেও উড়িষ্যা, দক্ষিণ উপদ্বীপের সর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্ত এবং পশ্চিম উপ-কূলের অতি সঙ্কীর্ণ কিয়দ্দূর ভূভাগ ভিন্ন, অবশিষ্ট সর্ব্বত্র দিল্লীর সম্রাটেরা আধিপত্য করিতেন। টোগলকের অশাসনে সর্ব্বাগ্রে (১৩৫৬) বঙ্গদেশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। চারি বৎসর মধ্যেই কর্ণাট ও তৈলঙ্গ তাহার অনু-বর্ত্তী হয়। তদ্দ্বারা বিজয় নগর ও বরঙ্গুল আর একবার হিন্দুরাজাদিগের রাজধানী এবং মুসলমানেরা কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে ভ্রষ্টাধিকার হইয়া উঠে। তদনন্তর দাক্ষি-ণাত্যের মুসলমানেরা রাজদ্রোহী হইয়া অবশেষে বামনি রাজ্যের স্থাপন করে*, তাহাতে নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে দিল্লীর প্রাধান্য একবারে বিলুপ্ত হয়। মহম্মদের মৃত্যু হইতে টাইমুরের আক্রমণের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য প্রাগুক্তরূপ সঙ্কীর্ণীভূত অবস্থাপন্নই থাকে। শেষোক্ত সময়ে আবার গুর্জ্জর, মালব ও জোয়ানপুর স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। টাইমুরের আক্রমণের পর অবশিষ্ট প্রদেশ সকলও স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠে এবং দিল্লীর সাম্রাজ্য চতুর্দ্দিকে তন্নগরের অনতিদূরের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া আইসে।

বামনি রাজ্য ১৭০ বৎসর প্রবলপ্রতাপ ছিল। সেই দীর্ঘকালের মধ্যে তত্রত্য রাজারা বরঙ্গুল ও বিজয়

---

* ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

নগরের সহিত পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারা প্রথমোক্ত রাজ্যের সমুৎপাটন করেন এবং শেষোক্ত হইতে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার অন্তর্ব্বর্ত্তী দোয়াব প্রদেশ জয় করিয়া লন। বামনি রাজাদিগের সেনা ও সচিব-কুলে সিয়া ও সুন্নি উভয়সম্প্রদায়ী লোকই ছিল। কালসহকারে রাজারা ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইয়া উঠিলে, ঐ দুই সম্প্রদায়ে ঘোর বিবাদ হইতে লাগিল। অবশেষে সিয়া সম্প্রদায়ের নায়ক, বিজয়পুরের শাসনকর্ত্তা, আডিল খাঁ, স্বীয় অধিকারে স্বাধীন রাজা হইয়া উঠিলেন, এবং আডিল সাহী নামক রাজবংশের স্থাপন করিলেন। স্বল্পকাল পরেই দাক্ষিণাত্য মুসলমানদিগের নেতা সুন্নি-সম্প্রদায়ী নিজাম উলমুলুক, কাসিম বারিদ নামা কর্ম্মসচিব দ্বারা নিহত হইলেন। তখন নিজামের পুত্র আমেদ, বামনি-রাজের বশ্যতা অস্বীকরণ পূর্ব্বক, এক নূতন রাজ্য ও আমেদনগরে তাহার রাজধানী স্থাপন করিলেন। নিজাম বামনি রাজের সভায় কাসিমের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি নিহত ও তাঁহার পুত্র স্বতন্ত্র হইলে রাজসভায় কাসিমের একাধিপত্য হইয়া উঠিল। তিনি নামে মাত্র প্রভুর অধীন রহিলেন; বস্তুতঃ স্বয়ংই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাসিমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আমির বারিদ অধীনতার নাম পর্য্যন্ত রাখিতে সম্মত হইলেন না; তিনি বামনি রাজকুলের উচ্ছেদ সম্পাদন করিয়া তাহাদের রাজধানী, বিদর্ভ নগরে, বারিদ বংশের স্থাপন করিলেন। প্রাগুক্ত তিনটী রাজ্য ভিন্ন বামনিদিগের অধিকার হইতে আর দুইটী রাজ্য সমুৎপন্ন হইয়াছিল। একটী গোলকুণ্ডায়, অন্যটী বিবাদের অন্তর্গত ইলিচপুরে। এই দুই রাজ্যের রাজাদিগকে

স্বস্ববংশের স্থাপন-কর্ত্তার নামানুসারে, কুতবসাহী ও ইমাদসাহী কহিত।

প্রাগুক্ত মুসলমান রাজ্য সকলের রাজারা অনবরত পরস্পর সন্নিহিত ও হিন্দু রাজাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন। অবশেষে ইহারা সকলেই বিজয়নগরের অসূয়া-পরবশ হইয়া, তত্রত্য রাজাকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশে, কিছুকালের জন্য, একমিল হন এবং তালিকোটের সন্নিধানে ঘোর সংগ্রামের পর (১৫৬৫) বিজয়-নগরপতিকে পরাস্ত, কারারুদ্ধ ও অবশেষে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য উচ্ছিন্ন করেন। কিন্তু তদ্দ্বারা ইহাঁদের বিশেষ লাভ হইল না। পরস্পরের অসূয়া আবার প্রবল হওয়াতে কেহই রাজ্য বিস্তার করিতে পারিলেন না। বিজয়নগরের ধ্বংসাবশিষ্টহইতে কতিপয় ক্ষুদ্ররাজ্য সমুৎপন্ন হইল। বিজয়-নগর-বিনাশকারীদিগের মধ্যে কেবল গোলকুণ্ডার রাজারা বহুদূর রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সমস্ত তৈলঙ্গ ও কর্ণাট দেশে পানার নদীর উত্তরবর্ত্তী তাবৎ ভূভাগ তাঁহাদের অধিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

আর্য্যাবর্ত্তে যে সকল প্রদেশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে তন্মধ্যে গুজরাট বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। তত্রত্য রাজারা মালব দেশ পরাজয় ও অধিকার করেন, রজঃপুতদিগকেও অনেকবার ব্যতিব্যস্ত করিয়া উঠেন এবং খান্দেশ, বরার ও আমেদনগরের রাজাদিগের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করেন; তাঁহারা পর্টুগিজদিগের সহিত অনেকবার সমুদ্র-সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হন।

রজঃপুতদিগের দেশ—যমুনা ও সিন্ধুর অভ্যন্তরে, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে উত্তরে দিল্লীর অক্ষরেখা পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগে রজঃপুতদিগের আধিপত্য ছিল। সুতরাং

মরুস্থল ও মধ্য ভারতবর্ষের বহুদূর তাহাদের অধিকৃত ছিল। সেই অধিকার অর্ব্বলি পর্ব্বতে নির্ভিন্ন। পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে মেওয়াত, জয়পুর, আজমীর, হাড়োতী, মেওয়ার, বুন্দেলখণ্ড ও মালব। অর্ব্বলিপর্ব্বতের পশ্চিমবর্ত্তী খণ্ডের সাধারণ নাম মাড়োয়ার। উহা যোধপুর, জৈসলমিয়র, বীকেনিয়র ও কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই ভূভাগ মরুর অন্তর্নিবিষ্ট এবং তদ্দ্বারাই শত্রুর আক্রমণ হইতে পরিরক্ষিত। উহা কোন সময়েই কোন বৈদেশিক রাজার অধীনতা স্বীকার করে নাই। এই ভূভাগে যোধপুর, জৈসলমিয়র, বীকেনিয়র প্রভৃতি কয়েক স্থান প্রধান। অর্ব্বলির প্রাচ্য খণ্ড কখন কখন মুসলমানদিগের পরাজিত, কখন কখন করদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু মাড়োয়ার কস্মিন্ কালেও কি মুসলমান কি ইঙ্গরেজ, কাহার নিকটেই সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয় নাই। রজঃপূতদের দেশে অনেক নগর ও সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত আছে। তৎসমুদায়ের মধ্যে জয়পুর, আজমীর, উদয়পুর, চিতোর, উজ্জিন, ভূপাল, কালিঞ্জর, রিন্তাম্বোর ও গোয়ালিয়ার প্রধান।

রজঃপূতদিগের প্রথা এই যে, তাহারা কোন দেশ জয় করিলে রাজা কিয়দংশ ভূমি নিজস্ব রাখেন, অবশিষ্ট ভাগ আত্মীয় ও অমাত্যবর্গকে অংশ করিয়া দেন। সেই সকল ভূম্যধিকারীদিগকে ঠাকুর বলে। ঠাকুরেরা আবার আপনাদের স্বগণমধ্যে নিজ নিজ ভূম্যধিকার অংশ করিয়া দেন। ভূমির উপস্বত্বভোগ জন্য, যুদ্ধকালে, ঠাকুরদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সেনার সহিত, রাজার সাহায্যার্থ, রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে হয়; অন্যান্য সময়ে অন্যবিধ রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইয়া থাকে। কিন্তু কোন প্রকার কর প্রদান করিতে হয় না। রাজা যেমন

ঠাকুরদিগের নিকট বশ্যতা ও সেনা প্রভৃতি প্রাপ্ত হন. ঠাকুরেরাও আবার সেইরূপ আপন আপন স্বগণের নিকট বশ্যতা ও সৈনিক কর্ম্মে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আকবর।

ভারতবর্ষের মুসলমান সম্রাটদিগের মধ্যে আকবর সর্ব্ব-প্রধান। তিনি যেমন বিপুল সাহসী, উদ্যোগী, কর্ম্মদক্ষ ও বিচক্ষণ, তেমনি সদাশয় ও প্রকৃতিপুঞ্জের প্রকৃত হিত-কারী ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে দিল্লীর পতাকা পুনর্ব্বার ভারতভূমির সর্ব্বত্র উড্ডীন হয় এবং তাঁহার প্রণীত কল্যাণকর রাজনিয়ম-পরম্পরা সাম্রাজ্যের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করে। আকবরের রাজত্বের বহুকাল, অবাধ্য আমিরদিগের দমনে অতিবাহিত হয়। সেই কার্য্য সাধনে তাঁহাকে অনেক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তৎসমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করিতে হইলে, পাঠক-পুঞ্জের বিরক্তি উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কেবল প্রধান প্রধান গুলির স্থূল বিবরণমাত্র লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

রাজ্যাভিষেক-কালে আকবরের বয়ঃক্রম কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশ বর্ষমাত্র হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি ছিল; তথাপি নিতান্ত অল্প-বয়স্কতা প্রযুক্ত রাজমুকুটধারণের পরই স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন নাই। হুমায়ুনের জীবদ্দশায় বৈরামখাঁ

নামা সচিব আকবরের রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যাভিষেকের পরও সেইরূপ বন্দোবস্ত রহিল। বেহ্রাম, "খাঁ বাবা" এই উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদায় রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

বেহ্রাম তুরুষ্কবংশসম্ভূত ছিলেন। কি বিপদ কি সম্পদ সকল সময়েই হুমায়ুনের প্রতি তাঁহার প্রভুভক্তি অটল ছিল। বালক আকবরের প্রতিও তিনি তদনুরূপ ভাব প্রকাশ করেন। তিনি সংগ্রামেও বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার স্বভাব লোকের হৃদয়গ্রাহী ছিল না, প্রত্যুত তিনি স্বেচ্ছাচারী, অহঙ্কৃত ও অবিনয়ী ছিলেন। অন্যান্য আমিরেরা তাঁহাকে আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকুলোদ্ভব জ্ঞান করিতেন না, সুতরাং তাঁহার কর্ত্তৃত্ব-দর্শনে সহজেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তাহাতে আবার তাঁহার অপরিমিত অহঙ্কার দেখিয়া একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বেহ্রাম কতিপয় ন্যায়বিরুদ্ধ ও গর্হিত অনুষ্ঠান দ্বারাও আপনাকে সাধারণের সমীপে শঙ্কা ও ঘৃণার আস্পদ করিয়া তুলিলেন। টার্ডিবেগ নামে বাবরের একজন প্রিয় কর্ম্মচারী ছিলেন। হুমায়ুনের সময়ে বেহ্রাম যেমন প্রভুভক্তি প্রদর্শন করেন, ইনিও সেইরূপ করিয়াছিলেন। হিমুর আক্রমণ কালে ইহাঁর প্রতি দিল্লীর রক্ষকতা ভার সমর্পিত ছিল। কিন্তু ইনি তদ্বিষয়ে সফল হইতে পারেন নাই, প্রত্যুত নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে, একদা আকবর শ্যৈনম্পাতে * বিনির্গত হইয়াছেন, এই সুযোগে বেহ্রাম টার্ডিবেগের প্রাণ সংহার করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে এ

* শ্যৈনম্পাত অর্থাৎ বাজপক্ষীদ্বারা অন্যান্য পক্ষী শিকার।

বিষয়ে আকবরেব সম্মতি লওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে ঘুণাক্ষরেও দণ্ড বিধানের কোন কথা জ্ঞাপনি করেন নাই। টার্ডিবেগের সংহারের পর বেহ্রাম আপনার সমান মর্য্যাদাপন্ন আর এক অমাত্যের প্রতিও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন এবং এক সামান্য ছল অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারও শিরশ্ছেদ করেন। আকবরের আপন অধ্যাপক পির মহম্মদ অতি কষ্টে ওরূপ দণ্ড হইতে নিস্তার পান এবং অগত্যা কিছু কালের জন্য মক্কা তীর্থে যাইয়া আত্মরক্ষা সম্পাদন করেন।

প্রাগুক্ত ও তদনুরূপ অন্যান্য অনুচিত অনুষ্ঠান-পরম্পরা-দর্শনে, অনধিককালমধ্যেই বেহ্রামের অধ্যক্ষতা আকবরের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি কতিপয় সুহৃদ অমাত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার অধীনতা পরিত্যাগের উপায় অবধারণপূর্ব্বক, একদা বেহ্রাম ও অন্যান্য অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে জননীর আকস্মিক উৎকট রোগের সম্বাদ প্রাপ্তির ভান করিয়া সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বেহ্রাম পশ্চাতে রহিলেন। আকবর রাজধানীতে পঁহুছিয়া, আপনাকে সেই অমাত্যের ক্ষমতার বহির্ভূত দেখিবামাত্র, প্রচার করিয়া দিলেন "আমি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছি. অতঃপর আর কাহারই আজ্ঞা মান্য নহে।" (১৫৬০)। তখন বেহ্রাম মহাবিভ্রাটে পড়িলেন, তাঁহার অনুচরবর্গ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তিনি আকবরকে সদয় করিবার প্রয়াস পাইলেন. কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন বলপূর্ব্বক আকবরকে আয়ত্ত করেন, আরবার মালব দেশে গমন-

অনন্তর স্বাধীন হইবার সঙ্কল্প করিলেন। পরে তৎসমুদায় অভিসন্ধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, মক্কা গমনে বাসনা প্রকাশ করিয়া, গুর্জ্জরের অন্তর্গত নগর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় অবস্থিতি কালে সম্রাট আকবর তাঁহাকে রাজকর্ম্ম হইতে অপসারিত ও অবিলম্বে মক্কা প্রস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া, আজ্ঞা পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে বেহ্রাম ভেরী, ধ্বজা প্রভৃতি তাবৎ রাজচিহ্ন আকবরের সমীপে প্রেরণ-পূর্ব্বক গুর্জ্জরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এখানেও সম্রাট্ তাঁহাকে আবার নিগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন। তজ্জন্য কুপিত হইয়া বেহ্রান এক দল সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পঞ্জাব আক্রমণের চেষ্টা পাইলেন। আকবর স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন।

অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বেহ্রাম সম্রাটের শরণাগত হইলেন। মহানুভব আকবর পূর্ব্বমন্ত্রীর যে সমুদায় সদ্গুণ ছিল তাহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি বেহ্রামকে স্বীয় শিবিরে আনয়ন জন্য কতিপয় প্রধান অমাত্যকে প্রত্যুদ্গমনার্থ প্রেরণ করিলেন। বেহ্রাম আসিয়া সম্রাটের চরণে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আকবর স্বহস্তে তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন এবং আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদানের পর, এক বিস্তৃত প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব, রাজসভার কোন উন্নত পদ, অথবা সসম্মানে মক্কা তীর্থ দর্শনে গমনের ব্যয়, এই তিনের যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। বেহ্রামের অভিমান ও পরিণামদর্শন উভয়ই তাঁহাকে শেষোক্ত প্রসাদ প্রার্থনায় প্রবৃত্ত করিল। তখন আকবর তাঁহার প্রতি প্রচুর বৃত্তি

নিরূপিত করিলেন। অনন্তর বেহ্রাম গুর্জ্জরে গমন করিলেন। তথায় পঁহুছিয়া মক্কাগমনার্থ অর্ণবপোতারোহণের উদ্‌যোগ করিতেছিলেন এমন সময়ে একজন পাঠান বৈরনির্যাতন-প্রদীপ্ত-হৃদয়ে তাঁহার প্রাণসংহার করিল। হুমায়ুনের রাজত্বকালে এই ব্যক্তির পিতা সংগ্রামে বেহ্রামের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বেহ্রামের মৃত্যু পর, অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্ক আকবর বহুল বিঘ্নসঙ্কুল সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। অবশ্য আমিরদিগের দমন, সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন ভাগের পুনরধিকার সম্পাদন ও সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা স্থাপন এই সমস্ত দুরূহ কার্য্যে তাঁহাকে ব্যাপৃত হইতে হইল। সেই সকল সমাধানের জন্য পঞ্জাব এবং আগরা ও দিল্লীর সন্নিহিত ভূভাগের রাজস্বমাত্র তাঁহার সংস্থান ছিল। তাঁহার সেনারা সকলেই ভৃতিভুক্ এবং দিগ্‌দিগন্তর হইতে আহৃত, সুতরাং তাঁহার প্রতি তাহাদের বিশেষ অনুরাগ বা বাধ্যবাধকতা কিছুই ছিল না। যাহা হউক, আকবর নিজের উজ্জ্বলতা বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়পরতা দ্বারা পরিণামে সকল ব্যাঘাতই নিরাকরণ করিয়াছিলেন।

সের সাহার সর্ব্বশেষ উত্তরাধিকারী মহম্মদের এক পুত্র ছিল। আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, অত্যল্প কাল পরে সেই পাঠান রাজকুমার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জোয়ানপুরে উপস্থিত হইলেন (১৫৬০)। আকবরের প্রেরিত এক সেনানী তাঁহাকে পরাস্ত করিল, কিন্তু তদনন্তর নৃপতির প্রাপ্য উদ্ধার * প্রেরণে অস্বীকৃত হইল।

* সেনারা লুঠ করিয়া যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় তন্মধ্যে যে অংশ রাজাকে দেয় তাহাকে উদ্ধার কহে।

তখন আকবরকে স্বয়ং যাইয়া সেই সেনানীকে বশীভূত করিতে হইল। পরে আদম খাঁ নামা আকবরের আর একজন সেনানী, মালবের পাঠান-শাসনকর্তা বাজবাহাদুরকে পরাস্ত করিয়া, সেই প্রদেশে স্বয়ং স্বাধীন হইবার কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার উদ্যোগ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে, আকবর অতি সত্বর তাহার শিবিরে উপস্থিত হওয়াতে, সে অগত্যা বিদ্রোহচেষ্টা পরিত্যাগ করিল। অনন্তর বাজবাহাদুর সম্রাটের শরণাগত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত ও তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ বদান্যতা প্রদর্শন করিলেন। আকবর সকল সময়েই শরণাগত শত্রুদিগকেও রক্ষা ও আপন কর্ম্মে নিয়োগ করিতেন।

আকবরের সৈন্যমধ্যে উজবেক-জাতীয় অনেকে উন্নত পদে আরূঢ় ছিল। ইহারা স্বজাতীয় কোন অমাত্যের প্রতি আকবরের কঠিন দণ্ডবিধান দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইল। সেই অমাত্য বিলক্ষণ অপরাধী ছিলেন বটে, কিন্তু উজবেকেরা তদ্বিষয়ে বিবেচনা-পরিশূন্য হইয়া মনে করিল আকবর বাবরের পৌত্র এবং তন্নিবন্ধন উজবেকদিগের উপর তাঁহার শত্রুতা সম্পূর্ণ সম্ভবই হইতেছে। এইরূপ ভাবিয়া তাহারা চক্রান্ত করিয়া বিদ্রোহী হইল (১৫৬৪)। অন্যান্য কতিপয় অমাত্যও তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন, তন্মধ্যে প্রধানের নাম আজফ খাঁ। নর্ম্মদা নদীর সন্নিধানে গরা নামে একটী ক্ষুদ্র হিন্দু-রাজ্য ছিল, আজফ খাঁ তাহার পরাজয়ার্থ প্রেরিত হন। তৎকালে গরায় একজন রাজ্ঞী কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় স্বয়ং সংগ্রাম করিলেন, অবশেষে আপন সেনাদিগকে পরাস্ত দেখিয়া, শত্রুহস্তে পতন

অপেক্ষা মরণ মঙ্গল জ্ঞান করিয়া, বক্ষঃস্থলে ছুরিকা-প্রবেশ দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রচুর সম্পত্তি ছিল, তত্তাবৎ আজফ খাঁর হস্তগত হইল। সম্রাটকে বঞ্চনা করিয়া সেই সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার মানসে আজফ রাজদ্রোহীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

বিদ্রোহীদিগের সহিত দুই বৎসর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা পরাভূত হইবার উন্মুখ হইল; এমন সময়ে আকবরের ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্ত্তা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। সম্রাটকে তথায় ধাবমান হইতে হইল। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে রাজদ্রোহীরা আবার প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল। আকবর হাকিমকে পঞ্জাব হইতে বহিষ্করণপূর্ব্বক পরাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, বিদ্রোহীরা অযোধ্যা ও আলাহাবাদ প্রদেশের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি আকবর অবিলম্বে তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং তাহাদিগকে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে তাড়াইয়া দিলেন। তথায় তাহারা মনে করিল তৎকালীন বিপুল-জল নদী অতিক্রম করিয়া আকবর কোন রূপেই অনুসরণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু সম্রাট, যামিনীযোগে অশ্ব ও করিপৃষ্ঠে আরোহিত দুই সহস্র মাত্র যোদ্ধার সমভি-ব্যাহারে গঙ্গা পার হইয়া প্রত্যূষে শত্রুশিবির আক্রমণ করিলেন। শত্রুপক্ষ নিতান্ত অপ্রস্তুত ছিল, সুতরাং ব্যতিব্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

আকবর ক্রমশঃ পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে উত্তীর্ণ হইলেন (১৫৬৭) এবং বল ও বদান্যতা প্রয়োগ দ্বারা সমুদায় বিদ্রোহী আমিরদিগকে বশীভূত করিয়া উঠিলেন। তখন তিনি দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। রাজপুত রাজা-

রাই তাঁহার প্রথম লক্ষ্য হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে চিতর রাজ্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। চিতরের তদানীন্তন স্বামী অতিশয় কাপুরুষ ছিলেন। তিনি আকবরের আক্রমণেই জয়মাল নামক অমাত্যের হস্তে দুর্গরক্ষার ভার দিয়া, স্বয়ং গুর্জ্জরে পলায়ন করিলেন। জয়মাল বিলক্ষণ সাহসী ও দক্ষ ছিলেন। তিনি আকবরের প্রথম আক্রমণ নিস্ফল করিলেন এবং জীবিত থাকিলে অন্ততঃ তাঁহাকে বহুকাল কষ্ট দিতেন; কিন্তু একদা রাত্রিতে মসালের আলোকে দুর্গবপ্রের কিয়দংশের সংস্করণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দৈবক্রমে আকবর স্বয়ং তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। অমনি সম্রাট্ নিঃশব্দে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। নায়কের মৃত্যুতে জয়মালের সেনারা দুর্গরক্ষায় হতাশ হইয়া, রজঃপূতদিগের প্রথা অনুসারে, মরিবার আয়োজন করিল; প্রথমতঃ স্ত্রীলোকেরা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। পরে পুরুষেরা মুসলমানদিগের সম্মুখীন হইল। আকবর তিন শত রণহস্তী প্রেরণ দ্বারা তাহাদিগের নিধন সম্পন্ন করিলেন। প্রথিত আছে এবারে প্রায় ৩০,০০০ রজঃপূত নিহত হইয়াছিল।

চিতর লাভের পরবৎসর আকবর রিন্তাম্বোর ও কালিঞ্জর অধিকার করেন। এইরূপে তিনি কতিপয় রজঃপূত ভূপতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন কোন রাজার পক্ষে সামোপায়ও প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তিনি রজঃপূত রাজাদিগকে আত্মপরিবারের সহিত বৈবাহিক সূত্রে সম্বদ্ধ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক ছিলেন। তিনি স্বয়ং জয়পুর ও যোধপুরের দুই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং জয়পুরের আর এক রাজ-

কুমারীর সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন। যে সকল রজঃপুত রাজারা এইরূপ বিবাহ দানে সম্মত হইতেন তাঁহারা সম্রাটের বিলক্ষণ অনুরাগভাজন ও অনুগৃহীত হইয়া উঠিতেন। তন্নিবন্ধন তাদৃশ বিবাহ জাতিভ্রংশক ও অবমানকর জ্ঞান করা দূরে থাকুক, উদয়পুরের অধিপতি ভিন্ন, সমুদায় রজঃপুত রাজারাই তদ্দ্বারা আপনাদিগকে কৃতার্থ ও সম্মানিত বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উদয়পুরপতি সেই সমুদায় যবনাস্ত রাজাদিগের সহিত আদান প্রদান পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিলেন। সেই হেতু অধুনা উদয়পুরের রাজবংশ জাত্যংশে রজঃপুতদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। তাঁহার সহিত আদান প্রদানে অন্যান্য রাজারা অতিশয় শ্লাঘা জ্ঞান করেন।

হুমায়ুনের প্রথম রাজত্বকালে গুর্জ্জর দেশের তৎকালীন স্থূল বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তদবধি ঐ রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া আসিতেছিল। ১৫৬৩ সালে আকবরের কতিপয় বিদ্রোহী অমাত্য, সম্রাট্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ঐ প্রদেশে প্রবিষ্ট হইল। তখন গুর্জ্জরে রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছিল। আকবরের বিদ্রোহী অমাত্যেরা যাইয়া গুর্জ্জরপতির প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন করিল এবং তাঁহাকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, রাজ্যরক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন তিনি রাজ্য সম্প্রদান করিবার মানসে আকবরকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে আকবর যাইয়া তাঁহার অক্ষম হস্ত হইতে রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া, পরে সুরাট নগর আক্রমণ করিলেন। ঐ নগরে কতিপয় বিদ্রোহী অমাত্য অবস্থিতি করিতেছিল; আকবর অবরোধ করাতে তাহারা আপনাদের

দলের সহিত মিলিত হইবার বাসনায়, নগর হইতে বহির্গত হইল। আকবর এমনি অবিমৃষ্য ত্বরার সহিত তাহাদের অনুসরণ করিলেন যে, একদা কেবল ১৫৬ জনের সহিত প্রায় ১০০০ শত্রুর সম্মুখে পড়িলেন; তথাপি তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া অবশেষে, দুই পার্শ্বে সুদৃঢ় বৃতি দ্বারা রক্ষিত এক গলিতে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র দলে বহুল সাংযুগীন অমাত্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিলক্ষণ শৌর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ জয়পুরের রাজা ভগবান্ সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মানসিংহের বীরতায় আকবরের নিজের প্রাণরক্ষা ও শত্রুবর্গের অভিভব হইল। কিন্তু বিদ্রোহী অমাত্যেরা আপনাদের মূল দলের সহিত মিলন সম্পন্ন করিয়া উঠিল। যাহা হউক সুরাট ও তৎপরে সমুদায় গুজরাট আকবরের অধিকৃত হইল। এদিকে বিদ্রোহীরাও অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই ছত্রভঙ্গ এবং অবশেষে অনেকেই বিনষ্ট হইল। কেবল হুসেন মির্জা নামে একজন খান্দেশের পর্ব্বতমধ্যে অজ্ঞাতভাবে লুক্কায়িত রহিল। অতঃপর আকবর আগরায় প্রতিগমন করিলেন (১৫৭৩)।

এক মাস অতীত হইতে না হইতেই সম্বাদ আসিল হুসেন মির্জা গুর্জ্জরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া, সম্রাটের তত্রত্য সেনাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। তখন বর্ষাও আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং তৎকালে সৈন্য সামন্ত সমেত অভিনির্যাণ অতীব দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি আকবর অগ্রে ২,০০০ অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়া অবিলম্বে স্বয়ং ৩,০০০ লোকের সহিত উষ্ট্রপৃষ্ঠে যাত্রা করিলেন। গুজরাটে আসিলে সমুদায়ে তাঁহার ৫,০০০ মাত্র অনুচর

সমবেত হইল, কিন্তু বিদ্রোহীরা অকস্মাৎ সম্রাট্‌কে উপস্থিত দেখিয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িল। এবার আকবরকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু অবশেষে তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন।

গুজরাট জয়ের পর (১৫৭৫) আকবর বিহার ও বাঙ্গালা অধিকার করেন। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে, ঐ দুই প্রদেশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক পাঠানদিগের কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল। অধুনা ঐ ভূভাগে দাউদ নামে এক ব্যসনাসক্ত কাপুরুষ রাজত্ব করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে স্বীয় রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায়, দাউদ শঙ্কাযুক্ত হইয়া আকবরকে রাজস্ব প্রদান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে মুহূর্ত্ত-মাত্র সৌভাগ্যোদয় হওয়াতে সেই অঙ্গীকার উল্লঙ্ঘন করিলেন। আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বিহার অধিকার করিলেন। তৎপরে সেনানীদিগের উপরে বাঙ্গালাজয়ের ভার সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং আগরায় পরাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সেনানীরা দাউদকে বাঙ্গালা হইতে অপসারিত করিয়া উড়িষ্যায় তাড়াইয়া দিলেন। অতঃপর দাউদ বঙ্গদেশে প্রতিরোপিত হইবার জন্য কয়েক বার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে তিনি সংগ্রামে পরাভূত ও নিহত হইলেন। এইরূপে (১৫৭৬) বাঙ্গালা ও বিহার পুনর্ব্বার দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত এবং আর্য্যাবর্ত্তে পাঠানদিগের রাজত্ব একবারে বিলুপ্ত হইল। সে যাহা হউক, বাঙ্গালায় বারম্বার রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং ১৫৯২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে তথায় শান্তি স্থাপিত বা সম্রাটের প্রতাপ বদ্ধমূল হয় নাই।

আকবরের সেনাধ্যক্ষেরা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ-দলনে

নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার ভ্রাতা হাকিম স্বীয় অধিকার কাবুল হইতে আসিয়া, পঞ্জাব আক্রমণ করেন; তজ্জন্য সম্রাট স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তদীয় উপস্থিতি মাত্র হাকিম পঞ্জাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আকবর তাঁহার অনুসরণে যাইয়া কাবুল অধিকার করিয়া উঠিলেন। হাকিম প্রথমতঃ পর্ব্বতমধ্যে আশ্রয় লইলেন, অবশেষে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তখন মহানুভব সম্রাট ভ্রাতার তাবৎ অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে কাবুলের শাসনকার্য্যে প্রতিরোপিত করিলেন। অতঃপর হাকিম আর কখনই অবাধ্যতা প্রকাশ করেন নাই।

প্রাগুক্ত ঘটনার পর গুজরাটের পূর্ব্ব রাজা মোজাফর উদ্দেশে স্বাধীন হইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য আকবরের সেনানীদিগকে প্রায় চারি বৎসর তথায় নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল।

— ০ —

অষ্টাদশ অধ্যায়।

আকবরের রাজত্বের পরিশিষ্ট।

১৫৮৫ খৃঃ অব্দে হাকিম লোকান্তর গমন করাতে আকবরকে কাবুলে উপস্থিত হইতে হইল। তথায় কাশ্মীরের তদানীন্তন রাজপরিবারে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে সম্বাদ পাইয়া, তিনি সেই সুযোগে ঐ ভূভাগ অধিকার করিবার মানস করিলেন।

কাশ্মীরের জল বায়ু, উৎপন্ন প্রভৃতি এরূপ মনোহর যে তন্নিবন্ধন ঐ দেশ স্বর্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। উহার

চতুর্দ্দিক্ উন্নত পর্ব্বতে পরিবৃত ; কতিপয় দুর্গম ঘর্ঘর * ভিন্ন উহার অভ্যন্তরে প্রবেশের অন্য পথ নাই। কাশ্মীর অতি প্রাচীন কাল অবধি হিন্দুদিগের অধিকৃত ছিল। পরে খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। পূর্ব্বে যখন হাকিমের পঞ্জাব আক্রমণ নিবন্ধন আকবর তদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি সিন্ধু নদীর তটে আটক নামে নগর স্থাপন করেন। অধুনা তথা হইতে কাশ্মীরের জয়ের জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈনিকেরা বহু কৃচ্ছ্রের পর অবশেষে এক অসংরক্ষিত ঘর্ঘর দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল ; কিন্তু তখন তাহাদের আহার-সামগ্রী নিঃশেষ হইয়াছিল। আরও আক্রান্ত দেশের অধিকার সম্পাদনে এত অন্তরায় দৃষ্ট হইল যে, সেনানীরা কাশ্মীররাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। সেই সন্ধিতে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে, রাজ্যমধ্যে আকবরের প্রভুতা স্বীকৃত হইবে, কিন্তু তিনি শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। আকবর সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া, পর বর্ষে আর এক দল সৈন্য পাঠাইয়া, সমস্ত দেশ অধিকার করিলেন। তখন কাশ্মীরপতি দিল্লীরাজ্যের অমাত্যবর্গের মধ্যে পরিগণিত হইলেন এবং তাঁহার জীবিকার জন্য বিহার দেশে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইল। আকবর অবিলম্বে নবার্জ্জিত দেশ-দর্শনে গমন করিলেন। তিনি অবশিষ্ট আয়ুষ্কালের মধ্যে আর দুইবার মাত্র তদ্দেশ দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীরা অবসর পাইলেই তথায় যাইয়া গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিতেন।

* পর্ব্বতের উপর দিয়া যে সঙ্কীর্ণ পথ থাকে তাহাকে ঘর্ঘর কহে।

কাশ্মীর পরাজিত হইলে আকবর, পেসোয়ারের উত্তরবর্ত্তী ইউসফজি জাতি এবং তন্নগরের দক্ষিণস্থ সলিমান ও কাইবর পর্ব্বতবাসী রৌসিনিয়াদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। শত বর্ষ পূর্ব্বে ইউসফজিরা, তাহাদের আদিম স্থান কাণ্ডাহারের সন্নিধান হইতে আসিয়া, পেসোয়ারের উত্তরবর্ত্তী পর্ব্বতভাগ অধিকার করিয়াছিল। রৌসিনিয়ারা মহম্মদ-প্রণীত ধর্ম্মের সংস্করণ দ্বারা এক নূতন মত উদ্ভাবিত করে। তাহারা একমাত্র পরমেশ্বর মানিত এবং কোরান ও তদুপদিষ্ট যাবতীয় পূজার্চ্চনা অগ্রাহ্য করিত।

আকবর, রাজা বীরবল ও জীন খাঁ নামক দুই প্রধান সেনানীকে ইউসফজিদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন (১৭৮৬)। বীরবল অতিশয় বাক্‌চতুর এবং আকবরের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেনানীরা বহুদূর যাইয়া পর্ব্বত পরম্পরার মধ্যে এরূপ সঙ্কট স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন যে, তাঁহাদের সমস্ত সৈন্যই শত্রুহস্তে নিহত হইল। বীরবল স্বয়ংও সমরশায়ী হইলেন। জীন খাঁ একাকী পদব্রজে পলাইয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। বীরবলের মৃত্যু শ্রবণে আকবর অত্যন্ত বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন।

অবশেষে আকবর আর দুইজন সেনানীকে ইউসফজিদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাঁরা পর্ব্বতমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন ভাগে শিবির সন্নিবেশ দ্বারা শত্রুদিগের কৃষিকার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহারা অগত্যা বশীভূত হইল। তদনন্তর সেই দুয়ের অন্যতর সেনানী মানসিংহ, দক্ষিণ মুখে পরাবৃত্ত হইয়া, রৌসিনিয়াদিগের প্রতিকূলে ধাবমান হইলেন। এদিকে পর

বৎসর (১৫৮৭) আকবর তাহাদের বিরুদ্ধে আর এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেই সেনাদল যাইয়া দক্ষিণ হইতে আক্রমণ করিল। এইরূপে রৌসিনিয়ারা, উত্তর দক্ষিণ উভয় দিক্ হইতেই এককালে আক্রান্ত হওয়াতে তাহাদের নেতা জেলালা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। যাহা হউক, জেলালার মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৬০০) সংগ্রামের বিরাম হয় নাই। ফলতঃ পেসোয়ারের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতবাসীরা কস্মিন্‌কালেও ভারতবর্ষীয় কোন রাজার নিকটে সম্পূর্ণ বশীভূততা স্বীকার করে নাই।

প্রাগুক্ত পার্ব্বতীয়দিগের সহিত সংগ্রাম হেতু আকবর পঞ্চদশ বর্ষ অনুসিন্ধু প্রদেশের উত্তর ভাগে অবস্থিতি করেন। তৎকালের মধ্যে (১৫৯২) সিন্ধুদেশে তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত এবং (১৫৯৪) কাণ্ডাহার পুনরধিকৃত হইয়া উঠে। হুমায়ুন কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে সাহা তমাস্পকে শেষোক্ত ভূভাগের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। পরে আকবরের রাজত্বের প্রথম ভাগে তমাস্প আবার কাণ্ডাহার আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। অধুনা তমাস্পের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রের রাজ্যাভিষেক কালীন গোলযোগের সুযোগ পাইয়া, আকবর বিনাযুদ্ধে কাণ্ডাহার অধিকার করিলেন।

অতঃপর উদয়পুর ও আফগানিস্তানের পার্ব্বতীয় প্রদেশ ভিন্ন, হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আকবরের একাধিপত্য স্থাপিত হইল। তখন দাক্ষিণাত্য তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সেই ভূভাগেও আত্মবিগ্রহ নিবন্ধন তাঁহার পথ পূর্ব্বেই নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। ১৫৯৫ খৃঃ অঃ আমেদনগরের রাজাসনে উপ-

থেকান জন্য অম্লান চারি জন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন সম্রাটের সহায়তা যাচঞা করিলেন। তাহাতে দুই দল মোগল সৈন্য আমেদনগরের সমীপে উপস্থিত হইল। তৎপূর্ব্বে ঐ নগর তাহাদের আহ্বান-কারীর হস্তগত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি চাঁদ-বিবি নাম্নী এক রাজ্ঞী, প্রাগুক্ত অধিকারীকে অপসারিত করিয়া এক শিশুর রক্ষাকর্ত্রীর স্বরূপ হইয়া তাহারই নামে নগর অধিকার করিয়াছিলেন। মোগলদিগের উপস্থিতিমাত্র চাঁদবিবি, বিজয়পুরের রাজা ও আমেদনগরের অবশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে কিছুকালের জন্য অন্যোন্যবৈর স্থগিত রাখিয়া, আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধে, একমিল করিবার উদ্দেশে, অনুরোধ করিলেন। সকলেই তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল। নিহাঙ নামে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, মোগল সৈন্যের মধ্য দিয়া ধাবমান হইয়া, আমেদনগরে প্রবিষ্ট হইলেন। অবশিষ্টেরা বিজয়পুর-রাজের সহিত মিলিত হইয়া আমেদনগরের সাহায্যার্থে আসিতে লাগিলেন। এদিকে চাঁদবিবি প্রচুর শত্রুসৈন্যের অস্ত্র দ্বারা ক্ষত বা নিহত হইবার আশঙ্কায় উপেক্ষা করিয়া, তিনি স্বচক্ষে তাবৎ রক্ষাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও সেনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

মোগল-সেনা-নায়ক আকবরের পুত্র মোরাদ তিনটী কুল্যা * খনন করিলেন। চাঁদবিবি প্রতিকুল্যা-খনন

* দুর্গের প্রাচীর প্রভৃতি ভগ্ন করিবার জন্য আক্রমণকারী সেনা কুল্যা অর্থাৎ সুরঙ্গ খনন করে এবং তন্মধ্যে বারুদ প্রভৃতি রাখিয়া অগ্নি প্রয়োগ করিয়া থাকে। রক্ষিসেনারা প্রতিকুল্যা খনন দ্বারা আক্রমণকারীদিগের তাদৃশ অনুষ্ঠান নিষ্ফল করিবার যত্ন পায়।

দ্বারা দুইটী নিষ্ফল করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু অবশিষ্টটী স্ফুটিত হইয়া নগরপ্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন করিল। সেই ভগ্ন অংশ দিয়া আস্কন্দী সেনারা প্রধাবিত হইল, রক্ষি-সেনারা ভয়ে পলায়ন আরম্ভ করিল। তখন চাঁদবিবি অবগুণ্ঠনে বদন আচ্ছাদন-পূর্ব্বক, বর্ম্ম-পরিহিত শরীরে নিষ্কোষ অসি হস্তে, আস্কন্দীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হই-লেন। রক্ষিসেনারা স্ত্রীলোকের তাদৃশ সাহস দর্শনে লজ্জায় পলায়ন হইতে নিবৃত্ত হইল। অনন্তর বিবিধ ক্ষেপ-ণীয়াস্ত্র বর্ষণ হইতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সংগ্রাম চলিল, অবশেষে মোগলেরা অগত্যা সে দিন নিরস্ত হইয়া পর দিন পুনরাক্রমণ মনস্থ করিয়া, শিবিরে প্রস্থান করিল। পর দিন উপস্থিত হইল; কিন্তু রাত্রিমধ্যেই প্রাচীরের ভগ্নাং-শের এমন মেরামত হইয়াছিল যে, আবার কুল্যা খনন ব্যতীত নগর প্রবেশের কিছুমাত্র উপায় দৃষ্ট হইল না। এদিকে বিজয়পুরের রাজা, সম্মিলিত সৈন্যসমেত, আমেদ-নগরের উদ্ধার হেতু আসিতে লাগিলেন। মোগলেরা সংখ্যায় অধিক ছিল বটে, তথাপি চাঁদবিবি সন্ধির প্রস্তাব করিবামাত্র তাহারা সম্মত হইল। সন্ধিতে এই নির্দ্ধা-রিত হইল যে, আমেদনগর-পতি সম্রাটকে বিরার প্রদেশ অর্পণ করিবেন, সম্রাট আর তাঁহার উপর কোন-রূপ অত্যাচার করিবেন না (১৫৯৬)।

মোগলদিগের সহিত সন্ধির অল্পকাল পরেই আমেদ-নগরের প্রতিদ্বন্দ্বীরা আবার পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করিল। চাঁদবিবির সর্ব্বাধিকারী, তাঁহারই প্রতিকূলে চক্রান্ত করিয়া, মোগলদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। মোরাদ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। খান্দেশের রাজাও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে গোলকুণ্ডার

রাজা চাঁদের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী-তীরে দুই তিন সংগ্রাম হইল। মোগলেরা জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে কিছুই করিতে পারিলেন না। এতা-বৎ শ্রবণে আকবর স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। নর্ম্মদাতীরে উত্তীর্ণ হইয়া শুনিলেন, তাঁহার সেনারা দৌলতাবাদ ও অন্যান্য স্থান অধিকার করিয়াছে। পরে তাপীতটে আসিয়া কুমার ডানিয়ালকে আমেদ নগর অবরোধ করিবার জন্য সসৈন্য প্রেরণ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে নিহাঙ চাঁদবিবিকে ঐ নগরে নিরোধ করিয়াছিলেন। মোগলদিগের আগমনে নিহাঙ প্রস্থান করিলেন। চাঁদবিবি নগরের রক্ষণ অসাধ্য দেখিয়া সন্ধির চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার গৃহশত্রুরা আমেদনগরস্থ সেনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশিত করিল। তাহাদের হস্তে চাঁদবিবি নিধন প্রাপ্ত হইলেন। অচিরকালমধ্যেই হন্তারা তাহাদের দুষ্কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল পাইল। মোগলেরা নগর-প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া উঠিল এবং তদ্দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় যোদ্ধাদিগকে নিহত করিল। তত্রত্য অল্পবয়স্ক রাজা বন্দী হইয়া গোয়া-লিয়র দুর্গে প্রেরিত হইলেন। যাহা হউক, আমেদনগর গ্রহণের সহিত সমগ্র রাজ্য মোগলদিগের অধিকৃত হইল না, আর এক জন রাজা অভ্যুত্থান করিলেন। বহুকাল সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

আমেদনগর অধিকৃত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে খান্দেশ দিল্লী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। আকবর কুমার ডানিয়ালকে বিরার ও খান্দেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োগ এবং সুবিখ্যাত ও পরমদক্ষ মন্ত্রী আবুল ফাজলের উপর

দাক্ষিণাত্যের সৈনিক-কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং আগরায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন (১৬০১)।

জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার সেলিমের অনুচিত আচরণই আকবরের সেই প্রত্যাগমনের মুখ্য হেতু। তদানীং সেলিম ত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ বুদ্ধিবিহীন ছিলেন না, কিন্তু অপরিমিত সুরা ও অহিফেন-সেবনে স্বীয় মনোবৃত্তি কলুষিত করিয়া তুলেন। দাক্ষিণাত্য যাত্রা কালে আকবর তাঁহাকেই আপনার ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহার প্রতি আজমীরের শাসনকর্ত্তৃত্ব সমর্পণ করিয়া যান। সেলিম তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পিতার অনুপস্থিতির সুযোগে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার বাসনা করিলেন। তিনি আগরার অধিকার চেষ্টায় বিফল হইলেন বটে, তথাপি বিহার ও অযোধ্যা হস্তগত করিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া প্রচার করিলেন। এতাবৎ শ্রবণে আকবর সেলিমকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, "তুমি যেরূপ অবৈধ আচরণ করিতেছ, তাহাতে তোমার যৎপরোনাস্তি বিপদ ঘটিবে। কিন্তু এখনও সৎপথে ফিরিয়া আসিলে তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিব।" এই পত্র প্রেরণের অত্যল্প কাল পরেই আকবর স্বয়ং আগরায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন সেলিম অগত্যা বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং পিতার নিকট হইতে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

পিতাপুত্রে একপ্রকার পুনর্ম্মিলন হইল। এই অবসরে সেলিম এক অতি বিগর্হিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন। তিনি আবুলফাজলকে শত্রুবোধে নিয়তই তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা পাইতেন। সম্প্রতি সেই সচিব

দাক্ষিণাত্য হইতে পরাবৃত্ত হইতেছিলেন। সেই সম্বাদ পাইয়া সেলিম বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একজন হিন্দুরাজাকে তাঁহার নিপাত সাধনে নিযুক্ত করিলেন। আবুল-ফাজলের সহিত অধিক সৈন্য ছিল না, রাজা অল্প আয়াসেই তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। পরে তাঁহার ছিন্নমুণ্ড সেলিমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন (১৬০২)। আকবর মন্ত্রীর অপঘাত শ্রবণে অতীব শোকাতুর হইলেন। তিনি অপরিমিত অশ্রুবর্ষণ-পূর্ব্বক দুই দিন দুই রাত্রি আহার নিদ্রা বিনা অতিবাহন করিলেন। তাঁহার আপন পুত্র যে মন্ত্রীর বধে লিপ্ত ছিলেন, আকবর হয়ত তাহা জানিতেন না, অথবা জানিয়াও সে বিষয় গোপন রাখিলেন, কিন্তু প্রকাশ্য হত্যাকারীকে দণ্ড দিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহার কোন সন্ধানই হইল না।

এই নৃশংস ব্যাপারের অল্পকাল পরেই (১৬০৩) সেলিম সম্রাটের সভায় উপস্থিত হইলেন, তথায় পিতা তাঁহাকে রাজাভরণ ধারণে অনুমতি দিলেন। যাহা হউক, অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই সেলিম আবার অবাধ্য হইয়া উঠিলেন এবং আপনার স্বাধীনকল্প আবাসস্থান আলাহাবাদে পরাবর্ত্তন করিলেন। তথায় তিনি অতিশয় ব্যসনাসক্ত ও ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরত-পরতন্ত্র হইয়া উঠিলেন। খস্রু নামে সেলিমের এক পুত্র ছিল, খস্রুর চিত্ত লঘু ও স্বভাব প্রচণ্ড ছিল। সেলিম মনে করিয়াছিলেন খস্রু আকবরের প্রীতিভাজন হইয়াছে, উত্তরকালে সম্রাট তাহাকেই সাম্রাজ্য প্রদান করিয়া যাইবেন মনস্থ করিয়াছেন। সেলিম পূর্ব্বাবধিই খস্রুকে দেখিতে পারিতেন না। এক্ষণে আবার সে আপন

পথের কণ্টক-স্বরূপ জ্ঞান হওয়াতে তাঁহার বিদ্বেষ অতীব প্রবল হইয়া উঠিল। তন্নিবন্ধন খস্রুর জননী রাজা মানসিংহের ভগিনী এমনি ক্ষুব্ধ হইলেন যে বিষপান দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই ব্যাপারের কিছু কাল পরে সেলিম আবার সম্রাটের সভায় পরাবৃত্ত হইলেন। সম্রাট প্রথমতঃ তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই পুনর্মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মোরাদ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। এক্ষণে তৃতীয় পুত্র ডানিয়ালের মৃত্যু সম্বাদ উপস্থিত হইল। পানদোষই ইহাঁর সেই অকাল মৃত্যুর হেতু। ইনি পিতার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে সুরা পরিত্যাগ করিবেন। এদিকেও সম্রাট-নিযুক্ত লোকদিগের কর্ত্তৃক সর্ব্বদা এরূপ পরিবেষ্টিত থাকিতেন যে, প্রকাশ্যরূপে মদিরা লালসার তৃপ্তি করিতে পারিতেন না। অগত্যা পাখী মারা বন্দুকের চোঙের ভিতর করিয়া গুপ্তভাবে মদ আনয়ন করিতে লাগিলেন। এবং তদ্দ্বারা অল্পকালমধ্যেই আত্ম-ঘাত সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আকবরের স্বভাবতঃ স্নেহার্দ্র হৃদয় অতিশয় আর্ত্ত হইল। উপর্য্যুপরি শোক সন্তাপে সম্রাটের স্বাস্থ্য বিগত হইতে লাগিল। অমনি উত্তরাধিকারী নিরূপণ জন্য ষড়যন্ত্রও উপস্থিত হইল। সেলিম স্বদোষে আকবরের অপ্রীতি-ভাজন হইয়াছেন, এজন্য সম্রাট তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার পুত্র খস্রুকে রাজাসন প্রদান করিয়া যাইবেন অনেকে এইরূপ অবধারণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা সেই যুবরাজের পক্ষই অবলম্বন করিলেন। যাহা হউক, আকবর স্পষ্টবাক্যে

সেলিমকে পুনঃ পুনঃ আপনার প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, অবশেষে কেহই আর তাহার বিরুদ্ধ চেষ্টা করিল না। মুমূর্ষু কালে মহোদয় আকবর সমুদায় প্রধান প্রধান অমাত্য ও সেলিমকে আপনার শয্যার পার্শ্বে আহ্বান করিয়া, কহিলেন "যদি আমি তোমাদের কাহারও কখন কোনরূপ অনিষ্ট করিয়া থাকি এক্ষণে আমার সেই অপরাধ মার্জনা কর।" তৎশ্রবণে সেলিম অশ্রুসমুচ্ছলিতলোচনে পিতৃচরণে নিপতিত হইলেন। তখন আকবর আপনার প্রিয় তরবারির দিকে নেত্রপাত করিয়া, নিজের সমক্ষে, সেলিমকে উহা গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তৎপরে আপনার অবরোধবাসিনীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বন্ধু ও অনুচরবর্গের প্রতি যত্ন প্রদর্শনে পুত্রকে আদেশ করিয়া মুসলমানদিগের পদ্ধতির অনুরূপ ঈশ্বরচিন্তার পর, প্রকৃত মহাত্মা আকবর দেহ পরিত্যাগ করিলেন (১৬০৫)। তিনি পঞ্চাশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আকবর সুদৃঢ়, সুঘটিত ও অতিশয় গৌর-কলেবর ছিলেন। তিনি যৌবনে সুরাপ্রিয় ও বিলাসী ছিলেন বটে কিন্তু পরে বিলক্ষণ মিতাচারী হইয়া উঠেন। মৃগয়ায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল; বিশেষতঃ ব্যাঘ্র হস্তী প্রভৃতি যে সকল জন্তুর শিকারে অপেক্ষাকৃত অধিক বিপদ ও বিভ্রাটের সম্ভাবনা তাহাই অধিক ভাল বাসিতেন। অশ্বপৃষ্ঠে অনেক দূর পর্য্যটনে মহা আমোদ অনুভব করিতেন। কখন কখন ইচ্ছা করিয়া পদব্রজেও এক এক দিন পনর ষোল ক্রোশ পথ চলিতেন। অত্যল্পকাল নিদ্রাতেই তাঁহার পর্য্যাপ্ত হইত। তিনি অতিশয় সাহসী ছিলেন; তথাপি যুদ্ধে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ

ছিল না। তিনি যে সকল সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন তত্তাবৎই দিল্লীর পূর্ব্বাধিকার পুনরাহরণের জন্য উপস্থিত হয়। তিনি অতিশয় নম্র, উদার, সদয় ও বদান্য ছিলেন। তিনি দর্শন ও পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ক তর্ক বিতর্কে একান্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু স্বমতের বিরুদ্ধবাদী-দিগের প্রতি অণুমাত্রও বিরক্ত হইতেন না। বলে বা কৌশলে, প্রজাদিগের নিষ্পীড়ন দ্বারা, কোষ পরিপূরণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রত্যুত তিনি মঙ্গল বর্দ্ধন দ্বারা প্রকৃতি-বল্লভ হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেন। তিনি হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোনরূপ ইতর-বিশেষ করিতেন না। গুণ থাকিলে উভয় সম্প্রদায়ী-দিগকেই অত্যুন্নত পদে স্থাপিত করিতেন। ফলতঃ হিন্দু মুসলমানদিগের পরস্পর প্রভেদ নিবারকরণ দ্বারা, সমুদায় ভারতবর্ষীয়দিগকে একমিল করিয়া, সকলের আন্তরিক প্রণয় ও ভক্তির আস্পদ হইয়া রাজত্ব করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বলা বাহুল্য যে, আক-বরের সদৃশ প্রকৃত মহাত্ম রাজা ভারতবর্ষে, কি পৃথি-বীতেও, অধিক দেখা যায় না।

আদৌ আকবর মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন, পরে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নির্ম্মল উপাসনা অবলম্বন করেন। তাঁহার মতে মনুষ্যের প্রণীত কোন প্রকার অর্চ্চনাপ্রণালী বা কর্ম্মকাণ্ড মান্য নহে; কারণ এই যে, কি প্রধান কি ক্ষুদ্র, মানব মাত্রেরই মতিভ্রম সম্ভব। তিনি বলিতেন "যুক্তিই আমাদের প্রকৃত উপদেশক, তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও পরমদয়ালুত্ব স্পষ্টরূপে প্রতি-পন্ন হইতেছে। জঘন্য রিপুবর্গের দমন* ও মনুষ্যের হিত কার্য্যসাধন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, তদনুষ্ঠানেই নর পারলৌকিক

সুখলাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন।" আহার বিষয়ে আকবরের কোন প্রকার দ্রব্যের নিষেধ ছিল না। তিনি জাতিভেদও স্বীকার করিতেন না। তিনি মুসলমান-ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট কতিপয় অযৌক্তিক কর্ম্ম-কলাপের বিলোপ সাধনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের পক্ষেও তিনি অনেক অযৌক্তিক পদ্ধতি রহিত করিবার প্রয়াস পান। তিনি অগ্নি-পরীক্ষা * বিধবাদিগের অমতে তাহাদিগকে স্বামীর চিতায় আরোপণ এবং বাল্য-বিবাহ নিষেধ করেন। বিধবাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেও অনুমতি দেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান রাজাদিগের সময়ে হিন্দু তীর্থযাত্রীদিগকে অনেক শুল্ক প্রদান করিতে হইত। আকবর তত্তাবৎ রহিত করেন। তাঁহার মতে যাঁহার যেরূপ চিত্ত তিনি তদনুরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করুন, তাহার ব্যাঘাত চেষ্টা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। মুসলমান রাজ্যে, মুসলমান প্রজা ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে জিজিয়া নামে এক প্রকার শুল্ক প্রদান করিতে হয়। ভারতবর্ষের হিন্দুদিগকেও সেই জিজিয়া প্রদান করিতে হইত। আকবর তাহা রহিত করেন।

ধর্ম্মবিষয়ে আকবরের প্রাগুক্তরূপ উদার মত দেখিয়া গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষী হইয়াছিল। অনেকেই তাঁহাকে নাস্তিক বলিত। উপাসনা বিষয়ে তাঁহার মতও এরূপ নির্ম্মল ও উন্নত ছিল যে উহা সাধারণ জনের বুদ্ধিগম্য নহে। এপর্য্যন্ত কতিপয় প্রশস্তমন-

---

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে এইরূপ প্রথা ছিল যে, কাহার প্রতি কোন দোষারোপ হইলে তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নি, তপ্ততৈল প্রভৃতি স্পর্শ করিতে বলা হইত। যদি স্পর্শ দ্বারা তাহার শরীর দগ্ধ না হইত তাহা হইলে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হইত।

পণ্ডিতেরা ভিন্ন উহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই ; সুতরাং আকবরের মৃত্যুর অল্প কাল পরেই উহারও বিলোপ হয়।

আকবর হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে একত্র করিয়া নিজ নিজ মতের পোষক তর্ক বিতর্ক শ্রবণ করিতেন। সেই সকল বিষয়ে ফেজি ও আবুলফাজল নামে দুই সহোদর তাঁহার সহকারী ছিলেন। পূর্ব্বে ইহাদের পিতা আগরায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও ব্যবহার তত্ত্বের উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনি যে সকল উপদেশ দিতেন সে সকল মুসলমানধর্ম্মের সম্পূর্ণ সম্মত ছিল না। তজ্জন্য তিনি তদ্ধর্ম্মাক্রান্তদিগের বিদ্বেষভাজন হন এবং তাঁহাকে আগরা পরিত্যাগ করিতে হয়। মুসলমানদিগের মধ্যে ফেজিই প্রথমে সংস্কৃতভাষার বিশিষ্ট অনুশীলন করেন এবং উহা হইতে বিবিধ কাব্য, দর্শন এবং বীজগণিত ও লীলাবতীরও অনুবাদ করিয়া উঠেন। আকবর গ্রীকভাষা হইতেও গ্রন্থ অনুবাদ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি কতিপয় যুবককে তদ্ভাষায় শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত এক জন পর্টুগিজ পাদরিকে নিযুক্ত করেন। ফেজি স্বয়ং খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুবাদে আদিষ্ট হন। ফেজির ভ্রাতা অবুলফাজল কৃতবিদ্য ছিলেন। তিনি আকবরনামা অর্থাৎ আকবর-চরিতের রচয়িতা। যাহা হউক, আবুলফাজল রাজনীতি ও সৈনিক কার্য্যেই অধিক বিখ্যাত হন। আকবর তাঁহাকে আপনার প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন। তাঁহার কিরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছিল ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ হইয়াছে।

আকবর রাজস্ব আদায় ও সৈন্য সংক্রান্ত কতিপয়

বিষয়ের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া যান। ক্রমান্বয়ে সে সকলের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

রাজস্ব—অতিপ্রাচীন কাল অবধি ভারতবর্ষের ভূসম্পত্তিতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই স্বত্ব উপলক্ষিত হয়; অর্থাৎ প্রজারা নিজ নিজ ভূমি উপভোগ করে এবং তদুৎপন্ন হইতে রাজাকে কর প্রদান করিয়া থাকে। রাজা বলপূর্ব্বক প্রজাদিগের ভূসম্পত্তি স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রজারাও, বিশিষ্ট কারণ বিনা, নিষ্করভূমির উপভোগ করিতে পায় না। এরূপ অনুমতি হয় যে, আদৌ যে সকল প্রজাদিগের ভূসম্পত্তি পরস্পর সন্নিহিত ছিল তাহারা সকলে, অন্যোন্য রক্ষা ও সাহায্যের জন্য একমিল হইয়া আপনাদের ভূসম্পত্তির অনতি দূরে বসতি করে। তদ্দ্বারা গ্রামের সংঘটন হয়। পরে প্রত্যেক প্রজার নিকট স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজস্ব আদায়ের পরিবর্ত্তে যে গ্রামে যত ভূমি সেই গ্রামের উপর তদনুরূপ কর নিরূপিত হইয়া উঠে এবং প্রজাদিগের মধ্যে যে যত ভূমির অধিকারী সে তদনুসারে গ্রামের নির্দ্দিষ্ট করের অংশ প্রদান করিয়া আইসে।

হিন্দু রাজাদিগের সময়ে প্রতিগ্রামে গ্রামীক নামে এক জন প্রধান প্রজা নির্দ্দিষ্ট থাকিতেন। তিনি যে ভূমি যেমন উর্ব্বরা তাহার উপর তদনুরূপ রাজস্ব নির্দ্ধারণ, সেই রাজস্বের আহরণ এবং অস্বামিক ভূমির বিতরণ করিতেন। তদ্ভিন্ন অধুনা মেজেষ্টরেরা যে সকল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন সামান্যতঃ গ্রামীকেরা তৎসমুদায়ও সম্পন্ন করিতেন। গ্রামীকের অধীনে একজন মসিপণ্য অর্থাৎ পাটোয়ারি নিযুক্ত থাকিত। মসিপণ্য অধুনাতন পাটোয়ারিদিগের ন্যায় কোন্ ভূমির কত কর, উহা কাহার

অধিকৃত ইত্যাদি বিষয়ের হিসাব রাখিতেন। গ্রামীক ও মসিপণ্যের অধীনে প্রহরী অর্থাৎ চৌকিদার নিযুক্ত থাকিত। ইহারা আপন আপন ভরণপোষণের জন্য কিয়ৎপরিমাণে নিষ্কর ভূমি উপভোগ করিত। প্রাগুক্ত তিন কর্ম্মচারী ভিন্ন গ্রামপুরোহিত, আচার্য্য, কর্ম্মকার, ক্ষৌরকার ইত্যাদি ব্যবসায়ীরাও গ্রামবাসীদিগের হইতে নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইত, অর্থাৎ ইহারা যে ভূমি উপভোগ করিত, গ্রামবাসীরা সকলে সাধারণ হইতে তাহার রাজস্ব প্রদান করিত।

দশ, বিংশতি, ত্রিংশৎ, ইত্যাদি সংখ্যক গ্রামের উপরে এক এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা দশী, বিংশী ইত্যাদি নামে, আখ্যাত হইতেন। গ্রামীকেরা দশীকে, দশীরা বিংশীকে, ইতিক্রমে ক্রমোপরিস্থিতদিগকে স্ব স্ব ভূভাগের রাজস্ব অর্পণ করিতেন। অবশেষে উহা যাইয়া রাজকোষে উপস্থিত হইত। রাজারা সৈনিক অথবা ব্যাবহারিক * কর্ম্মচারীদিগকে বেতনের পরিবর্ত্তে নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদান করিতেন। সেই সকল ভূমির রাজস্ব রাজকোষে অর্পিত হইত না, উহা কর্ম্মচারীরাই প্রাপ্ত হইতেন।

প্রাগুক্ত অতি সংক্ষিপ্ত ও অগত্যা অসম্পূর্ণ হিন্দুপ্রণালীর পাঠ দ্বারা আকবরের রাজ্য-বিষয়ক বন্দোবস্ত পাঠকদিগের সুবুদ্ধ হইতে পারিবে। আকবরের পূর্ব্বগত মুসলমানদিগের রাজত্বকালে হিন্দুপ্রণালীর অধিক

---

* জজ, মেজেষ্টর, কালেক্টর প্রভৃতি তাবৎ অসৈনিক রাজপুরুষদিগকে ব্যাবহারিক কর্ম্মচারী বলা যায়, যেহেতু ব্যবহার অর্থাৎ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য।

পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, রাজস্ব আদায় কার্য্য হিন্দু রাজাদিগের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতেই সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল। কেবল প্রজারা রাইয়ত; গ্রামীকেরা মণ্ডল; দশী, বিংশী প্রভৃতিরা জমিদার; এবং সৈনিক ও ব্যাবহারিক কর্ম্মচারীদিগের নিষ্কর ভূমি জায়গির; ইত্যাদি নামপরিবর্ত্ত মাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

আকবর এক নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ মানদণ্ড দ্বারা, সাম্রাজ্যের সমস্ত কৃষিযোগ্য ভূমির মাপ অর্থাৎ জরিপ সম্পন্ন করিয়া, উর্ব্বরতার তারতম্য অনুসারে, তত্তাবৎ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। পরে সেই তিন প্রকার ভূমিতে প্রত্যেক বিঘার গড় উৎপন্ন কত তাহা ধার্য্য হয়। তদনন্তর সেই গড় উৎপন্নের তৃতীয়াংশ রাজপ্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে। রাজস্ব-স্বরূপ শস্য গ্রহণ করা অসুবিধা, এজন্য ঊনবিংশতি বর্ষ পূর্ব্ব হইতে যে মূল্যে শস্য বিক্রীত হইয়া আসিতেছিল তাহার গড় ধরিয়া প্রত্যেক প্রকার শস্যের মূল্য নিরূপিত হয়। সেই নিরূপিত মূল্য অনুসারে, রাজার প্রাপ্য শস্যের তৃতীয়াংশের বিনিময়ে প্রত্যেক বিঘার উপর কর স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মুদ্রা নিরূপিত হইয়া উঠে। কিন্তু কোন প্রজা বিশিষ্ট হেতু প্রদর্শন-পূর্ব্বক মুদ্রাপ্রদানে অসম্মত হইলে তাহার নিকট শস্যই গৃহীত হইত। প্রথমতঃ বৎসর বৎসর নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। পরে দশ বৎসর অন্তর হইতে লাগিল। রাজা তোড়লমুল নামে আকবরের অতি দক্ষ দেওয়ান ছিলেন। মালের কর্ম্মে ইহাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। ইহাঁরই বুদ্ধিকৌশলে আকবর-কৃত রাজস্বের বন্দোবস্ত সম্পন্ন হইয়া উঠে। তোড়লমুল রজঃপুত-বংশসম্ভূত ছিলেন।

আকবর দিল্লীর সাম্রাজ্য পঞ্চদশ সুবা অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে দ্বাদশটী আর্য্যাবর্ত্তের, তিনটী দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত। প্রত্যেকের শাসনের জন্য এক এক জন প্রধান কর্ম্মসচিব নিযুক্ত থাকিতেন। আকবরের সময়ে সুবার প্রধান কর্ম্মসচিবদিগকে সিপাসালার কহিত। পরে ইহারা সুবাদার নামে অভিহিত হইয়া উঠেন। ইহাঁরা আপন আপন সুবার সৈনিক, ব্যাবহারিক সকল বিষয়েরই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। কালক্রমে আয়ব্যয় বিষয়ের অধ্যক্ষতার জন্য প্রত্যেক সুবায় দেওয়ান নামে এক এক জন কর্ম্মসচিব নিযুক্ত হন। সম্রাট্ স্বয়ং ইহাঁদিগকে নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু ইহাদিগকে সুবাদারের অধীন থাকিতে হইত।

সৈন্য— আকবরের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে সেনার রাজকোষ হইতে বেতন প্রাপ্ত হইত না। সেনাধ্যক্ষেরা জায়গির পাইতেন; তাহার উপস্বত্ব হইতে তাঁহারা আপন আপন অধীন সৈনিকদিগকে ভৃতি প্রদান করিতেন। কোন কোন স্থলে রাজার প্রাপ্য করের উপরেও বরাত দেওয়া হইত। সেনারা সেই বরাত চিঠি লইয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইত। প্রাগুক্ত দুই প্রথার মধ্যে এক দ্বারা রাজা প্রতারিত, অন্য দ্বারা প্রজারা দারুণ নিষ্পীড়িত হইত। কারণ এই যে, জায়গিরদারেরা নিজ নিজ জায়গিরের অনুরূপ সৈন্য রাখিতেন না; সৈন্য প্রদর্শনকালে ভৃত্য ও মজুর প্রভৃতি একত্র করিয়া কোনরূপে সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিতেন। আর সেনারা রাজস্বে বরাত প্রাপ্ত হইলে, অধিক টাকা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে, প্রজাদিগের উপর অতিশয় উপদ্রব করিত।

আকবর বরাত্তের পদ্ধতি একেবারে রহিত করিলেন। তৎপরিবর্ত্তে রাজকোষ হইতে বেতন প্রদানের নিয়ম করিয়া দিলেন। আর জায়গিরদারদিগের প্রতারণানিবারণজন্য এই নিয়ম করিলেন যে, তাহাদের অধীন সৈনিকদিগের এক এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি থাকিবে। সৈন্য প্রদর্শন কালে, সেই চিত্রের সহিত সকলের অবয়ব মিলাইয়া লওয়া যাইবে। সেনাদিগের অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতির গাত্রে ছাব দেওয়ার নিয়মও করিয়া দিলেন।

আকবরের সময়ে সৈনিকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বদ্ধ করিবার রীতি ছিল না। এক এক সেনাধ্যক্ষ দশ জন অবধি অনধিক দশ সহস্র যোদ্ধা লইয়া, রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে মন্সবদার কহিত। ইঁহারা যিনি যত সেনার অধ্যক্ষ তিনি তদনুরূপ উপাধি পাইতেন; অর্থাৎ যিনি শত জন সৈনিকের অধ্যক্ষ তাঁহাকে শতপতি, যিনি সহস্র জনের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সহস্রপতি, ইত্যাদি উপাধি প্রদত্ত হইত। দশ সহস্রপতির উপাধি কেবল রাজকুমারেরাই প্রাপ্ত হইতেন। রাজকুটুম্ব ও বক্সঃপ্রত রাজারা পঞ্চসহস্রী উপাধি পাইতেন। অপরাপর লোকে প্রাগুক্তদিগের অপেক্ষা অল্পসংখ্যাসূচক সৈন্যের মন্সবদার হইতেন। প্রত্যেক মন্সবদারের সৈন্যের অর্দ্ধভাগ অশ্বারোহী, অপরার্দ্ধ পদাতিক থাকিত। পদাতিকদিগের চতুর্থভাগ বন্দুকধারী, অবশিষ্ট ভাগ ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করিত। সৈনিকদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ দক্ষতা সে তদনুরূপ বেতন পাইত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈনিকেরা ২৫৲, তদপেক্ষা নিকৃষ্টেরা ২০৲, বন্দুকধারীরা ৬৲, এবং তীরন্দাজেরা ২॥০ টাকা হিসাবে বেতন পাইত। মন্সবদারদিগের বেতন বিলক্ষণ স্থূল ছিল।

তাঁহারা সুচারুরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে তাঁহাদের সন্তানেরাও পিতার পদ ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। কোন কোন স্থলে বৃত্তিও নিরূপিত হইত। কিন্তু মন্সবদারদিগের কর্ম্ম পুরুষানুক্রমিক ছিল না। আকবরের সময়ে সমুদায়ে কত সৈন্য নিযুক্ত থাকিত, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আকবর স্বয়ং পরিচ্ছদ ও আভরণ বিষয়ে বিশেষ আড়ম্বর করিতেন না। কিন্তু তাঁহার সভা অতীব সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। বিষুবদ্সংক্রম ও সম্রাটের জন্ম দিবসে মহোৎসব হইত। তখন সম্রাটের অধিবাস জন্য এক মহামূল্য উপকার্য্যা সন্নিবেশিত হইত; উপকার্য্যার সন্নিহিত বহুদূর ভূমি কাঞ্চন-কারু-ক্রিয়াযুক্ত ক্ষৌমে মণ্ডিত হইয়া উঠিত। সম্রাট স্বর্ণময় তুলাধারে আসীন হইয়া ক্রমান্বয়ে সুবর্ণ রজত প্রভৃতি মহার্হ দ্রব্যে তুলিত হইতেন। পরে তৎসমুদায় দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিতরিত হইত। সেই দুই উৎসব সময়ে সম্রাটের সদস্যেরাও অতিশয় আড়ম্বর প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদের উপবিন্যস্ত হীরকাদি বিবিধ মণির আভায় দিগ্বলয় সমুজ্জ্বল হইয়া মনোহারিণী শোভা ধারণ করিত। সম্রাট তুলিত হইলে পর সুসজ্জীভূত হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বন্য জন্তু তাঁহার সমীপে আনীত হইত। অবশেষে কাঞ্চন-বস্ত্র-ভূষিত বহুল অশ্বারোহী বল্গিত হইলে মহোৎসব পরিসমাপ্ত হইয়া উঠিত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জাহাঙ্গীর।

সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীর অর্থাৎ ভূ-বিজয়ী এই উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৬০৫)। রাজত্বের প্রারম্ভেই তিনি কতিপয় উৎকৃষ্ট নিয়ম উদ্ভাবিত ও প্রচালিত করেন। তৎসমুদায় দ্বারা কতিপয় বিরক্তিকর শুল্কের রদ, গৃহস্থদিগের বাটীতে রাজপুরুষদিগের বলপূর্ব্বক বাসা করা রহিত, মদিরাপানের সম্পূর্ণ প্রতিষেধ* এবং নাসা কর্ণ ছেদন দণ্ডের নিবারণ হইয়া আইসে। আর, যাহার ইচ্ছা হয় রাজ-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে পারে, এই উদ্দেশে জাহাঙ্গীর নিজ আবাসগৃহে, কতকগুলি সুবর্ণময় ঘন্টা টাঙ্গাইয়া, সেই ঘন্টাবলীতে এক শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া, শৃঙ্খলের অপর প্রান্ত প্রাসাদের বহির্ভাগে ঝুলাইয়া দেন; যাহার প্রয়োজন হইত সে সেই শৃঙ্খল নাড়িত; তদ্দ্বারা ঘন্টাধ্বনি হইয়া উঠিত। তাহাতে সম্রাট জানিতে পারিতেন কোন আবেদনকারী আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, জাহাঙ্গীরের খসরু নামে এক পুত্র ছিল এবং সেই পুত্রের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল না। রাজাসনে অভিষেকের চারি মাসের মধ্যেই একদা রজনীতে জাগরিত হইয়া, জাহাঙ্গীর শুনিলেন, কুমার খসরু কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে দিল্লীর অভিমুখে পলায়ন করিতেছেন। অবিলম্বে কুমারের অনুসরণে লোক প্রেরিত হইল এবং প্রাতে, তৎকালোপস্থিত সমস্ত

---

* জাহাঙ্গীর মদিরাপান নিষিদ্ধ করেন বটে, কিন্তু স্বয়ং অতিশয় সুরাসক্ত ছিলেন।

সৈন্যের সহিত, সম্রাট্ স্বয়ং যাত্রা করিলেন। এদিকে খসরু সৈন্যসংগ্রহ ও দেশ লুঠ করিতে করিতে অবশেষে দশ সহস্র সেনার সহিত পঞ্জাবে উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় সম্রাটের অগ্র্য সেনাদিগের সহিত তাঁহার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিকুল দৈববশে ধৃত ও পরে নিগড়-নিবদ্ধ হইয়া সম্রাট্ সকাশে আনীত হইলেন। জাহাঙ্গীর পুত্রের প্রাণরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুচরদিগকে নিজের নিষ্ঠুর স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় দিলেন। তিনি তাহাদের মধ্যে অন্যূন সপ্তশত ব্যক্তিকে শূলে আরোহিত করিলেন এবং খসরুকে করিপৃষ্ঠে তুলিয়া তাহাদের সম্মুখ দিয়া চালিত করিলেন। সম্রাটের আদেশানুসারে একজন বেত্রধারী কুমারের পার্শ্বে বসিয়া শূলে আরোহিতদিগকে লক্ষ্য করিয়া, বিদ্রূপভাবে বলিতে লাগিল—"যুবরাজ! আপনকার সম্বর্দ্ধনার্থ অনুচরেরা দণ্ডায়মান রহিয়াছে. উহাদিগের অভিবাদন গ্রহণ করুন"। তদনন্তর খসরু কারাগৃহে সমর্পিত হইলেন। তথায় তিনি তিন দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর বৎসর (১৬০৬) বসন্ত সময়ে জাহাঙ্গীর কাবুলে গমন করেন এবং তথায় খসরুর শৃঙ্খল মোচন এবং তাহাকে দুর্গান্তর্গত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে অনুমতি দেন। কিন্তু কিছু কাল পরেই সম্রাটের প্রাণসংহার ও খসরুর কারাবিমোচনের এক ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইল। তাহাতে খসরুর প্রতি জাহাঙ্গীরের তদানীন্তন সদয়ভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র পার্ব্বিজ উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি রাণার

সহিত এক নিয়ম স্থাপনের উদোগ পাইতেছিলেন, এমন সময়ে খসরুর প্রাগবর্ণিত পলায়ন নিবন্ধন, সম্রাট সমীপে আহূত হন। অনধিক এক বৎসর মধ্যেই রাণার সহিত আবার সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এদিকে দাক্ষিণাত্যে, আকবরের সময় হইতে এপর্য্যন্ত আমেদসাহী রাজাদিগের সহিত সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছিল। ১৬১০ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের দক্ষ সেনানী মালিক আম্বর মোগলসেনাদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাভব করেন এবং অবশেষে আমেদনগর পুনরধিকার করিয়া সেই নগরের সন্নিধান হইতে শত্রুদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন।

রাজত্বের ষষ্ঠবর্ষে (১৬১১) জাহাঙ্গীর সুপ্রসিদ্ধ নুরজাহানের পাণিগ্রহণ করেন। তদবধি সেই পরিণয়ের প্রবল প্রভাব তাঁহার শাসনের প্রধান নিয়ামক হইয়া উঠে।

পারস্যের অন্তর্গত তিহরান নগরের এক প্রধান রাজকর্ম্মচারীর পুত্র গিয়াসুদ্দিন দরিদ্রভাবাপন্ন হইয়, ভাগ্য বর্দ্ধনের উদ্দেশে, ভারতবর্ষে আসিবার সঙ্কল্প করেন এবং দুই পুত্র ও তদানীং গর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর সহিত স্বদেশ হইতে নির্গত হন। কাণ্ডাহারের সমীপে আসিয়া তাঁহার পত্নী এক কন্যা প্রসব করিলেন। পথিশ্রান্তি, প্রসবযন্ত্রণা ও উপযুক্ত আহারাভাবে গর্ভধারিণী যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বলা হইয়াছিলেন, তাঁহার স্তনে এমন দুগ্ধ ছিল না যে তদ্দ্বারা দুহিতার জীবন রক্ষা হয়। গিয়াসও এরূপ নিঃসম্বল হইয়াছিলেন যে ধাত্রীনিয়োগ অথবা পুষ্টিকর খাদ্যদ্বারা স্ত্রীর বলাধান করেন এমন সংস্থান ছিল না। অগত্যা তিনি বিষণ্নমনে সেই অচিরজাতা দুহিতাকে পথিপ্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া আসিলেন। অনুকূল দৈববশে সেই পথে একদল সার্থবাহ উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে এক

প্রধান বণিক, সরণিশায়ী শিশুর অনুপম সৌন্দর্য্যে প্রীত হইয়া, তাহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রতিপালনের মানস করিলেন এবং তজ্জন্য একজন ধাত্রীর প্রয়োজন হইল। এমন সময়ে এক অচিরপ্রসূতি আসিয়া সেই কার্য্য স্বীকার করিলেন। পথিমধ্যে ধাত্রীকার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী স্ত্রীলোক সহসা পাওয়া দুর্লভ, এজন্য অসম্ভব নহে যে কন্যার আপন মাতাই আসিয়া তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বণিক মহাশয় এইরূপে সেই স্ত্রীপুরুষের দুরবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাদের উপস্থিত ক্লেশ মোচন করিলেন, পরে গিয়াস ও তদীয় পুত্রদিগকে কার্য্যদক্ষ দেখিয়া তাহাদিগকে আপনার বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি উহাদিগের জন্য আকবর সম্রাটকে অনুরোধ করায় তাঁহারা সম্রাট-সরকারে নিযুক্ত হইলেন এবং আপনাদের বুদ্ধিবলে ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিলেন।

কালসহকারে সেই সরণিনিক্ষিপ্তা বালা অনুপমরূপ-লাবণ্যবতী মোহিনী যুবতী হইয়া উঠিলেন। আকবরের অবরোধে তাঁহার মাতার প্রবেশাধিকার ছিল। কখন কখন তিনিও জননীর সমভিব্যাহারে তথায় যাইতেন। একদা সেইরূপে গিয়াছেন এমন সময়ে যুবরাজ সেলিমের নেত্রগোচর হইলেন। সেলিম তাঁহাকে দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। কন্যার মাতা তাহাতে বিরক্ত হইয়া, অবরোধবাসিনী কোন স্ত্রীলোক দ্বারা, তাবৎ আকবরের জ্ঞাত করিলেন। আকবর পুত্রকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া, পরে গিয়াসকে অবিলম্বে কন্যার বিবাহ দিতে কহিলেন। তদনুসারে সের আফগান খাঁ নামক এক পারসীক যুবকের সহিত তাহার বিবাহ সম্পন্ন হইল। মহানুভব

আকবর বঙ্গদেশে সেরকে একখানি জায়গির প্রদান করিলেন।

যুবতী পরকীয়া ও দূরদেশে নীতা হইলেন বটে, কিন্তু সেলিমের অনুরক্ত হৃদয়ে তাঁহার ছবি নিয়ত জাগরূক রহিল। কিন্তু পিতার কঠিন শাসনে যুবরাজকে মনের আবেগ মনেই সম্বরণ করিতে হইয়াছিল। অধুনা তিনি স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া সেই চিরলালসিত স্ত্রীরত্ন আহরণে প্রতিশ্রুতি করিয়া, কুতবুদ্দিন নামক রাজপুরুষকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার ও কুতবের মনে হইয়াছিল সওদা সহজেই সম্পন্ন হইবে, কিন্তু সের সেরূপ জঘন্য ধাতুর মানুষ ছিলেন না। তিনি ধর্ম্মপত্নীর বিক্রয়ে সম্মত হইতে পারিলেন না। তাদৃশ প্রস্তাবনা শ্রবণমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রধারণ পরিত্যাগ দ্বারা তিনি আর যে সম্রাটের কর্ম্মচারী নহেন এরূপ বিজ্ঞাপন করিলেন। পরে সুবাদার, সন্নিহিত প্রদেশে আসিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎকারে আহ্বান করিলে, তিনি পরিচ্ছদ মধ্যে একখানি ছুরিকা গোপনে লইয়া, তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইলেন; এবং লজ্জাকর প্রস্তাবের প্রথমাক্ষরেই সুবাদারের প্রাণ সংহার করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সুবাদারের অনুচরবর্গের হস্তে স্বয়ং নিধন প্রাপ্ত হইলেন। সুবাদার-হত্যা-অপরাধ-ছলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গৃহীত ও স্ত্রীরত্ন বন্দীদশায় দিল্লীতে প্রেরিত হইল। অবিলম্বে পাষণ্ড জাহাঙ্গীর সেই সীমন্তিনীর নিকট পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তেজস্বীয়সী বিধবা স্বামিহন্তার বাক্য-শ্রবণেও সম্মতা হইলেন না। সামান্য কামুকেরা এরূপ স্থলে বলপ্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু জাহাঙ্গীর তাহা করিলেন না। বিধবার অবজ্ঞাময়

ধাক্যে তাঁহার দীর্ঘকালের অনুরাগ পরিশুষ্ক হইয়া উঠিল, অবশেষে তিনি তাঁহাকে আপন জননীর অনুচারিণী-দিগের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

প্রায় চারি বৎসর গিয়াস-তনয়া অবরোধমধ্যে অনাদরে কালাতিপাত করিলেন। সেই দীর্ঘকালের মধ্যে অবসর-সময়ে তিনি চিত্র ও সূচিকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন এবং তদ্বিক্রয়োৎপন্ন হইতে অভিমত বস্তুসকল ক্রয় করিতেন। তিনি ঐ সমুদায় কারুকার্য্যে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। প্রথিত আছে তাঁহার শিল্পচাতুর্য্যের সুখ্যাতি অবশেষে জাহাঙ্গীরের কর্ণে উপস্থিত হইল। তাহাতে তাঁহার শুষ্ক অনুরাগ পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। তখন গিয়াসতনয়াও আর সাম্রাজ্যের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলেন তিনি অতিশয় শঠ ছিলেন, এবং কেবল আপনার গৌরব বৃদ্ধির জন্যই প্রথমতঃ সম্রাটের প্রস্তাবে কৃত্রিম উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। যাহা হউক, অতঃপর মহাসমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হইল এবং গিয়াস-তনয়া নুরজাহান অর্থাৎ ভুবন-জ্যোতিঃ এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। বিবাহের পর তিনি এত প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে কস্মিন্ কালেও কোন মহিষীর অদৃষ্টে তত ঘটে নাই। তাঁহার নাম পর্য্যন্ত টাকায় অঙ্কিত হইত। সম্রাটের উপরে তাঁহার প্রভাবের ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহার পিতা উজির, ভ্রাতারা অতি প্রধান প্রধান কর্ম্মসচিব হইয়া উঠিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের ক্রূর ও কামচারী স্বভাব সংযত করিলেন; তাহার ঐকান্তিক সুরাস্পৃহা, রাত্রিতে ও অপ্রকাশ্য স্থানে ভিন্ন অন্যত্র বা অন্য সময়ে, চরিতার্থ করাও বন্ধ করিলেন। তিনি রাজসভার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও

ব্যয়ের লাঘব করিয়া উঠিলেন। ফলতঃ প্রথম কয়েক বৎসর তাঁহার প্রভাব হইতে অমিশ্র শুভ ফলই উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার পিতা অতি উৎকৃষ্ট ও ধর্ম্মভীরু মন্ত্রী হইয়া উঠিলেন। এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র পিতৃপদের সহিত, পিতার অধিকাংশ সদ্গুণও উত্তরাধিকার করিয়াছিলেন। প্রথিত আছে নুরজাহানই গোলাপী আতরের সৃষ্টি করেন।

বিবাহের পর বৎসর (১৬১২) দাক্ষিণাত্যের বশীকরণ জন্য মহা-আড়ম্বরে উদ্যোগ হইতে লাগিল। সম্রাট সঙ্কল্প করিলেন, গুজরাট ও বিরার প্রদেশস্থিত সেনারা যুগপৎ যাইয়া দুই দিক হইতে একবারে মালিক অম্বরকে আক্রমণ করিবে। কিন্তু কার্য্যকালে গুজরাটের সেনারা অগ্রে উপস্থিত হইল। তখন মালিক অম্বর রণজম্বুকতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগকে এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিলেন যে, অবশেষে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। তদনন্তর বিরারের সেনারা যাইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু মালিক অম্বরের যোধদিগকে জয়োৎফুল্ল দেখিয়া ত্রস্ত ও বিনা সংগ্রামেই নিষ্ক্রান্ত হইল (১৬১২)।

দাক্ষিণাত্যের অপেক্ষা উদয়পুরে সম্রাটের ভাগ্য অধিক প্রসন্ন হইয়াছিল। তথায় তাঁহার প্রিয়পুত্র খরম সেনানীত্বে নিযুক্ত ছিলেন। খরম রাণার বশীকরণ সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন এবং মহানুভব-আকবর-প্রদর্শিত সুপদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক, রাণা বশ্যতা স্বীকার করিবামাত্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া প্রচুর সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, ইতিপূর্ব্বে মোগলেরা তাঁহার যে ভূসম্পত্তি জয় করিয়াছিল, তত্তাবৎ প্রত্যর্পণ করিলেন।

রাণার পুত্র সাম্রাজ্যের প্রধান আমিরদিগের শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন। ঈদৃশ বিচক্ষণ আচরণে খরমের অত্যন্ত যশোবৃদ্ধি হইল। তিনি নুরজাহানের ভ্রাতা আজফ খাঁর দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য নুরজাহান নিয়তই তাঁহার উত্তর-সাধকতা করিতেন। এপর্য্যন্ত কুমার খসরু কারারুদ্ধই ছিলেন। কেবল কুমার পার্বিজ পাছে কোনরূপে সম্রাটের অধিক প্রিয় হইয়া উঠেন খরমের এই মাত্র আশঙ্কা ছিল। অবশেষে তাহাও দূরীভূত হইল। সম্রাট খরমকে সাজাহান অর্থাৎ ভুবনাধিপতি এই উপাধি প্রদান করিলেন। তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল, যে সম্রাটের বাসনা এই, তিনিই উত্তর কালে সিংহাসনের অধিকারী হন।

অতঃপর সাজাহান দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইলেন। দৈবও তাঁহার প্রতি অনুকূল হইল। অধুনা গৃহবিচ্ছেদ নিবন্ধন আম্বর আপনার কর্ম্মচারী ও সহকারিবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। সাজাহানের আগমনে তিনি অগত্যা বশীভূত হইলেন এবং আমেদনগর ও অন্যান্য স্থান মোগলদিগকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সাজাহান আর্য্যাবর্ত্তে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরবর্ত্তী চারি বৎসর দাক্ষিণাত্যে কোন বিশেষ বিগ্রহ ঘটে নাই; তদবসানে আম্বর আবার অস্ত্রধারণ ও প্রায় সমুদায় রাজ্য প্রতিগ্রহণ করিলেন। তখন জাহাঙ্গীর সাজাহানকে পুনর্ব্বার দাক্ষিণাত্যে গমনে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু সেই যুবরাজ খসরুকে সমভিব্যাহারে না লইয়া একপদও গমন করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। কি জন্য যে তিনি এরূপ নির্ব্বন্ধ করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। অবশেষে সম্রাট তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

তিনিও তদীয় আজ্ঞা পালনে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দাক্ষিণাত্যে পঁহুছিয়া সাজাহান, আপনার স্বভাবসিদ্ধ বীর্য্য ও দক্ষতা প্রকাশ দ্বারা, আম্বরকে সংগ্রামে পরাভব এবং তাঁহার সহিত আপনার প্রস্তাবিত পণে সন্ধি স্থাপন করিলেন। ইত্যবসরে সম্রাটের প্রাক্‌লক্ষিত শ্বাসরোগের একদা এমনি বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ উপস্থিত হয়। তৎশ্রবণে, রাজাসন উত্তরাধিকার করণ মানসে কুমার পার্বিজ রাজধানীতে উপস্থিত হন। কিন্তু তিরস্কৃত হইয়া আপন সুবায় প্রেরিত হইলেন। এদিকে ঠিক এই সময়েই, খসরু অকস্মাৎ লোকান্তর গমন করেন। শাস্ত্রকারেরা ভ্রাতাদিগকে সহজ শত্রু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এ কথা মুসলমান রাজকুমারদের প্রতি যেরূপ প্রযুক্ত হয় তেমন আর কোন ভ্রাতৃবর্গের প্রতি হয় না। মুসলমানদিগের পুরাবৃত্ত, ভ্রাতাদিগের পরস্পর নিষ্ঠুরতায় যেরূপ কলঙ্কিত, সেরূপ আর কোন জাতির পুরাবৃত্তই নহে। মুসলমান রাজকুমারেরা নিয়তই পরস্পরের অনিষ্ট কামনা করে। তাহাদের একের মৃত্যুতে অন্যের লাভ; এজন্য সম্রাটের তদানীন্তন মুমূর্ষু সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বি-হস্তে সমর্পিত খসরুর আকস্মিক মৃত্যুতে সাজাহানের উপরই তাবৎ বিরুদ্ধ সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে বিবেচনা করিলে সাজাহানের চরিত্রে অন্য কোন রূপ কলঙ্ক দেখা যায় না। অতএব তিনি যে একবারেই এরূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিবেন তাহাও সম্পূর্ণ সম্ভব বোধ হয় না।

খসরুর মৃত্যুর অনতিবিলম্বে নুরজাহান সাজাহানের প্রতি বাম হইয়া উঠিলেন। সের আফগানের ঔরসে নুরজাহানের এক কন্যা ছিল। অধুনা জাহাঙ্গীরের চতুর্থ

পুত্র কুমার সেহেরিয়ারের সহিত তাহার বিবাহ হইল, অমনি নুরজাহান, ভ্রাতৃজামাতার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আপন জামাতার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তিনি আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে দক্ষ ও উজ্জ্বল সাজাহান রাজক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার উপর প্রভুতা চলিবে না। অতএব নুরজাহান উত্তরাধিকারীর পরিবর্ত্তন সম্পাদনের জন্য একান্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় তদীয় পরামর্শ ও শাসনে কিঞ্চিৎ সংযত ছিলেন। সম্প্রতি পিতা পরলোক গমন করায় ভ্রাতা আজফ তদীয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। নুরজাহান যাহা বলিতেন আজফ তাহাই শিরোধার্য্য করিতেন।

আপন অভিপ্রায় সাধনের জন্য নুরজাহান কোনরূপে সাজাহানকে সম্রাট-সন্নিধান হইতে অন্তরে রাখিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পারসীকেরা কাণ্ডাহার পরাজয় করিয়াছে সম্বাদ আসিল। ঐ সম্বাদ নুরজাহানের পক্ষে বিলক্ষণ অভীষ্টসাধক হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রবর্ত্তনায় দক্ষ সাজাহানকেই কাণ্ডাহারের পুনরুদ্ধার সম্পাদনে প্রেরণ করা সাব্যস্ত হইল। সাজাহানও স্বীকৃত হইলেন কিন্তু মান্দুনগর পর্য্যন্ত যাইয়া, নুরজাহান ও তৎপক্ষীয়দিগের দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং নানা ছলে গমন স্থগিত করিলেন। নুরজাহান, সাজাহানের সেই গমন স্থগিতের কোন অসদভিসন্ধি আছে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সেই কুমারের উপর সম্রাটের ক্রোধ জন্মাইয়া দিলেন। অনন্তর কুমার সেহেরিয়ারের প্রতি কাণ্ডাহার উদ্ধার করিবার ভার সমর্পিত হইল। আর, সাজাহানের উপরে আদেশ গেল যে তিনি নিজ সমভিব্যাহারী সেনার অধিকাংশ ভ্রাতার নিকট

প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সেহেরিয়ারের অধীনে আসিতে আদিষ্ট হইলেন। নুরজাহান পূর্ব্বাবধিই জানিতেন সাজাহান সহজে রাজ্যলালসা পরিত্যাগ করিবেন না, সুতরাং গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে; সেজন্য এক জন সুদক্ষ সেনানীকে নিকটে রাখিবার মানসে নুরজাহান মহাবৎ খাঁ নামা রণপণ্ডিতকে, সুবা হইতে সভায় আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার প্রতি যথেষ্ট মৌখিক সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যাপারের সময়ে জাহাঙ্গীর গ্রীষ্মকালীন কাশ্মীর-যাত্রা হইতে পরাবৃত্ত হইয়া লাহোরে আসিয়া সভা স্থাপন করিলেন (১৬২২)। দূতদ্বারা পিতা পুত্রে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল, কিন্তু পুনর্মিলনের কোন প্রত্যাশা না পাওয়ায়, অবশেষে সাজাহান দিল্লীর অভিমুখে সসৈন্য ধাবমান হইলেন। সম্রাট্ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পিতৃসৈন্যের কিয়দংশের সহিত সাজাহানের সংগ্রাম হইল: অনন্তর সেই কুমার মালবে পঁহুছিলেন, তথায় তাঁহার সেনা-নায়কেরা অনেকে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন মালব হইতে সাজাহানকে দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিতে হইল। সেখানেও তাঁহার সৈনিকেরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার পক্ষ হইতে স্খলিত হইতে লাগিল। সাজাহান তৈলঙ্গে পঁহুছিয়া, তথা হইতে মছলীবন্দর দিয়া যাইয়া বাঙ্গালায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং সেই প্রদেশ ও বিহার অধিকার করিয়া আলাহাবাদ জয়ের জন্য সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে সাজাহানের অনুসরণে প্রেরিত কুমার পার্ব্বিজ ও মহাবৎখাঁ আসিয়া আলাহাবাদের রক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। সাজাহান তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য

গঙ্গার পরপারে গমন করিলেন। কিন্তু তত্রত্য অধি-বাসীরা সম্রাটের পক্ষ ছিল, তাহারা তাঁহার কোনরূপ আনুকূল্য করিল না। সাজাহান সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রতিগমন করিলেন। তথায় মালিক আম্বর তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং উভয়ে একযোগে বুরানপুর বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পার্বিজ ও মহাবৎ খাঁ যাইয়া নর্ম্মদাতটে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সাজাহানের সৈনিকেরা প্রায় সকলেই তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। অবশেষে তিনি নিতান্ত নিরাশ হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্ত পিতা পুত্রে কোনরূপ বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে রাজসভায় দারুণ বিভ্রাট উপ-স্থিত হইল।

আকবরের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত রৌসিনিয়ারা দিল্লীর সম্রাটের বশীভূত হয় নাই। তাহাদের সহিত বিগ্রহ চলিতেছিল। ১৬২৫ খৃঃ অব্দে তাহাদিগকে বশীভূত করি-বার মানসে জাহাঙ্গীর কাবুলে যাত্রা করিলেন। তথায় নুরজাহানের ষড়যন্ত্রে এইরূপ অভিযোগ হইল যে বঙ্গ-দেশে অবস্থিতি সময়ে মহাবৎ খাঁ প্রজাপীড়ন ও তহবিল ভঙ্গ করিয়াছিল। সম্রাট্ তজ্জন্য সেই সেনানীকে সভায় তলব করিলেন। মহাবতের বিক্রম ও সৌভাগ্য-হেতু নুরজাহান সতত তাঁহার দারুন বিদ্বেষ করিতেন, কিন্তু তাঁহার বাহুবল ও রণপাণ্ডিত্য ভিন্ন সাজাহানকে দমন করা অসাধ্য জানিয়া, এ পর্য্যন্ত তাঁহার অনিষ্ট-চেষ্টায় ক্ষান্ত ছিলেন। এক্ষণে সে অভিলাষ পূর্ণপ্রায় হইলে, তিনি মহাবতের সর্ব্বনাশ সাধন সঙ্কল্প করিলেন। মহাবৎ নানা ছলে তলব মথুব করাইবার প্রয়াসে বিফল হইয়া, অবশেষে

পঞ্চসহস্র একান্ত অনুগত রজঃপূতের সহিত সম্রাট্-শিবি-রের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন। তথায় শুনিলেন, সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে না। তখন যে তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনের দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। তিনিও যতদূর পারেন, বলদ্বারা আত্মরক্ষা-সম্পাদনে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

তৎকালে (১৬২৬) সম্রাট বিপাশানদীর বামতটে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাদিগের পারের জন্য নৌসেতু সংঘটিত হইয়াছিল। তাহারা ক্রমে ক্রমে অপর পারে উপস্থিত হইল। এপারে সম্রাটের সঙ্গে কেবল পরিচারক ও শরীররক্ষী সৈনিকেরা অবশিষ্ট রহিল। এমন সময়ে মহাবৎ ২,০০০ রজঃপূত প্রেরণ করিয়া সেতু অধিকার, এবং স্বয়ং অবশিষ্টদিগকে লইয়া সম্রাটের শিবির বেষ্টন করিলেন। পরে তিনি, ২০০ যোদ্ধার সহিত, ধাবমান হইয়া শরীররক্ষীদিগকে অভি-ভব করিয়া, সম্রাটের পট্টাবাসে প্রবিষ্ট হইলেন। সম্রাট নিদ্রিত ছিলেন; জাগরিত ও চমকিত হইয়া, তরবারি গ্রহণ করিলেন। পরে মহাবৎকে দেখিয়া ক্রোধবি-স্ফুরিতাধরে ঈদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাবৎ প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, প্রকারান্তরে সাক্ষাৎকার লাভের অসদ্ভাব হেতুই অগত্যা এইরূপ করিতে হইয়াছে। জাহাঙ্গীর বাহিরে ক্রোধ সম্বরণ করিলেন। তখন মহাবৎ বলিলেন "আপনি যে সময়ে প্রকাশ্য হইয়া সকলকে দর্শন দেন, সেই সময় উপস্থিত। অতএব অশ্বা-রোহণ করিয়া বাহিরে আগমন করুন।" সম্রাট্ নুর-জাহানের সহিত পরামর্শ করণ মানসে, পরিচ্ছদ পরি-বর্ত্তনচ্ছলে, অন্তঃপুরে যাইতে চাহিলেন। মহাবৎ তাঁহার

অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অন্তঃপুরে যাইতে দিলেন না। অগত্যা যেখানে ছিলেন সেই খানেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন সম্পন্ন করিয়া, সম্রাট্ অশ্বপৃষ্ঠে বহির্গত হইলেন। মহা-বৎ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য অশ্ব হইতে নামাইয়া এক করি-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই অস্ত্রপাণি রজঃপুতকে বসাইয়া তদবস্থায় তাঁহাকে নিজের শিবিরে আনয়ন করিলেন।

এই বিপৎপাতে নুরজাহানের উৎপন্নমতিত্ব অন্তর্হিত হয় নাই। সম্রাটের নিকট যাওয়া অসাধ্য দেখিয়া, তিনি ছদ্মবেশে এক অতি হীন যানে আরোহণ করিয়া, সেতু সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মহাবতের আজ্ঞা ছিল, যে কেহ এপার হইতে যাইতে চাহিবে, সে সচ্ছন্দে যাইতে অনুমত হইবে, কিন্তু ওপার হইতে প্রাণিমাত্রও আসিতে পারিবে না। এজন্য নুরজাহান নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া স্কন্ধাবারে পঁহুছিলেন। তথায় যাইয়া, সম্রাটের কারাব-রোধ মোচনের তখনও কোন চেষ্টা হয় নাই দেখিয়া, আপনার ভ্রাতা ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারিদিগকে তির-স্কার করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল তিরস্কার করি-য়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, সম্রাটের মোচন জন্য স্বয়ং নানাবিধ উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন।

পর দিন প্রাতে সমস্ত উদ্যোগ সম্পন্ন হইলে, নুর-জাহান সৈন্য চালিত করিলেন। তিনি স্বয়ং সেনানীত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ধনু ও শরপূর্ণ দুই তূণের সহিত, এক অতুচ্চ মাতঙ্গপৃষ্ঠে, পরিস্তোমের * অভ্যন্তরে, আসীন হইলেন। ক্রোড়ে আপনার অল্পবয়স্কা দৌহিত্রী শয়িতা রহিল।

---

* হাতীর হাওদা।

এ দিকে মহাবৎ নৌসেতু ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। অগত্যা নুরজাহান নদীর যে ভাগে অপেক্ষাকৃত অল্প জল তথায় পার হইবার চেষ্টা পাইলেন। তাহাতে তাঁহার সৈনিকদিগকে স্থানে স্থানে সাঁতার জলেও পড়িতে হইল। তাহাদের বারুদ ভিজিয়া গেল এবং বস্ত্রাদি তাবৎ আর্দ্র হওয়ায়, তাহারা পরপারে যাইয়া তত্রত্য রজঃপুতদিগের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইল। রজঃপুতেরা ক্ষিপ্রহস্তে গোলা তীর ও খর্পা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নুরজাহানের হস্তীই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার পরিস্তোমের চতুঃপার্শ্বে রাশি রাশি শর ও গোলা বৃষ্টি হইতে লাগিল, তন্মধ্যে একটা শর আসিয়া তাঁহার দৌহিত্রীকে আহত করিল। পরে তাঁহার হস্তি-পক নিহত হইল এবং হস্তী শুণ্ডে আহত হইয়া, গভীর জলে প্রবেশ করিল। হস্তী, বারম্বার নিমজ্জনের পর অপর পারে উপস্থিত হইলে, নুরজাহানের পরিচারিণীরা আসিয়া দেখিল, তিনি দৌহিত্রীর ক্ষত হইতে শর উত্তোলন করিতেছেন।

অতঃপর বলে স্বামীর উদ্ধার চেষ্টায় বিফল হইয়া নুরজাহান তাঁহার কারাভাগিনী হইবার মানস করি-লেন। এদিকে বিপাশাতটে জয়লাভ করিয়া মহাবৎ, ক্রমে ধাবমান হইয়া, আটক নগরে উপস্থিত হইলেন এবং আজফ খাঁ ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে বন্দী করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভুতা এপর্য্যন্তও বদ্ধমুল হয় নাই। তাঁহার সৈনিকেরা সকলেই রজঃপুত, সুতরাং সম্রাটের মুসলমান সৈনিকদিগের দারুণ বিদ্বেষের আস্পদ ছিল। সম্রাটও নুরজাহানের পরামর্শানুসারে কপট ব্যবহার দ্বারা মহাবৎকে সতর্কতা-পরিশূন্য করিতে

আরম্ভ করিলেন। তিনি, আচফ খাঁ ও নুরজাহানেরও মৌখিক নিন্দাদ্বারা ক্রমে ক্রমে মহাবতের এমনি বিশ্বাস-ভাজন হইয়া উঠিলেন যে, খাঁর আর সম্রাটের প্রসন্নতা বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। এদিকে নুর-জাহানও বিলক্ষণ ধূর্ত্তের খেলা খেলিতে ছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে দুই এক জন করিয়া আপনার অতি বিশ্বস্ত যোধগণ দ্বারা সম্রাটকে পরিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। সেই সকলের সহিত বিবাদে একদা মহাবতের রজঃপুতেরা অনেকে নিধন প্রাপ্ত হইল। তৎপরে, জায়গির-দারেরা যে সকল ভূমি ভোগ করে, তাহারা সম্রাটকার্য্যে নিয়োগ জন্য যথার্থই ভূমির উপস্বত্বের উপযুক্ত-সংখ্যক সেনা রাখিয়াছে কি না, নুরজাহান জাহাঙ্গীরকে তাহার অনুসন্ধান করিবার পরামর্শ দিলেন। অপরাপর জায়গিরদারের বিষয় তদারক হইল। নুরজাহানের নামেও অনেক জায়গির ছিল। তাঁহার তদুপযুক্ত সৈন্য আছে কি না জাহাঙ্গীর তাহারও তদারক করিতে চাহি-লেন। নুরজাহান, সামান্য জনদিগের সহিত সমান ব্যবহার জন্য প্রথমতঃ ক্রোধের ভান করিলেন। অব-শেষে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার সৈন্যের পর্য্যবেক্ষণ হউক। সেই সৈন্যের পর্য্যবেক্ষণে গমন কালে মহাবৎ জাহাঙ্গীরের সমভিব্যাহারে যাইতে উদ্যত হইলেন সম্রাট তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন উহারা সকলেই নুরজাহানের অনুগত, নুরজাহান তাঁহার দারুণ বিদ্বেষী, অতএব তাঁহার জীবনের অনিষ্ট চেষ্টা করিলেও করিতে পারে। এইরূপে কপট-বচনে মহাবৎকে নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং গমন করিলেন। এ দিকে নুরজাহান যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্রাট তাহাদের মধ্যগত

হইবামাত্র অমনি তাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া লইল। এইরূপে সম্রাট মহাবতের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলেন। কিন্তু এখনও আজফ খাঁ তাঁহার হস্তগত থাকায় নুরজাহানকে অগত্যা তাঁহার সহিত নিয়ম স্থাপন করিতে হইল। যাহা হউক, তথনও তিনি এক কন্টক দ্বারা অন্য কন্টকের নিপাত সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সাজাহানের নিরাশ সম্পাদনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এজন্য এই পণে মহাবতের সহিত সন্ধি করিলেন, যে তিনি সেই যুবরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন। তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা হইবে।

এদিকে সাজাহান দাক্ষিণাত্য হইতে, এক সহস্র মাত্র অনুচরের সহিত, আজমীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার এক প্রধান সহকারীর মৃত্যু হইল, অনুচরবর্গেরও অর্দ্ধভাগ তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। সাজাহান অবশিষ্টদিগের সহিত অগত্যা সিন্ধুদেশে পলায়ন করিলেন। তদানীং তিনি এমনি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিলেন যে শরীর সুস্থ থাকিলে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারস্যে যাইয়া আশ্রয় যাচ্ঞা করিতেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার দুর্দ্দশা-তামসীর প্রভাত হইয়া উঠিল। সম্বাদ আসিল কুমার পার্বিজ গতাসু হইয়াছেন, আর সম্রাটের সেনাদিগের সহিত অভিনব বিসম্বাদ নিবন্ধন মহাবৎ তাঁহার বিরুদ্ধে না আসিয়া তাঁহার সহিত মিলনের জন্যই ধাবমান হইতেছেন। এতাবৎ শ্রবণে সাজাহান দাক্ষিনাত্যে প্রস্থান করিলেন। তথায় মহাবৎ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে, মহাবতের হস্ত হইতে উদ্ধার হওয়ার অল্প কাল পরেই সম্রাট কাশ্মীরে যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায়

তাঁহার শ্বাসরোগের দারুণ বৃদ্ধি হইল। শীত-প্রধান স্থান তাদৃশ ব্যাধিগ্রস্তদিগের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর, এজন্য সম্রাট কাশ্মীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক লাহোরের অভিমুখে পরাবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ভ্রমণ সমাপ্তির পূর্ব্বেই পথিমধ্যে তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া উঠিল (১৬২৭)।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬১৬) ইংলণ্ডের তদানীন্তন অধিপতি প্রথম জেম্‌সের এক দূত ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। তাঁহার লিখন হইতে, মোগল সম্রাটদিগের মহতী সমৃদ্ধির বিবরণ এবং তৎকালে ভারতবর্ষে বিবিধ শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট অনুশীলনের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথিত আছে জাহাঙ্গীরের সময়েই এদেশে তামাকের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

বিংশ অধ্যায়।

সাজাহান।

জাহাঙ্গীরের পরলোক গমন করার সঙ্গেই নুরজাহানের প্রভাব তিরোভূত হইল। তিনি সেহেরিয়ারকে রাজাসনে বসাইবার চেষ্টা পাওয়ায়, আজফর্খা তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন এবং দাক্ষিণাত্য হইতে নিজ জামাতা সাজাহানকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে অভিষিক্ত ও সিংহাসনে আসীন হইলেন। পরে নুরজাহানের কারামোচন ও তাঁহার ব্যয়ার্থ ২৫,০০,০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। অতঃপর নুরজাহান বিংশতি বৎসর জীবিত ছিলেন কিন্তু তত্তাবৎকালের মধ্যে একবারও রাজকার্য্যের ক্ষুদ্রাংশে হস্তক্ষেপ করেন নাই। পিতৃবিয়োগ সময়ে সেহেরিয়ার লাহোরে অবস্থিতি করি-

ত্তেছিলেন। তথায় তিনি আপন ক্ষমতা স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু আজফ যাইয়া তাঁহার পরাভব এবং তদনন্তর সাজাহান তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন।

এইরূপে নিষ্কণ্টক হইয়া সাজাহান, আজফ খাঁ ও মহাবত্তের প্রচুর সম্মানবৃদ্ধি এবং অন্যান্য সুহৃদ ও অনুচর বর্গকে নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিলেন। পরে বহুল সুদৃশ্য সৌধের নির্ম্মাণ ও বহ্বাড়ম্বরে মহোৎসব পরম্পরার দ্বারা চিত্তের বিনোদন করিতে লাগিলেন। তিনি যে দিবস সিংহাসনে আরোহণ করেন, পর বৎসর সেই দিবস উপস্থিত হইলে, তদুপলক্ষে অতি মহত্তা ঘটায় মহোৎসব হইয়াছিল। প্রথিত আছে মহোৎসব সম্পাদনের জন্য এমন এক প্রকাণ্ড পট্টাবাস প্রস্তুত হইয়াছিল যে তাহার সন্নিবেশনেই দুই মাস অতীত হয়। সেই পট্টাবাসে সাজাহান, পিতৃপিতামহের ব্যবহার অনুসারে রজত কাঞ্চন প্রভৃতি দ্বারা তুলা সম্পাদন ভিন্ন, মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতির বহুসংখ্য পূর্ণপাত্র অঙ্গে বর্ষণ করেন। পরে তত্তাবৎ সম্পত্তি দর্শকদিগকে বিতরণ করিয়া দেন। সেই উৎসবে সর্ব্ব সমেত সার্দ্ধ কোটি মুদ্রার বিসর্জ্জন হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যেই সম্রাট সাজাহানের শস্ত্র প্রথমতঃ প্রযুক্ত হয়। সেই ভূভাগে খাঁজাহান নামে এক জন পাঠান ক্রমশঃ উচ্চতর পদে আরূঢ় হইয়া, অবশেষে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু সময়ে, দিল্লীশ্বরের অধিকৃত দাক্ষিণাত্যের প্রধান সেনানীত্বে নিযুক্ত হন। তদনন্তর স্বাধীন হইবার প্রয়াসে, জাহাঙ্গীর আমেদনগরপতির যে সমস্ত জনপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তত্তাবত্তের প্রত্যর্পণ দ্বারা, তিনি সেই অধিপতিকেই স্বপক্ষ করেন। কিন্তু আপনার অভিলষিত

সাধনের শুভ কালের কিঞ্চিৎ অপেক্ষা আছে ভাবিয়া সাজাহান সিংহাসনে দৃঢ়াসীন হইলে পর খাঁজাহান তদানীং বশ্যতা স্বীকরণ পূর্ব্বক, সম্রাটের আদেশানুসারে আগরায় উপস্থিত হন; কিন্তু তথায় অবগত হইলেন সম্রাট তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। তচ্ছ্রবণে অবিলম্বে ১,০০০ পাঠানের সহিত প্রকাশ্যরূপে আগরা পরিত্যাগ করিলেন। সম্রাটসেনা তাঁহার অনুসরণে প্রেরিত হইল, কিন্তু খাঁজাহান সংগ্রামে প্রচুর বীরতা প্রকাশদ্বারা তাহাদিগকে ত্রস্ত করিয়া, গোন্দোয়ানায় গমন সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন। পরে তথা হইতে আমেদনগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দমনার্থ সাজাহান স্বয়ং সমরে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রেরিত এক জন সেনানী আমেদনগর-পতিকে পরাভব করায় খাঁজাহানকে অগত্যা দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি নানা স্থানে তাড়িত হইয়া অবশেষে বুন্দেলখণ্ডে উপস্থিত হইলেন; তথায় মহা সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহার ছিন্নমুণ্ড সম্রাট-সন্নিধানে প্রেরিত হইল।

খাঁজাহানের জীবনের সহিত দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধানল নির্ব্বাপিত হইল। একে সমরের দারুণ নিগ্রহ, তাহাতে আবার দুই বৎসরের অবগ্রহে বিষম দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল; সুতরাং সেই হতভাগ্য ভূভাগবাসীদিগের ক্লেশের ইয়ত্তা রহিল না। অবশেষে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম ও বারম্বার লুঠপাঠ প্রভৃতির পর, ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে সম্রাটের বাহুবল প্রবল হইয়া উঠিল। বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার রাজারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আমেদনগরের রাজকুল একেবারে নির্ম্মূল হইল।

সাজাহানের রাজত্বের পরবর্ত্তী ষোড়শ বর্ষ, কাবুল ও তৎসন্নিকর্ষে, যুদ্ধ-কার্য্যে অতিবাহিত হয়। ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে, কাণ্ডাহারের শাসনকর্ত্তা আলিমর্দ্দান খাঁ আপনার নিয়োগ্য পারসীক-রাজের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার মানসে, সাজাহানের হস্তে নগর-সমর্পণ-পূর্ব্বক স্বয়ং দিল্লীতে আসিয়া বসতি করেন। তিনি অতিশয় যোগ্য পুরুষ ছিলেন, সম্রাট বহু সম্মানপুরঃসর তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পরে তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে কাশ্মীর ও কাবুলের শাসনকর্ত্তৃত্বে ও অন্যান্য অনেক রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। আলিমর্দ্দান জনসাধারণের উপকার জন্য বহুল কীর্ত্তিকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তত্তাবতের মধ্যে তাঁহার স্বনাম-খ্যাত দিল্লীর কৃত্রিম সরিৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়।

১৬৪৪ খৃঃ অব্দে সাজাহান, কিঞ্চিৎ শুভযোগ দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া, উজবেগদিগের হস্ত হইতে বাহ্লিক রাজ্য জয়ের জন্য আলিমর্দ্দান খাঁকে তদ্দেশে সসৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিছুই সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বে সেই হিমপ্রধান দেশে শীতাগম-নিবন্ধন, আলিমর্দ্দানকে নিষ্ফল হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। পর বৎসর এক জন রজঃপূত সামন্ত, স্বজাতীয় চতুর্দ্দশ সহস্র ও অন্যান্য সেনার সহিত, বাহ্লিকে প্রেরিত হইলেন। রজঃপূতেরা উষ্ণদেশবাসী, তথাপি অক্ষুব্ধচিত্তে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের তুহিন ও ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া বার বার উজবেগদিগের সম্প্রহার নিরাকরণ করিল, তথাপি দেশাধিকারের কোন সুবিধাই দৃষ্ট হইল না। অতঃপর (১৬৪৫) সম্রাট স্বয়ং কাবুলে উপস্থিত হইলেন, এবং তথা হইতে কনিষ্ঠ পুত্র কুমার মোরাদ ও আলিমর্দ্দানকে বাহ্লিকে প্রেরণ করি-

লেন। এবারের অভিনির্যাণ সর্ব্বথা সফল হইল, সমুদায় বাহ্লিক, সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু পর বৎসর সম্রাট দিল্লীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, অল্পকাল মধ্যেই কুমার মোরাদও অনুমতি বিনা তথায় আসিয়া পঁহুছিলেন। সেই সুযোগে উজবেগেরা বাহ্লিক পুনরধিকার করিল। সম্রাট মোরাদের অবমাননা করিলেন, এবং তৃতীয় পুত্র আরাঙ্জিবকে বাহ্লিকের সেনানীত্বে নিয়োগ করিয়া স্বয়ং আবার কাবুলে গমন করিলেন। আরাঙ্জিব উজবেগদিগের বিরুদ্ধে যাইয়া প্রথমতঃ সুবিধা পাইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে শত্রুর সম্প্রহারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য, বাহ্লিক নগরের প্রাকারমধ্যে নিরুদ্ধ থাকিলেন। তখন সম্রাটের হৃদয়ঙ্গম হইল যে বাহ্লিক রাজ্যের পরাজয়-চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল, তদনুসারে তিনি আপনার শরণাগত এক জন উজবেগ রাজাকে তদ্দেশ সমর্পণ করিয়া, আরাঙ্জিবকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার আজ্ঞা দিলেন। আরাঙ্জিবের প্রত্যাগমন সময়ে, হিমর্ত্তুর আবির্ভাব নিবন্ধন, তাঁহার সেনারা দুরন্ত শীত ও বরফে একান্ত পীড়িত এবং সন্নিহিত পার্ব্বতীয়দিগের আক্রমণে জর্জ্জরীভূত হইল। অবশেষে, আপনাদের সম্ভার ও সমস্ত অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পদব্রজে পলায়ন করিয়া, কোন রূপে নিস্তার পাইল।

পারসীকেরা আলিমর্দ্দানের সমর্পণ হইতে, এপর্য্যন্ত (১৬৪৮) কাণ্ডাহার পুনরধিকারের কোন চেষ্টা করে নাই। অতঃপর পারসাপতি ঐ নগর উদ্ধার সাধনের উদ্যোগ করিলেন। শীতকালে ভারতবর্ষ ও কাণ্ডাহারের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগের কিয়দংশ বরফে এরূপ রুদ্ধ হয় যে, ভারতবর্ষ হইতে ঐ নগরে গমন অতীব দুষ্কর হইয়া উঠে।

পারসীকেরা ঐ সময়ই কাণ্ডাহার আক্রমণের শুভকাল জ্ঞান করিয়া তদভিমুখে আসিতে লাগিল। এ দিকে আরাঞ্জিব নগরীর রক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন; কিন্তু তিনি তৎকালীন দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পারসীকদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছিল। আরাঞ্জিব যাইয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করিবার যত্নে বিফল হইয়া অগত্যা কাবুলে পরাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ১৬৫২ খৃঃ অব্দে আরাঞ্জিব. পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সৈন্যের সহিত, কাণ্ডাহারের উদ্ধার সম্পাদন উদ্দেশে পুনঃ প্রেরিত হন। কিন্তু সেবারেও নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আইসেন। তখন সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা, আপনি প্রার্থনা করিয়া, কাণ্ডাহারের পুনরধিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি অনেক সৈন্য লইয়া কাণ্ডাহারের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং নগরীর নিরোধনে প্রচুর সাহসিকতা ও কৌশলও প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তথাপি পারসীকদিগকে দূরীভূত করিতে পারিলেন না। তদবধি (১৬৫৩) ভারতবর্ষীয় সম্রাটেরা কাণ্ডাহার পুনরধিকার করিবার চেষ্টায় ক্ষান্ত হন।

অতঃপর দুই বৎসর মোগল সাম্রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করে। ইতিপূর্ব্বের বিংশতি বৎসর অবধি দাক্ষিণাত্যের জরিফ হইতেছিল, অধুনা তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠিল। আকবরের রাজত্ব কালে, রাজা তোড়লমল্ল আর্য্যাবর্ত্তের রাজস্ব বিষয়ে যে প্রণালী উদ্ভাবিত করেন এক্ষণে দাক্ষিণাত্যেও তাহাই প্রচলিত হইল। এই শান্তিসময়ের মধ্যে সম্রাটের উজির সায়দুল্লা খাঁ পরলোক গমন করেন। ভারতবর্ষের যাবতীয় মুসলমান রাজপুরুষের মধ্যে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন।

শান্তিকালের পর আরাঞ্জিব দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হই-

লেন। তখন গোলকুণ্ডাপতির উজির মিরজুম্‌লা, স্বীয় প্রভুর সহিত বিরোধ করিয়া, সম্রাটের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। আরাঙ্গিবের অনুরোধে সেই প্রার্থনা সফল হইল। সাজাহান জুমলার পক্ষ হইয়া, গোলকুণ্ডা-পতিকে গর্ব্বিতাক্ষরে পত্র লিখিলেন। গোলকুণ্ডাপতি সেই পত্রের মর্ম্মানুরূপ কার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন। তখন তাঁহার উপর বল-প্রয়োগের জন্য আরাঙ্গিবের প্রতি আদেশ হইল। বলবিকাশের অপেক্ষা আরাঙ্গিব স্বভাবতঃ ধূর্ত্ত-তাই অধিক ভাল বাসিতেন। তদনুসারে তিনি স্বীয় পুত্র মহম্মদের সহিত আপন ভ্রাতৃকন্যার বিবাহ উপস্থিত, এই ঘোষণা করিয়া দিলেন। সেই কন্যা বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আরাঙ্গিব, অনধিক অনুচরের সহিত সেই বিবাহোপলক্ষে, বাঙ্গালায় যাত্রা করার ভান করিলেন। তৎকালে তিনি ঔরঙ্গাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তথা হইতে বাঙ্গালা যাইবার পথ মছলীবন্দর দিয়া প্রস্থিত। মছলীবন্দর গোলকুণ্ডা রাজ্যের রাজধানীর অনতিদূরবর্ত্তী। আরাঙ্গিব, কোনরূপ সমরসজ্জা প্রকাশ না করিয়া, মছলীবন্দরে উপস্থিত হইলেন। গোলকুণ্ডাপতি তাঁহার উপযুক্ত সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আরাঙ্গিব অকস্মাৎ তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। তাহাতে রাজা সম্যক্ ব্যতিব্যস্ত হইয়া, সন্নিহিত দুর্গে পলায়ন করিলেন। অনন্তর রাজধানী লুঠিত ও তাহার কিয়দংশ ভস্মীভূত হইল। আরাঙ্গিবের লুক্কায়িত সেনারাও আসিয়া যুটিল। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া রাজা সেই ধূর্ত্তের নিরূপিত অসঙ্গত পণেই সন্ধি গ্রহণ করিলেন (১৬৫৬) এই ব্যাপারের অচিরকাল মধ্যেই আরাঙ্গিব বিজয়পুর

রাজ্যও আক্রমণ করিবার ছল প্রাপ্ত হইলেন এবং তত্রত্য রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। যদি এই সময়ে আরাঞ্জিব, গুরুতর বিষয়ের অনুরোধে, অন্যত্র আহূত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি সেই রাজ্যও বশীভূত করিতেন সন্দেহ নাই।

দারা, সুজা, আরাঞ্জিব ও মোরাদ নামে সাজাহানের চারি পুত্র ছিল। দারা বহুল সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। তিনি সাহসী, উদার, অমায়িক ও বদান্য; কিন্তু স্বৈরী ও উদ্ধতও ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তিনি মহাত্মা আকবরের অনুকরণ করিতেন। সুজা সুবুদ্ধি, কিন্তু সুরা-সক্ত ও আমোদ-পরায়ণ। মোরাদ নির্ব্বোধ ও ব্যসনে একান্ত নিমগ্ন ছিলেন। আরাঞ্জিবের প্রকৃতি, প্রাগুক্ত কোন ভ্রাতারই সদৃশ ছিল না। তাঁহার অবয়ব সুদৃশ্য ও সৌম্য, স্বভাব প্রশান্ত, নির্ম্মম, সতর্ক ও সন্দিহান ছিল। তিনি বিলক্ষণ সাহসী, কিন্তু অতিশয় কপট ও ধূর্ত্ত ছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি তিনি একান্ত আস্থা প্রদর্শন করিতেন। এমন কি একদা সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মচিন্তনের জন্য ফকীরী অবলম্বনের একান্ত বাসনা প্রকাশ করেন। যাহা হউক, মুসলমান-ধর্ম্মে আস্থা প্রকাশ তাঁহার স্বার্থসাধনের পক্ষে বিশিষ্ট উপকারীই হইয়াছিল। আকবরের সময় হইতে, মুসলমান প্রজারা স্বধর্ম্মে সম্রাট্‌দিগের অনাস্থা দেখিয়া, দারুণ বিরক্ত হইয়া উঠে। এক্ষণে আরাঞ্জিবকে ঐকান্তিক মুসলমান জানিয়া তাহারা অধিকাংশই তাঁহার পক্ষ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ আরাঞ্জিব ধর্ম্ম বা সম্প্রীতি কিছুরই অনুরোধে আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করিতেন না।

সাজাহানের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি

জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার হস্তে অধিকাংশ রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরে কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু দশাগ্রস্ত হইলেন। দারা সম্রাটের তাদৃশ অবস্থা অপ্রকাশ রাখিবার বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদিগের নিকট কিছুই অবিদিত রহিল না। সুজা বঙ্গদেশের সুবাদার ছিলেন, তিনি অবিলম্বে রাজউপাধি গ্রহণ করিয়া সসৈন্য আগরার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। গুজরাট দেশে মোরাদও সুজার অনুষ্ঠিতের অনুকরণ করিলেন। ধূর্ত্ত আরাঙ্গিব দারার আজ্ঞা-পালনে অস্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু নিজের রাজ্যেশ্বর হইবার বাসনাও প্রচ্ছন্ন রাখিলেন। তিনি নির্ব্বোধ মোরাদকে আপনার দুরাকাঙ্ক্ষার সাধন করিবার মানস করিয়াছিলেন। এজন্য মোরাদ রাজউপাধি গ্রহণ করিলে, আরাঙ্গিব তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আরও লিখিয়া পাঠাইলেন যে "আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় যাইয়া ধর্ম্মচিন্তায় নিযুক্ত হইব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে নাস্তিক দারা ও তৎপ্রেরিত বিধর্ম্মী সেনানী রাজা যশোবন্ত সিংহের দমন সাধনার্থ যত দূর সাধ্য তোমার সহায়তা করিব। সেই কার্য্য সম্পাদনের পর, উভয়ে পিতৃ-সকাশে গমন পূর্ব্বক সম্রাটকে দারার প্রভাব হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিব, তদনন্তর যাহাতে পিতা সেই ভ্রান্তিপথাবলম্বী জ্যেষ্ঠের অপরাধ মার্জ্জনা করেন তদ্বিষয়েও অনুরোধের চেষ্টা পাইব।" আরাঙ্গিবের প্রাগুক্ত প্রস্তাবের প্রতি অক্ষরেই ধূর্ত্ততা প্রতীয়মান হয় তথাপি জড়বুদ্ধি মোরাদ তাহাতে অণুমাত্রও বিরুদ্ধ সন্দেহ করিলেন না (১৬৫৭)।

এইরূপে কুমারেরা প্রত্যেকে রাজা হইবার প্রয়াস

পাইতেছিলেন ইত্যবসরে সাজাহান সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং অবশিষ্ট তিন পুত্রের অনুচিত আচরণ দেখিয়া দারার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক অনুরক্ত হইলেন। তিনি সুজাকে অবিলম্বে আপন সুবায় প্রতিগমন করিতে পত্র লিখিলেন। কিন্তু সুজা, সেই পত্র দারার লিখিত এই ভান করিয়া, ক্রমশই রাজধানীর অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। তখন দারার পুত্র সলিমান সুজার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। বারাণসীর সমীপে সুজা পরাস্ত হইয়া অগত্যা বাঙ্গালায় প্রতিগমন করিলেন। এদিকে মোরাদ ও আরাঙ্গিব একযোগ হইয়া, মালব দেশে দারার প্রেরিত সেনানী যশোবন্ত সিংহকে পরাস্ত করিয়া, রাজধানীর অভিমুখে আসিতেছিলেন। একযোগ হওয়ার সময় আরাঙ্গিব অঙ্গীকার করেন যে, উত্তর কালে মোরাদ রাজাসন গ্রহণ করিবেন, আরাঙ্গিব তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকিবেন। সেই অঙ্গীকারের পর আরাঙ্গিব আপনিই সমস্ত সৈনিককার্য্যের কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিয়তই প্রগাঢ়সম্মানপ্রদর্শন ও প্রভুত্বাস্বীকরণ প্রভৃতি দ্বারা মোরাদের মুগ্ধতা সম্পাদনে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

মোরাদ ও আরাঙ্গিবের বিদ্রোহ নিবারণ মানসে সম্রাট্ স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধ যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিলেই কুমারেরা বশ্যতা-পদবীতে প্রত্যাগত হইবে, কিন্তু কোন কোন অমাত্যের পরামর্শে সেরূপ হওয়া অসম্ভব প্রতিপাদিত হইলে, সম্রাট্ নিরস্ত হইলেন। তখন দারা, আরাঙ্গিব ও মোরাদের বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হইবার মনস্থ করিলেন। সাজাহান তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। দারার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈনিকেরাও

সলিমানের সহিত সুজার বিরুদ্ধে গমন করিয়াছিল এপর্য্যন্ত প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু উদ্ধত দারা পিতার নিষেধ না মানিয়া এবং সলিমানের সমভিব্যাহারী সেনা-দিগেরও প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা না করিয়া ভ্রাতাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষের সেনারা আগ-রার অনতিদূরে পরস্পর সম্মুখীন হইল। দারা স্বয়ং এবং তাঁহার পক্ষীয় রজঃপুত ও উজবেগেরা অতিশয় বীরতা প্রকাশ করিলেন। মোরাদও নিজের প্রচুর সাহ-সের বিলক্ষণ পরিচয় দিলেন। তিনি যে হস্তীর উপরে আরূঢ় ছিলেন তাহার পরিস্তোম এমন শর-সঙ্কুল হইল যে উহা শল্লকীর অঙ্গের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। আর তাঁহার হস্তী রণস্থল হইতে পলাইবার উপক্রম করিলে তিনি তাহার পদবন্ধন দ্বারা গতি রোধ করিলেন। এ দিকে আরাঙ্গিব নিয়ত আপনার চিরাভ্যস্ত নিঃশঙ্কতা ও বিমৃষ্যকারিতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বদলের সেনারা যেখানেই অধিক বিপন্ন সেইখানেই আরাঙ্গিবের হস্তী উপস্থিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত "পরমেশ্বর আমাদের পক্ষ আছেন, অন্য আশ্রয় বা সহায় কিছুই নাই" এই বাক্য প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। অবশেষে দারার হস্তী একটা জ্বলৎকন্দুকে আহত হও-য়ায় অবাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি তাহা হইতে অবরোহণ করিলেন। অমনি তাঁহার সেনারা তাঁহার অদর্শনে মরণ নিশ্চয় করিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। সুতরাং তাঁহার বিপক্ষেরা রণজয়ী হইলেন; দারা আগরায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু লজ্জায় পিতার নিটক যাইতে অপারগ হইয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন (১৬৫৮)।

রণে জয়লাভ হইবামাত্রই আরাঙ্গিব প্রণিপাতপূর্ব্বক

পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন। পরে মোরাদের সমীপে যাইয়া 'তুমি রাজা হইলে' এই বলিয়া অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিন দিবস পরে, মোরাদ ও আর-ঙ্গিব উভয়ে আগরার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাদের প্রবেশের কোনরূপ ব্যাঘাত ছিল না। আরা-ঙ্গিব সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া বারম্বার সাজাহানের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দারার প্রতি পিতার অটল অনুগ্রহের হ্রাস সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে সম্রাটের আবাস-দুর্গ অধিকার করিবার জন্য আপন পুত্র মহম্মদকে প্রেরণ করিলেন। দুর্গ অধিকৃত হইল; সম্রাটও আরাঙ্গিবের স্বগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর সাজাহান সাত বৎসর জীবিত ছিলেন। তত্তাবৎ কাল আরাঙ্গিব তাঁহার প্রতি ভক্তি ও সমাদর প্রদর্শনে ক্রটি করেন নাই।

সাজাহানের নিরোধের পর মোরাদকে আর প্রয়োজন না থাকায়, আরাঙ্গিব অনায়াসেই তাহার বিসর্জ্জন সম্পন্ন করিলেন। পিতাকে নিরোধ করিয়া মোরাদ ও আরাঙ্গিব উভয়ে দারার অনুসরণে ধাবমান হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে একদা রাত্রিতে আরাঙ্গিব মোরাদকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন। মুহুর্মুহুঃ পানপাত্র চলিতে লাগিল। আরাঙ্গিব আপনার সচরাচর আচরিতের বৈপরীত্যেও সে রাত্রিতে সুরা গ্রহণ করিলেন। অবশেষে মোরাদ মাতাল ও মৃৎপিণ্ডের ন্যায় সংজ্ঞাবিহীন হইয়া পড়িলেন, তখন আরাঙ্গিব তাঁহাকে নিগড়-নিবদ্ধ করিয়া করি-পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। পাছে লোকে সন্ধান করিয়া উঠে যে মোরাদ দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছে, এই আশঙ্কায় আরও তিন হস্তী অন্য তিন দিকে প্রেরিত

হইল। এই ব্যাপারের পর আরাঙ্গিব দিল্লীতে আসিয়া সিংহাসনে আরোহণ 'এবং অলুমগীর' অর্থাৎ জগজ্জয়ী এই উপাধি গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে সাজাহানের রাজত্ব বিলুপ্ত হইল। তিনি কতিপয় বিষয়ে বাবর ও আকবরের তুল্য নহেন সত্য, কিন্তু নিঃসন্দেহই ভারতবর্ষের মঙ্গল-বর্দ্ধক রাজাদিগের মধ্যে প্রধান শ্রেণীতে গণ্য। তাঁহার সময়ে ভারত-ভূমির যাদৃশ অভ্যুদয় হইয়াছিল অন্য কোন মুসলমান সম্রাটের সময়েই তাদৃশ দেখা যায় নাই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের সহিত কয়েক বার সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপন রাজ্যে প্রায় সর্ব্বদাই শান্তি রক্ষা করেন। তাঁহার প্রতাপে ধর্ম্মাধিকরণ সকল প্রায়ই সদ্বিচার হইত এবং দুষ্ট দমনে ফৌজদারী কর্ম্মচারীদিগের বিলক্ষণ তদারক ছিল। এই সকল কারণে সমুদায় ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কোন রূপে প্রজার নিষ্পীড়ন করিতেন না। ফলতঃ পিতা যেমন পুত্রদিগের শাসন করেন, তিনিও প্রকৃতি-পুঞ্জের সেইরূপ শাসন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীরা যে কোন প্রকারে অত্যাচার করিত না, এমন কোনরূপেই সম্ভব নহে; প্রত্যুত কোন কোন বিষয়ে তাহাদের অত্যাচারের অনেক বিশ্বাসার্হ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

সাজাহানের তুল্য সমৃদ্ধিমান্ সম্রাট্ ভারতবর্ষে দ্বিতীয় দেখা যায় নাই। তাঁহার সভায় ও তৎসংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ে আড়ম্বর ও জাঁকজমকের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরাসন তাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি এক রাজাসন নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল হীরকাদির অভ্যন্তরে বিবিধবর্ণের বহুমূল্য মণি-

পরম্পরায় সজ্জটিত, বিস্তৃত-শিখণ্ড ময়ূর নির্ম্মিত হয়। সেই জন্য সেই আসনের নাম ময়ূরাসন হইয়া উঠে। উহার নির্ম্মাণে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

অন্যান্য বিষয়ের অপেক্ষা সাজাহান হর্ম্ম্য নির্ম্মাণেই অধিক সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি দিল্লীতে এক নূতন নগরই নির্ম্মাণ করেন, প্রাচীন দিল্লীর অপেক্ষা উহার শোভা অতীব উৎকৃষ্ট। একাল পর্য্যন্ত সকল দেশেই সাজাহান-নির্ম্মিত দিল্লীর রাজ-প্রাসাদের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা হইয়া থাকে। তাঁহার নির্ম্মিত দিল্লীর মসিদও অতি উৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য, কিন্তু এই সমুদায় হর্ম্ম্যও আবার সাজাহানের আর এক প্রাসাদের সমক্ষে অপকৃষ্ট। বলিতে হয়। ফলতঃ সমুদায় পৃথিবীতে সেই প্রাসাদের দ্বিতীয় দেখা যায় না। উহার প্রকৃত নাম মমতাজমহল। সামান্যতঃ উহাকে তাজমহল কহে। সাজাহান মমতাজমহল নাম্নী প্রেয়সী মহিষীর সমাধির জন্য উহার নির্ম্মাণ করেন। সাজাহান স্বয়ংও সেই প্রাসাদে সমাহিত আছেন। ঐ প্রাসাদ আগরা নগরে নির্ম্মিত।

প্রাগুক্ত প্রাসাদ প্রভৃতি সামান্য ব্যয়ে বা পরিশ্রমে সম্পাদিত হয় নাই। তথাপি সাজাহান নূতন নূতন শুল্কের সৃষ্টি করিয়া বা বেগার ধরিয়া, কখন প্রজার নিষ্পীড়ন করেন নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্তে সাম্রাজ্যের নিয়মিত রাজস্ব হইতেই সমুদায় ব্যয় সচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। আরও তিনি যখন রাজ্যচ্যুত হন তখন রাজকোষে মণি, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি সম্পত্তি ভিন্ন এত নগদ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছিল যে, কেহই তৎসমুদায় ছয় কোটির ন্যূন বলিয়া গণনা করেন নাই। কেহ কেহ বা তাহার চতুর্গুণও বলিয়া গিয়াছেন।

একবিংশ অধ্যায়।

আরাঞ্জিব।

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে আরাঞ্জিব সিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দারা ও সুজা জীবিত ও সসৈন্য থাকায় তখনও আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারেন নাই। দারা বিবিধ সদ্‌গুণের আধার এবং সাজাহানের অভিমত উত্তরাধিকারী; সুতরাং তাঁহা হইতেই আরাঞ্জিবের অধিক আশঙ্কার সম্ভাবনা ছিল। এজন্য অভিনব সম্রাট্‌ অগ্রে তাঁহারই বিনাশ সাধন সঙ্কল্প করিলেন। এদিকে দারা, দিল্লী হইতে লাহোরে যাইয়া, বহুল সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই সৈনিক-কার্য্যে নূতন-ব্রতী। তাহাদিগকে লইয়া ভ্রাতার সাংযুগীন সেনানিচয়ের সম্মুখীন হইতে তাঁহার সাহস হইল না। আরাঞ্জিবের আগমনেই তিনি লাহোর পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুদেশে যাইবার অভিসন্ধিতে, মূলতান যাত্রা করিলেন। কিন্তু তেমন অবস্থায় তাদৃশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে নিবর্ত্তন ও পরাভব উভয়ই তুল্য অনিষ্টকর। দারার সেনারা ক্রমশই তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি অত্যল্প অতি বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত টাটায় উত্তীর্ণ হইলেন। এদিকে তাঁহার পুত্র সলিমান তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার মানসে ধাবমান হইতেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে, আরাঞ্জিবের প্রবর্ত্তনায়, সেই যুবরাজের অধিকাংশ সেনা ও সেনানী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অগত্যা তিনি হিমালয়ের তলে তলে

আসিয়া অবশেষে শ্রীনগরের রাজার নিকট আশ্রয় যাচ্ঞা করিলেন। রাজা তাঁহাকে নামে আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ বন্দীস্বরূপ রাখিলেন। দারা মুলতান যাত্রা করিলে আরাঙ্গিবও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে পর সম্বাদ আসিল সুজা বাঙ্গালা হইতে সসৈন্য ধাবমান হইয়া, দিল্লীর অভিমুখে আসিতেছেন। তৎশ্রবণে আরাঙ্গিবকে অগত্যা পরাবর্ত্তন করিতে হইল।

তিনি দিল্লীতে পঁহুছিলেন কিন্তু তথায় কয়েক দিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া পরে আলাহাবাদের অভিমুখে নির্গত হইলেন। পথিমধ্যে কাজোয়া নামক স্থানে আসিয়া দেখিলেন সুজা তথায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উভয়ের সেনারাই, বিনাযুদ্ধে, তিন দিন পরস্পর সম্মুখীন রহিল। তৃতীয় দিবসে রজনী প্রভাতকল্পা, আরাঙ্গিব ব্যূহ সন্নিবেশ করিতেছেন; এমন সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার পার্ষ্ণিদেশে ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইল। যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতাই সেই কোলাহলের মূল হেতু। কিছু কাল পূর্ব্বে সেই রজঃপূত ভূপতি, দারার পক্ষ একান্ত অসমর্থ দেখিয়া, স্বগণ সহিত আরাঙ্গিবের দলে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার ইচ্ছানুরূপ সম্বর্দ্ধনা না পাইয়া অভিমানী হন। পরে গোপনে সুজার সহিত ষড়যন্ত্র করেন যে, অমুক সময়ে উভয়ে আরাঙ্গিবের পার্ষ্ণি ও অগ্রা সেনাদিগকে যুগপৎ আক্রমণ করিবেন। তিনি সেই ষড়যন্ত্র অনুসারে পার্ষ্ণিসেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু সুজা তখনও প্রস্তুত হন নাই। যদি তিনিও সেই সময়ে অগ্রা সেনাদিগের উপর ধাবমান হইতেন তাহা হইলে আরাঙ্গিবের

সর্ব্বনাশ হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ক্রমে রজনী বিগত, সূর্য্য উদিত হইল, অতঃপর সুজাও আক্রমণে ধাবমান হইলেন। প্রারম্ভেই গোলাবর্ষণ, অবিলম্বে নিযুদ্ধ * উপস্থিত হইল। আরাঞ্জিবের দক্ষিণ বাজু অপসারিত হইল; মধ্যস্থলে তিনি স্বয়ং ছিলেন, তাহাও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। মুহুর্মুহুঃ তাঁহার পরাজয়ের পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার হস্তী, বিপক্ষদলের এক প্রকাণ্ড করিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া, প্রায় ভূতলশায়ী হইয়াছিল; এমন সময় সেই বিপক্ষ মাতঙ্গের পরিচালক নিহত হইল। এরূপ বিভ্রাট-পরম্পরায়ও আরাঞ্জিব যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি নিয়তই শত্রুসৈন্যের মধ্যস্থল সম্মর্দ্দন করিতে তৎপর রহিলেন। অবশেষে তাঁহার ভাগ্য প্রবল হইয়া উঠিল। বিপক্ষ দল ১১৪ কামান ও বহুসংখ্য হস্তী ফেলিয়া পলায়ন করিল। ইতিপূর্ব্বেই যশোবন্ত প্রস্থান করিয়াছিলেন।

আরাঞ্জিব যুদ্ধে জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত শত্রুর অনুসরণ পরিত্যাগ করিতে হইল, কারণ তিনি সম্বাদ পাইলেন, দারা টাটা হইতে গুজরাটে আসিয়া, তত্রত্য সুবাদার সানওয়াজকে স্বপক্ষ করিয়া, বহুল সৈন্যের সহিত অবশেষে রাজপুতানায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তথায় যশোবন্ত সিংহও তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, এরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। যশোবন্ত যোধপুরের অধীশ্বর এবং বিলক্ষণ প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তিনি দারার সহিত মিলিত হইলে, দারাকে

---

* দুই পক্ষের সৈনিকেরা পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র-ভিন্ন অস্ত্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সেরূপ যুদ্ধকে নিযুদ্ধ কহে।

পরাস্তব করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে ; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আরাঙ্গিব যশোবন্তকে হস্তগত করিবার মানস করিলেন। তদনুসারে তিনি, সেই রজঃপুত্রের অচিরা-মুষ্ঠিত বিশ্বাসঘাতকতা নিবন্ধন ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তাঁহাকে তোষামোদ ও মহা সমাদর করিয়া এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে যশোবন্ত দারার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। দুর্ভাগা দারা তাঁহার নিকট যে সহায়তা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহাতে বঞ্চিত হইয়া, অগত্যা আজমীরের সন্নিকর্ষে, এক অসামান্য দুরাক্রম্য প্রদেশে উপাকার্য্যা সন্নিবেশ করিলেন। আরাঙ্গিব তত্ত্বাবৎ শ্রবণ করিয়া, অচিরকাল মধ্যেই দারার সম্মুখীন হইলেন। তিন দিন গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহাতে আরা-ঙ্গিবের পক্ষে ববং ক্ষতিই হইয়াছিল। অবশেষে আরা-ঙ্গিব আক্রমণে ধাবমান হইলেন। কিয়ৎকাল ঘোর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে সানওয়াজ নিহত হওয়ায় দারা এমনই নিরাশ হইলেন যে, রণে ভঙ্গ দিয়া, দ্রুত পদে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিল। তাঁহার আত্মশরীর-রক্ষার্থ নিযুক্ত অশ্বারোহীরাও একে একে সরিয়া পড়িল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বিনাশাবশিষ্ট সম্পত্তিও অপহরণ করিতে লাগিল।

অষ্টাহ দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পর্য্যটন এবং দুরন্ত আতপ-তাপে ও কুলি নামক পার্ব্বতীয় জাতির আক্রমণে একান্ত পীড়িত হইয়া, অনন্তর দারা আমেদনগরের সন্নিধানে উত্তীর্ণ হইলেন। ভাবিয়াছিলেন, তথায় অন্ততঃ কিছুকাল ক্লেশের বিরাম হইবে, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে তাহাও ঘটিল না। তাঁহার আগমনে আমেদনগরবাসীরা নগর-

প্রবেশের সমুদায় দ্বার রুদ্ধ করিল; তিনি প্রবেশে বঞ্চিত হইলেন। তখন সমুদায় আশা ভরসা বিসর্জ্জন করিয়া, বাক্‌পথাতীত দুঃখ-দগ্ধ-হৃদয়ে হৃতসর্ব্বস্ব দারা কচ্ছে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে পারসাপতির আশ্রয় যাচ্ঞায় যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে কাণ্ডাহারের অনতি-দূরবর্ত্তী জুন নামক ভূভাগের সামন্ত, কপট আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। দারার সৌ-ভাগ্য-সময়ে জুনের সামন্ত তাঁহার নিকট প্রচুর উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহাকে আরাঙ্গিবের খর্পরে সমর্পণ করিয়া, তিনি সেই উপকাররাশির পরিশোধ করিলেন।

রাজধানীতে আনীত হইয়া, দারা চীবর-বসন-পরি-হিত ও অতি কদর্য্য করিস্কন্ধে আরোহিত হইয়া দিল্লীর পথে পথে পরিভ্রামিত হইলেন। ঈদৃশ প্রদর্শনে আরা-ঙ্গিব মনে করিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠের উপরে নগরবাসী-দিগের ঘৃণার উদয় হইবে, কিন্তু হিতে বিপরীত হইবার উপক্রম হইল। নগরবাসীরা মহান্ দারার পূর্ব্ব সৌভাগ্য স্মরণ ও ঈদৃশ শোচনীয় ভাগ্যবিপ্লব দর্শন করিয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। দারার পার্শ্বদেশে তাঁহার এক তেজঃপুঞ্জ ও পরম সুন্দর কুমার আসীন ছিলেন। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া, নগরবাসীরা আরও অধীর হইল এবং দুরাত্মা আরাঙ্গিবের প্রতি অভিসম্পাত করিতে লাগিল। নগরে রাজদ্রোহের পূর্ব্ব লক্ষণ হইয়া উঠিল। তখন আরাঙ্গিব তাদৃশ বিভ্রাটের মূল কারণের আশু সংহার করা সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে তাঁহার মন্ত্রি-কুলের মধ্যে কতিপয় ব্যবহারবিদের কপট বিচারে মুসল-মানধর্ম্ম-পরিত্যাগ-দোষ-ছলে, দারার প্রাণদণ্ড বিহিত

হইল। আরাঙ্গিব অতিশয় অনিচ্ছার ভান করিয়া সেই দণ্ডবিধানে সম্মতি দিলেন। ঘাতকেরা দারার সন্নিধানে প্রেরিত হইল; দারা তাহাদের উপস্থিতি মাত্রই তাবৎ বুঝিতে পরিলেন এবং তৎকালে যত দূর সাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টার পর নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মুণ্ড আরাঙ্গিবের নিকট প্রেরিত হইল। প্রক্ষালন করিয়া তিনি দেখিলেন, উহা যথার্থই জ্যেষ্ঠের মুণ্ড বটে। তখন সেই নরাধম বাক্যে শোকের ভান ও চক্ষে বাষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। অতঃপর দারার সমভিব্যাহারে তাঁহার যে পুত্র ছিলেন তিনি গোয়ালিয়ার দুর্গের কারাগারে সমর্পিত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কাজোয়ার যুদ্ধের পর আরাঙ্গিব স্বয়ং সুজার অনুসরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে সুজাকে নিতান্ত নিরুদ্বেগে রাখিয়াছিলেন এমন নহে। তিনি আপন পুত্র কুমার মহম্মদ ও সেনানী মির জুম্লাকে সুজার অনুসরণে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সুজা নিজ ভগ্ন সেনার পুনরাহরণ সম্পন্ন করেন এবং কাজোয়া হইতে বাঙ্গালার অভিমুখে পরাবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ মুঙ্গের, পরে রাজমহলে আসিয়া উপস্থিত হন। এদিকে কুমার মহম্মদ, পিতার সৈন্যমধ্যে সর্ব্ববিষয়ে স্বয়ং সাক্ষীগোপাল এবং জুম্লাই প্রকৃত কর্ত্তা এইরূপ দেখিয়া, বিরক্ত ও অভিমানী হইয়া, পিতৃসৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুজার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সুজা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। যাহা হউক, স্বল্পকালমধ্যেই মহম্মদ কোন অপরিজ্ঞাত কারণে, সুজার প্রতিও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন এবং তদীয় শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক জুম্লার শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন আরাঙ্গি-

বের আদেশানুসারে সেই হতভাগ্য যুবরাজ রুদ্ধ হইয়া গোয়ালিয়ার দুর্গের কারাগৃহে সমর্পিত হইলেন। এদিকে সুজা মিরজুম্লা কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া প্রথমতঃ ঢাকায়, পরে আরাকানে পলায়ন করিলেন। শেষোক্ত দেশে তিনি সবংশে নিহত হন, কিন্তু কিরূপে সেই শোচনীয় নৃশংস ব্যাপার ঘটিয়া উঠে, তাহার সবিশেষ বিবরণ পরিজ্ঞাত নহে।

সুজার সর্ব্বনাশের অনধিক কাল পরে দারার সলিমান আরাঙ্গিবের হস্তে সমর্পিত হইলেন। পূ. উল্লেখ করা গিয়াছে, ইনি হিমালয়প্রদেশে শ্রীনগর রাজ্যে এক প্রকার বন্দীদশায় পতিত হইয়াছিলেন। আরাঙ্গিব বিবিধ চেষ্টা করিয়া, অবশেষে শ্রীনগর-পতির রাজ্য হইতে ইহাকে আনয়ন করিলেন। ইনিও হীনভাগ্য পিতার ন্যায় নিগড-নিবদ্ধ অঙ্গে মাতঙ্গপৃষ্ঠে দিল্লীনগরে পরিভ্রামিত হইয়া, অবশেষে সম্রাট্‌সকাশে আনীত হইলেন। তখন সলিমানের মুখ-ম্লান বীর কলেবর দর্শনে অনেকেই অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন, পাষাণহৃদয় আরাঙ্গিবও কপট শোক প্রকাশ করিলেন। সলিমান এই মাত্র প্রার্থনা জানাইলেন যে "শরীরনাশক ও বুদ্ধিভ্রংশক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা যন্ত্রণা দিয়া ক্রমে ক্রমে মৃত্যুগ্রাসে সমর্পণ না করিয়া একবারেই আমার শিরশ্ছেদ হয়।" তচ্ছ্রবণে আরাঙ্গিব তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন এবং কহিলেন "আমি ক্রূর নহি, কেবল আত্মরক্ষার্থই নির্ম্মমতা প্রদর্শন করিতে হইতেছে।" অবশেষে সলিমান গোয়ালিয়ার দুর্গে নিরুদ্ধ হইলেন।

এই ব্যাপারের অল্পকাল পরেই মোরাদ সেই ভীষণ কারাগার হইতে পলায়নের চেষ্টা পান। তখন আরাঙ্গিব

ষড়যন্ত্র করিয়া, এক ব্যক্তিকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে মোরাদ গুজ্জর দেশে সেই ব্যক্তির পিতাকে বধ করিয়াছিলেন। সে এক্ষণে সেই হত্যাব্যাপারের সূত্রে সম্রাট-সকাশে অভিযোগ করিল। অমনি ন্যায়বান সম্রাট্ মোরাদের শিরশ্ছেদ বিধান করিলেন। কারাগৃহ মধ্যেই ঐ নিদারুণ দণ্ড সম্পন্ন হইল। যিনি এইরূপে 'ক বন্দী শত্রু, হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন তিনি যে ন্যান্য বন্দীশত্রুদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা কথনই সম্ভব নহে। ফলতঃ গোয়ালিয়ার দুর্গের কারাগৃহে সলিমান, তাঁহার ভ্রাতা সেফর ও মোরাদের এক পুত্র, ইঁহারা সকলেই অনধিককালমধ্যেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আরাঞ্জিবের নিজ পুত্র মহম্মদ বহুকাল জীবিত ছিলেন।

প্রাগুক্ত প্রকারে আরাঞ্জিব ভ্রাতৃগণকে সপুত্র বিনাশ করিয়া এক প্রকার নিষ্কণ্টক হইয়া উঠিলেন। অতঃপর কেবল নিজ সেনানী মিরজুম্লা, আপনার ক্ষমতার আধিক্য হেতু একমাত্র ভয়ের ভাজন রহিলেন। সম্রাট তাঁহাকে কোন রূপে কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবার মানসে, আসাম দেশের আক্রমণে প্রবর্ত্তিত করিলেন। তদনুসারে জুম্লা তদ্দেশে ধাবমান হইলেন (১৬৬৩) এবং তাহার অধিকাংশ পরাজয় করিয়া উঠিলেন। তখন এক গর্ব্বিতাক্ষর পত্রে সম্রাট-সকাশে সেই জয়-সম্বাদ প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, অল্পকাল-মধ্যেই আমি চীন পর্য্যন্ত জয় করিয়া উঠিব। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হইল, জুম্লার শিবিরে আহার-সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল, আসামের অধিবাসীরাও চতুর্দ্দিক হইতে সম্প্রহার আরম্ভ করিল। এমন সময়ে জুম্লার সৈন্যমধ্যেও

মহামারী উপস্থিত হইল। তখন সেই অহমিকা-প্রগল্‌ভ সেনানী অগত্যা পরিবর্ত্তন-পন্থায় পদার্পণ করিলেন; কিন্তু ঢাকা পর্য্যন্ত পঁহুছিবার পূর্ব্বেই গতাসু হইলেন (১৬৬৩)। অনন্তর সম্রাট জুম্লার পুত্র আমিনকে তদীয় উপাধি অর্পণ করিয়া কহিলেন, "তুমি পিতৃহীন হইলে, আমারও সর্ব্বাপেক্ষা সক্ষম সুহৃদ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শঙ্কার ভাজন বিগত হইল।"

এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্ব্বে আরাঞ্জিব জীবন ও রাজপদ কীদৃশ ক্ষণভঙ্গুর তাহার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক দুরন্ত রোগের আক্রমণে মুমূর্ষু হইয়া উঠেন। অমনি তাঁহার পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত বিবিধ ষড়যন্ত্র উপস্থিত হয়। কেহ সাজাহানকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত, কেহ বা অপর ব্যক্তিকে সিংহাসনে আরোহিত করিতে উদ্যত হন। যাহা হউক, আরাঞ্জিবের সাহস, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিকৌশল হেতু চক্রান্তকারীরা কিছু সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা সকলেই ত্রস্ত রহিল; এদিকে আরাঞ্জিবও ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে শরীর শোধনের নিমিত্ত কাশ্মীরে প্রস্থান করিলেম।

আরাঞ্জিব কাশ্মীরের মনোহর বায়ু সেবন করিতেছিলেন; এদিকে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার বংশের ভাবী ভীষণ শত্রুরা প্রথম শির উত্তোলন করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুরা মহারাষ্ট্রীয়, সামান্যতঃ মারহাট্টা এই নামে খ্যাত।

এক দিকে গোয়া নগর হইতে বিদর্ভ দিয়া, বরদা নদীর তীরবর্ত্তী চান্দা নগর পর্য্যন্ত কল্পিত রেখা, অন্য দিকে আরব সাগর, ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী যাবতীয় ভূভাগ

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আদিম স্থান। ঐ ভূভাগ মহারাষ্ট্র দেশ নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্রের উত্তর সীমায় শাতপুড়া পাহাড়, অভ্যন্তরে সুপ্রসিদ্ধ সহ্যাদ্রি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। শেষোক্ত পর্ব্বত কুত্রাপি তিন হাজার হস্তের অধিক উচ্চ নহে। সহ্যাদ্রির পশ্চিম কটক অতীব অকট ও দুরারোহ, পূর্ব্ব কটক ক্রমশঃ ঢালু। উহার শিখর দেশ উদ্ভিদ-বিহীন নগ্নোপল-সম্পন্ন, উত্তর কটক বিশাল বৃক্ষাবলী ও পর্ব্বতের গুল্মে নিবিড় আচ্ছন্ন। পূর্ব্ব কটকের সন্নিহিত ভূভাগও বনাকীর্ণ এবং স্বল্প-পরিসর নদী-পরম্পরায় নির্ভিন্ন। তথায় বিবিধ-জাতীয় অসঙ্খ্য বন্য জন্তু বিচরণ করে। পর্ব্বত হইতে, আট নয় ক্রোশ পূর্ব্বে আসিয়া, অন্তর্দ্দেশ সকল ক্রমশই অধিক বিস্তৃত এবং অবশেষে সমতল ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে। সেই সকল ক্ষেত্রে বৃক্ষ অধিক নাই। কিন্তু নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। সহ্যাদ্রির পশ্চিমে আসমুদ্র ভূভাগ কঙ্কণ-প্রদেশ নামে পরিচিত। উহার বিস্তার কুত্রাপি বিংশতি ক্রোশের অধিক নহে। তত্রত্য ভূমি অতীব বন্ধুর, কেবল সমুদ্র-তটে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়, অবশিষ্ট ভাগ, বন ও দৃষদে সমাকীর্ণ। তথায় অসংখ্য ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত, সমুদ্র-সমীপে সেই সকল নদী অতীব পঙ্কিল এবং তীরস্থিত আম্রবনে নিবিড় আচ্ছন্ন। বর্ষাকালে কঙ্কণ সেঁতসেঁতিয়া ও অতিশয় অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে।

সহ্যাদ্রি ও তাহার সমুদায় প্রত্যন্ত শৈলের শিখর ভাগ প্রায়ই সমতল কিন্তু অত্যন্ত দুরারোহ। সেই সকল শিখরদেশে অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত আছে। পর্ব্বত-কটকে রচিত অধিরোহিণী দ্বারা উপর্য্যুপরি তোরণের মধ্য

দিয়া যাইয়া তৎসমুদায় দুর্গে উঠিতে হয়। আপাততঃ দেখিলে সেই সকল দুর্গ অতিশয় দুরাক্রম্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

বর্ণিত দেশের অধিবাসীরা খর্ব্ব, দৃঢ় ও সুঘটিত-কলেবর কিন্তু দেখিতে বিশ্রী। ইহারা সকলেই উদ্যোগী, পরিশ্রমী, কষ্টসহ ও অধ্যবসায়ী। আপনাদের অভিলষিত সাধনের জন্য একান্ত উৎসুক, তদর্থে ন্যায়ান্যায় বিচার বিসর্জ্জন করে; আপনাদিগকে বিপন্ন করিতে হইলেও পরাঙ্মুখ হয় না এবং আবশ্যক হইলে প্রচুর সাহসও প্রকাশ করিয়া থাকে। চাতুর্য্য ও ধূর্ত্ততা ইহাদের নিয়ত আজ্ঞাকারী। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আদিম ইতিবৃত্ত অপরিজ্ঞেয়। মোগলদিগের রাজত্বসময়ে ইহাদের এক জন নির্দ্দিষ্ট রাজা ছিলেন না। প্রধান প্রধান লোকেরা পুরুষানুক্রমে গ্রামীক, দশী, বিংশী ইত্যাদি কর্ম্মচারীর কার্য্য করিতেন। তাঁহারা অনুক্ষণ আমেদনগর ও বিজয়পুরের রাজাদিগের সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয়পুরের রাজা, আপন রাজ্যমধ্যে রাজত্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় লিখন পঠনে, পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রচলিত এবং বহুসংখ্য মহারাষ্ট্রীয়কে সৈন্যমধ্যে নিবেশিত করেন। তাহারা অশ্বারোহীর কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করিল। তদ্দর্শনে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থানের মুসলমান রাজারাও মারহাট্টাদিগকে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, মালিক আম্বরের সময়ের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় নাই।

মালিক আম্বরের কর্ম্মসচিবদিগের মধ্যে মালজি ভোসলা নামে এক জন সংকুলোদ্ভব মহারাষ্ট্রীয় নিযুক্ত

ছিলেন। ইনি তাদৃশ বিত্তব বা প্রভুতাসম্পন্ন ছিলেন না। অপর একজন মহারাষ্ট্রীয় ইহাঁর প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহার নাম যদুরাও। শেষোক্ত ব্যক্তি আপনাকে রজঃপুতবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন। সে পরিচয় সত্য হউক বা না হউক, তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ও স্বজাতীয় অনেকের উপরে প্রচুর কর্ত্তৃত্ব ছিল। একদা কোন পর্ব্বোপলক্ষে মালজি যদুরাওয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাজি নামে পঞ্চবর্ষীয় এক পুত্র সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল। যদুরও তিনবর্ষবয়স্কা এক কন্যা ছিল। যদু উভয়কে যুগপৎ ক্রোড়ে লইয়া রহস্য করিয়া কহিলেন "বেশ সেজেছে, ইহাদের পরস্পর স্বামী স্ত্রী হওয়া উচিত"। তাঁহার কণ্ঠ হইতে যেমন এই বাক্য বিনির্গত হইল অমনি মালজি সহসা উত্থিত হইয়া সভার সমস্ত লোক সাক্ষী করিয়া কহিলেন "আপনারা শুনিলেন যদুর কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ নির্ণীত হইল।" রহস্যবাক্যের সূত্রে আশ্রিত ব্যক্তি ঈদৃশ গুরুতর ব্যাপারের চেষ্টা পাওয়ায়, যদু বিস্মিত ও মহা ক্রোধান্বিত হইলেন। তাঁহার ও মালজির পরস্পর অপ্রণয় ঘটিয়া উঠিল। যাহা হউক, অল্পকালমধ্যেই অনুকূল দৈববশে মালজি আমেদনগর-পতির প্রসাদে, প্রধান প্রধান রাজপদে আরোহণ করিলেন এবং পুনা নগরের সমীপবর্ত্তী কতিপয় গ্রাম জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। যদু আর তখন সাজিকে কন্যাদানে অস্বীকৃত রহিলেন না। সেই বিবাহে সাজির দুই পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে দ্বিতীয়ের নাম শিবজি। শিবজি ১৬২৭ খৃঃ অব্দে ভূমিষ্ঠ হন।

কালক্রমে সাজি বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করেন এবং

তন্নিবন্ধন বিজয়পুরপতির সরকারে নিযুক্ত হইয়া মহী-সুর দেশে এক বহুবিস্তৃত জায়গীর প্রাপ্ত হন। মালজির উপার্জ্জিত পুনার জায়গীরও তাঁহার অধিকৃত ছিল। মহী-সুরে জায়গীর পাইয়া তথায় গমনসময়ে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইলেন। শিবজিকে পুনায় রাখিয়া তাঁহার উপর সেই জায়গীরের ভার সমর্পণ করিয়া গেলেন। দাদাজি নামক এক ব্রাহ্মণ শিবজির রক্ষণাবেক্ষক-স্বরূপ নিযুক্ত থাকিলেন। শিবজি ক্রমশঃ বয়োঽধিক হইয়া ষোড়শ বর্ষে এমনি তেজীয়ান ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠি-লেন যে, দাদাজির শাসন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগি-লেন। তদানীং সাজির অশ্ব-সৈনিকেরা এবং পুনার সন্নি-হিত সহ্যাদ্রি ভাগের অধিবাসীরা শিবজির প্রধান সহচর ছিল। তিনি মৃগয়ার্থ সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশে বারম্বার গমনাগমন দ্বারা তত্রত্য তাবৎ দরী ও গহ্বর উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কঙ্কণ প্রদেশে কয়েকবার ভয়ঙ্কর দস্যু-দৌরাত্ম্য উপস্থিত হয়। তৎসমুদায়ে তিনি নিতান্ত নির্লিপ্ত ছিলেন না। তিনি বীররস-পূরিত-গীতি-শ্রবণে অতিশয় আসক্ত ছিলেন এবং তদ্দ্বারা স্বয়ং বীরশ্রেণীতে গণিত হইবার জন্য দিন দিন উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তিনি বাল্যা-বধিই মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং সর্ব্বদাই বলি-তেন আমি উহাদিগকে পরাজয় করিয়া স্বাধীন রাজা হইব।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে মহারাষ্ট্রে অনেক গিরি-দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। শিবজির সময়ে সেই সকলের কিয়-দংশ বিজয়পুরপতির অধিকৃত থাকে। কিন্তু তৎসমুদায় বিজয়পুর-রাজ্যের রাজধানী হইতে বহু দূর অন্তরে অব-

স্থিত এবং তাহাদের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তত্তাবতে অধিক সেনা নিযুক্ত থাকিত না। শিবজি ছলে কৌশলে সেই সকলের বহুসংখ্যক স্বয়ং অধিকার করিলেন এবং কালক্রমে (১৬৪৮) কঙ্কণের সমগ্র উত্তর খণ্ড আত্মসাৎ করিয়া উঠিলেন। অতঃপর বিজয়পুরপতি দেখিলেন শিবজিকে দমন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ভাবিয়াছিলেন, শিবজি পিতার সম্মতিক্রমেই তাবৎ অত্যাচার করিতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যাহা হউক, বিজয়পুরপতি শঠতাক্রমে সাজিকে হস্তগত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন "যদি অমুক দিনের মধ্যে তোমার পুত্র বশীভূত না হয় তবে, এই কারাগৃহের দ্বার গাঁথিয়া দিয়া তোমাকে জীবদ্দশায় সমাহিত করিব।" পিতার বিপদ হেতু শিবজি মহাসঙ্কটে পড়িলেন, কিন্তু তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বশ্যতা-স্বীকার শঠ শত্রুকে প্রসন্ন করিবার প্রশস্ত উপায় নহে, ভয়-প্রদর্শন আবশ্যক। এই বিবেচনায় শিবজি সাজাহানের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার প্রভাবে ও অনুগ্রহে পিতার কারামোচন সম্পন্ন করিলেন। সাজি কারাবাস হইতে বহির্গত হইলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে চারি বৎসর বিজয়পুর নগরে নজরবন্দী থাকিতে হইল। তত্তাবৎকাল শিবজি কোনরূপে অত্যাচার করেন নাই। অবশেষে (১৬৫৩) ঘটনাবশে বিজয়পুরপতি সাজিকে সম্পূর্ণরূপে বিনির্মুক্ত করিলেন। অমনি শিবজি আপনার আধিপত্য বিস্তারের পুনশ্চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তিনি অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই পুনা নগরের দক্ষিণবর্ত্তী সমগ্র পার্ব্বতীয় প্রদেশ ও কতিপয় গিরিদুর্গ আত্মসাৎ

করিয়া উঠিলেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ জয়লাভে প্রশ্রয় পাইয়া তিনি অবশেষে (১৬৫৫) সাজাহানের অধিকৃত দাক্ষিণাত্যেরও কিয়দংশ লুঠ করিলেন। তৎকালে কুমার আরাঞ্জিব গোলকুণ্ডাপতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে তিনি জয়ী হইলেন। তখন শিবজি দেখিলেন অতঃপর আরাঞ্জিব তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে পারেন; অতএব তিনি মোগল রাজ্য আক্রমণ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আরাঞ্জিব তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন, পরে, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সাম্রাজ্য-প্রয়াসে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন শিবজি বিজয়পুরপতির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। পরবর্ত্তী চারি বৎসরের মধ্যে আরাঞ্জিব দিল্লীর সিংহাসনে দৃঢ়াসীন হইলেন। এদিকে শিবজিও বিজয়-পুরপতিকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিলেন যে, অবশেষে সেই ভূপতিকে, শিবজির পক্ষে অনুকূল পণে, সন্ধিস্থাপন করিতে হইল। শিবজি সেই সন্ধির পণানুসারে পুনার সন্নিকর্ষে ও কঙ্কণ দেশে অনতিবিস্তৃত ভূভাগের অবি-সম্বাদিত অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি ৭,০০০ অশ্বারোহী ও ৫০,০০০ পদাতিক নিযুক্ত করিলেন।

বিজয়পুরপতির সহিত শিবজির সন্ধিস্থাপনের সম-কালে আর্য্যাবর্ত্তে আরাঞ্জিব পীড়িত হইয়া অবশেষে কাশ্মীরে প্রস্থান করেন। কি সূত্রে আরাঞ্জিবের সহিত শিবজির প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা পরিজ্ঞাত নহে। যাহা হউক, ১৬৬২ খৃঃ অব্দে, শিবজি দিল্লীপতির অধিকার লুঠ করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে আরা-ঞ্জিবের অধীনে সাএস্তা খাঁ দাক্ষিণাত্যের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শিবজিকে পরাজয় করিয়া, পুনা

অধিকার করিলেন এবং শিবজি বাল্যকালে যে ভবনে বসতি করিতেন, সাএস্তা যাইয়া সেই ভবনেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন শিবজি, পুনরায় অনতিদূরবর্ত্তী সিনগড়-নামক দুর্গে আশ্রয় লইলেন। অনন্তর একদা রজনীযোগে, মেদিনী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, তিনি আড্ডায় আড্ডায় সেনা সন্নিবেশ করিয়া, স্বয়ং পঞ্চ বিংশতি সহচরের সহিত এক বিবাহের বরযাত্রিদলে মিলিয়া, পুনরায় পুনায় প্রবেশ করিলেন এবং বরাবর যাইয়া আপন বাটীতে উত্তীর্ণ হইলেন। সাএস্তা খাঁ শয়ান ছিলেন। এরূপ আকস্মিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য, তাঁহার কোন আয়োজন ছিল না। অগত্যা তিনি শয়নাগারের বাতায়ন দ্বারা পলায়নের চেষ্টা করিলেন। এমন সময়ে বিপক্ষদলের এক তরবারির আঘাতে, তাঁহার হস্তের দুই অঙ্গুলি ছিন্ন হইল। যাহা হউক, তাঁহার নিজের পলায়ন কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও অনুচরবর্গ খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। পরে শিবজি অব্যাহত শরীরে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বহুল মশালের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া, জয়োল্লাসে সিনগড়ে পুনরারোহণ করিলেন। অদ্যাপি মহারাষ্ট্রীয়েরা সানন্দে শিবজির এই বীরতার পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

শিবজির বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা অশ্বসেনার কার্য্যেই অধিক দক্ষ। সেই অনুসারে, তিনি চারি সহস্র অশ্বারোহীর সহিত আরাঙ্গিবের অধিকৃত বহু সম্পত্তির আগার সুরাট বন্দরে উত্তীর্ণ হইলেন। সেই নগরে কোন প্রকার রক্ষাকার্য্য ছিল না; শিবজি অনায়াসে উহা লুঠ করিয়া, বিপুল ধনের সহিত, পরাবৃত্ত

হইলেন। পরে জলপথেও আপন প্রভুত্ব স্থাপনের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহার রণতরি সকল সুরাট ও অন্যান্য বন্দরে বলপূর্ব্বক মোগলদিগের রণতরি অধিকার করিয়া উঠিল। একদা তিনি স্বয়ং চতুঃসহস্র সেনার সহিত তরি আরোহণে যাইয়া বিজয়পুর-স্বামীর অধিকৃত, কানাড়া দেশের অন্তর্গত, এক বহু-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বন্দর লুঠ করিলেন।

মক্কা-দর্শনার্থী যাত্রীরা সুরাট নগরে সমাগত হইয়া তথায় জাহাজে আরোহণ করিত, এজন্য তদানীন্তন মুসলমানেরা ত্তন্নগরকে পবিত্র ভূমি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। শিবজি মুসলমানদিগের সেই পবিত্রক্ষেত্র লুঠ এবং যাত্রি-পূর্ণ কয়েক খান জাহাজ আত্মসাৎ করায়, গোঁড়া আরাঙ্গিবের নিদারুণ কোপ উত্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে সাজি পঞ্চত্ব হইয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের অত্যল্পকাল পরে শিবজি আপনার স্বাধীনতা জানাইবার জন্য রাজ উপাধি গ্রহণ এবং নিজ নামে মুদ্রার অঙ্কন করিয়াছিলেন। তৎ-শ্রবণে আরাঙ্গিবের কোপানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রাজা জয়সিংহ ও দিলির খাঁর অধীনে দাক্ষিণাত্যে এক দল মোগল সেনা প্রেরণ করিলেন। সেনানীরা যাইয়া শিবজির দুই প্রধান দুর্গ অবরোধ করিলেন। তখন শিবজি দেখিলেন, যুদ্ধ করা অপেক্ষা বশীভূত হইলে তাঁহার পক্ষে অধিক মঙ্গলের সম্ভাবনা। তিনি তাহারই চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে অত্যল্প অনুচরের সহিত, জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সেই সেনানী তাঁহার বিলক্ষণ অভ্যর্থনা করিলেন। পরে সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া অনুমোদন জন্য-উহা সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইল। সম্রাট প্রায় সমুদায়

নিশ্চয়ই মঞ্জুর করিয়া পাঠাইলেন। যখন জয়সিংহ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন তখন সম্রাট তাঁহাকে বলিয়া দেন যে, শিবজি বশীভূত হইলে পর, বিজয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিও। তদনুসারে শিবজির সহিত সন্ধির পর, মোগলেরা বিজয়পুরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। সেই সংগ্রামে শিবজি মোগলদিগের সহায়তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিবিধ প্রলোভন দেখাইয়া সম্রাট তাঁহাকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। শিবজিও কৃতার্থম্মন্য-হৃদয়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। আরাঙ্গিব দক্ষ ও তীক্ষ্নবুদ্ধি ছিলেন বটে, কিন্তু তাদৃশ প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিলেন না। তিনি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করিলেই প্রভূত-ক্ষমতাপন্ন শিবজিকে অনায়াসে স্বপক্ষ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। প্রত্যুত তাচ্ছীল্য ও ঔদাস্য প্রদর্শন দ্বারা শিবজির গর্ব্ব চূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। যখন শিবজি দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনার্থ এক জন নীচ পদের কর্ম্মচারী প্রেরিত হইল। পরে শিবজি সিংহাসন-সমক্ষে যাইয়া নিয়মিতরূপে অভিবাদন ও উপঢৌকন প্রদান করিলেন, কিন্তু সম্রাট তাঁহার প্রতি কটাক্ষও করিলেন না। অধিকন্তু শিবজি তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত কর্ম্মচারিবর্গের আসনে উপবেশিত হইলেন। তেজীয়ান মহারাষ্ট্রপতি এতাবৎ অপমানে দারুণ ক্ষোভ ও পরক্ষণেই মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। "মানী ব্যক্তির অপমান শিরশ্ছেদ অপেক্ষাও অধিক।" শিবজি লব্ধসংজ্ঞ হইয়াই সম্রাটের সদস্যদিগকে কহিলেন "তোমরা আমার মানচ্ছেদ করিলে, আমার শিরশ্ছেদও কর।" পরে সম্রাটের অনুমতি বা নিয়মিত খেলাত গ্রহণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শিবজি যে ঈদৃশ তেজোবত্তা প্রকাশ করিবেন, সম্রাট্ এমন প্রত্যাশা করেন নাই, সুতরাং তদুপযুক্ত কি কর্ত্তব্য তাহার কোন অবধারণও হয় নাই। এজন্য শিবজি সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, সম্রাট বিলক্ষণ সতর্কতা পূর্ব্বক তাঁহার সমুদায় চেষ্টিত পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত চর নিযুক্ত করিলেন। এদিকে শিবজি কিরূপে দিল্লী হইতে প্রস্থান সম্পাদন করিবেন, তাহারই অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি সম্রাটের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন "দিল্লীর জল বায়ু আমার সমভিব্যাহারী সেনাদিগের সহ্য হয় না, অতএব প্রার্থনা যে তাহাদিগকে স্বদেশে প্রেরণ করি।" সম্রাট্ ভাবিলেন সেরূপ করিলে শিবজি সঙ্গিবিহীন, সুতরাং একান্ত আয়ত্ত হইয়া পড়িবেন। অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর শিবজি পীড়ার ভান করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন এবং বৈদ্যদিগকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রেরিত সেনাগণের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। আর বৃহৎ বৃহৎ ঝুড়ি পূর্ণ করিয়া হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিরদিগকে পুনঃ পুনঃ মিষ্টান্ন প্রেরণ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তাঁহার বাসা হইতে বৃহৎ ঝুড়ি বহির্গত হইলেই সম্রাট্-নিযুক্ত প্রহরীরা মনে করিতে লাগিল মিষ্টান্নই যাইতেছে। ক্রমশঃ সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইলে একদা শিবজি, এক ভৃত্যকে নিজ শয্যাতে শয়িত করিয়া, একটা ঝুড়িতে স্বয়ং আরূঢ় হইয়া এবং অপর একটায় পুত্রকে আরোহিত করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। অনতিদূরে এক অশ্ব প্রস্তুত ছিল। [illegible] তদুপরি আরূঢ় হইলেন এবং পুত্রকে আপনার পশ্চাদ্দেশে উপবেশন করাইয়া মথুরা

নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় এক মিত্রের নিকট পুত্রকে রাখিলেন। অনন্তর স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে নয় মাস পরে, দাক্ষিণাত্যে উত্তীর্ণ হইলেন (১৬৬৬)। সেই ভূভাগে তখনও সম্রাটের সেনারা বিজয়পুরপতিকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। পাছে শিবজি বিজয়পুররাজের সহিত যোগ দেন এই আশঙ্কায় অধুনা সম্রাট্ তাঁহাকে আত্মপক্ষ করিবার প্রয়াসী হইলেন। তদনুসারে শিবজির সমস্ত ত্রুটি ক্ষমিত, তাঁহাকে এক নূতন জায়গীর অর্পিত এবং তাঁহার রাজ-উপাধি দৃঢ়ীভূত হইল। এইরূপে শিবজি আরাঙ্গিবের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে তাঁহারা অগত্যা তাঁহাকে বার্ষিক কর-প্রদান অঙ্গীকার করিলেন।

অতঃপর কিছুকাল দাক্ষিণাত্যে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সময়ে শিবজি আপন রাজ্যের সুশাসন জন্য আইন প্রস্তুত করণে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি কেবল লুঠ ও লড়াইয়েই নিপুণ ছিলেন এমন নহে, তিনি ব্যবস্থাপকের কার্য্যেও প্রচুর দক্ষতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতিই লেখা পড়া জানিত। এজন্য শিবজি রাজস্বসংক্রান্ত তাবৎ কার্য্যে তজ্জাতীয়দিগকেই নিযুক্ত করার নিয়ম করিলেন। কৃষকদিগের উপরে দৌরাত্ম্য এবং সরকারের প্রতি প্রবঞ্চনা নিবারণার্থও কতিপয় আইন প্রণীত হইল। সৈন্যসংগ্রহ ও তাহাদের বেতনপ্রদানের ভার রাজার আপন হস্তেই থাকিল। শিবজির আইন অনুসারে সেনারা অধিক বেতন পাইতে লাগিল। কিন্তু যুদ্ধকালে যে কিছু

লোপ্ত্র * পাওয়া যাইবে তাহাতে তাহাদের কোন স্বত্ব রহিল না; তত্তাবৎ রাজকোষে জমা হইতে লাগিল। সৈনিক কর্ম্মচারীরা, দশ সৈনিকের কর্ত্তা, বিংশতি সৈনিকের কর্ত্তা, ইত্যাদি ক্রমে ক্রমায়ত উন্নতপদে বিভক্ত হইলেন। ইহারাও সামান্য সৈনিকদিগের ন্যায় সরকার হইতে বেতন পাইতে লাগিলেন। মুসলমান সৈনিক ও সচিবদিগের মত কেহই জায়গীর পাইবেন না শিবজি নিয়ম করিয়া দিলেন।

দিল্লী হইতে শিবজির পলায়নের পর আরাঞ্জিব যে তাঁহার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার এক উদ্দেশ্য ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। অপর উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা শিবজিকে বিমোহিত করিয়া আর একবার তাঁহাকে আপন হস্তে প্রাপ্ত হন। কিন্তু শিবজি দ্বিতীয় বার প্রতারিত হইবার মনুষ্য ছিলেন না, সুতরাং সম্রাটকে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু অনধিককালমধ্যেই শিবজির ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় পাইলেন। শিবজি মোগলপতির অধিকৃত কয়েক দুর্গ হস্তগত করিয়া আর একবার সুরাট নগর লুঠ ও খান্দেশ প্রদেশে মহা উৎপাত করিলেন। এই সময়েই (১৬৭০) সুপ্রসিদ্ধ চৌথের প্রসঙ্গ প্রথম শ্রুত হয়। চৌথ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ; মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনঃ পুনঃ লুঠ প্রভৃতি দ্বারা মহা উপদ্রব আরম্ভ করায়, কোন কোন প্রদেশে তাহাদের সহিত এই নিয়ম অবধারিত হয় যে, তথাকার রাজস্বের চতুর্থ ভাগ তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে ও তাহারাও উপদ্রব হইতে

---

* লুঠ করিয়া যে কিছু পাওয়া যায় তাহাকে লোপ্ত্র কহে।

ক্ষান্ত থাকিবে। অতঃপর যেখানে যতদিন নিয়মিতরূপে চৌথ প্রদত্ত হইত, সেখানে ততদিন মহারাষ্ট্রীয়েরা কোন উপদ্রব করিত না; কিন্তু চৌথ বন্ধ হইলেই আবার উপদ্রবও আরম্ভ হইত।

১৬৭৩ খৃঃ অব্দে, শিবজির দমনের জন্য, আরাঙ্গিব দাক্ষিণাত্যে অধিকতর সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। শিবজিও সংগ্রামসজ্জা করিলেন। যুদ্ধে মোগলেরা পরাস্ত হইল। মহারাষ্ট্রীয় ও মোগলদিগের সেই প্রথম সম্মুখ-যুদ্ধ। তাহাতে শেষোক্তেরা পরাভূত হওয়ায় হতাশ্বাস, এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা জয়োল্লাসে দ্বিগুণ দর্পিত হইয়া উঠিল। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর অন্যত্র বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, আরাঙ্গিব দাক্ষিণাত্যে অধিক সৈন্য প্রেরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তথায় যুদ্ধকার্য্য যে একবারেই স্থগিত হইয়াছিল এমন নহে।

অন্যত্র যে সমস্ত বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে আফ্গানিস্তানের ঈশান-কোণ-নিবাসীদিগের সহিত সংগ্রাম সর্ব্বপ্রধান। দুই বৎসর ব্যাপিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ হয়, তদবসানে পূর্ব্বে আকবর তাহাদের বিরুদ্ধে যত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, আরাঙ্গিব তদপেক্ষা অণুমাত্রও অধিক হইতে পারিলেন না (১৬৭৫)। পরিশেষে সেই পার্ব্বতীয়দিগের সহিত একপ্রকার বন্দোবস্ত সম্পন্ন হইয়া উঠিল। স্বল্পকাল পরেই দিল্লীর সন্নিকটে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। তথায় সত্নরামী নামে এক হিন্দু সম্প্রদায় ছিল। সেই সম্প্রদায়ী লোকেরা একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন। সত্যব্রত, মিতাচার, ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতি তাঁহাদের প্রধান অনুষ্ঠান ছিল। তাঁহারা কোন প্রকার মাদক ব্যবহার করিতেন না। এই সম্প্রদায়ের এক

ব্যক্তি দিল্লীর অনতিদূরে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিল। হঠাৎ একজন পেয়াদার সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইল। ক্রমে উভয় পক্ষের মিত্রগণ আসিয়া যুটিল; দাঙ্গায় রাজকর্ম্মচারীদিগেরই অধিক অনিষ্ট ঘটিল। পরে সন্নিহিত প্রদেশের অধিবাসীরা সত্নরামীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল; এদিকে রাজকর্ম্মচারীদিগের পক্ষে কিয়দংশ রাজসৈন্য প্রেরিত হইল। সেনাদের সংখ্যা অল্প ছিল, তাহারা সহজেই পরাস্ত হইয়া পড়িল; তাহাতে সত্নরামীদিগের যশঃ বর্দ্ধিত হইল। অনন্তর আর এক দল সৈন্য আসিল, তাহারাও পরাভূত হইয়া গেল। লোকের মহা বিস্ময় উপস্থিত হইল। অনেকেই মনে করিতে লাগিল, সত্নরামীরা ইন্দ্রজাল-বলে অভেদ্যকলেবর হইয়াছে, তরবারি বা গোলা তাহাদের শরীর আহত করিতে সমর্থ নহে, পরন্তু তাহাদের হস্তস্থিত অস্ত্র, প্রহার মাত্রেই শত্রুকে যমালয় প্রেরণ করে। এরূপ বিশ্বাস হেতু রাজসেনারা আর তাহাদের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না; নিকটবর্ত্তী জমিদারেরাও তাহাদের আনুকুল্য করিতে লাগিলেন। তখন আরাঙ্গিব দেখিলেন সেই বিদ্রোহ সহজে নিবারিত হইবার নহে। তিনি বহুসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিলেন; আর ইন্দ্রজাল নিবারণের জন্য কোরান হইতে কবচ প্রভৃতি লিখিয়া সৈনিকদিগকে অঙ্গে ধারণ করাইয়া, বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সত্নরামীরা সেবারে একেবারে পরাভূত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল (১৬৭৬)।

—o—

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

আরাঙ্গিবের রাজত্বের পরিশিষ্ট।

ইতিপূর্ব্বে মোগলবংশীয় যে সমুদায় সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই, আপনাদের হইতে ভিন্নমতাবলম্বী বলিয়া, হিন্দুদিগের উপরে দৌরাত্ম্য করেন নাই। প্রত্যুত কেহ কেহ হিন্দু রাজাদিগের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে সম্বদ্ধ হইবার জন্য একান্ত উৎসুক ছিলেন। তাঁহাদের অধীনে হিন্দুমতাবলম্বীরা অনেকে অতিপ্রধান প্রধান রাজপদ প্রাপ্ত হইতেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, মহান্ আকবর, হিন্দু মুসলমানদিগের পরস্পরের প্রভেদ একবারে নিরাকৃত করিয়া, উভয় সম্প্রদায়ীকে একমত ও একমিল করিবার জন্যই যত্ন পাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ও সাজাহান তত দূর চেষ্টা পান নাই বটে, তথাপি প্রজাদিগের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বলিয়া অধিক ইতর বিশেষ করিতেন না। আরাঙ্গিব সেই সুপদ্ধতি একবারে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি স্বীয় মতের দারুণ গোঁড়া ছিলেন; সিংহাসন আরোহণের অনধিককাল পরেই, তিনি বর্ষগণনায় সৌরপ্রথার পরিবর্ত্তে চান্দ্র প্রথার পুনরুদ্ধার করেন। চান্দ্র প্রথার অপেক্ষা সৌর প্রথার বর্ষগণনায় বিস্তর সুবিধা হয়। কিন্তু উহা কোরানের বহির্ভূত এবং হিন্দুদিগের উদ্ভাবিত; এজন্যই আরাঙ্গিব তাহা রহিত করেন। তাঁহার প্রণীত অন্য অনেক নিয়মেও হিন্দুধর্ম্ম ও তদবলম্বীদিগের প্রতি প্রগাঢ় বিদ্বেষ বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। সত্নরামীদিগের

বিদ্রোহের পর তাঁহার গোঁড়ামি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি জিজিয়া নামক শুল্কের পুনর্নিয়ন করিলেন। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন সকলকেই সেই শুল্ক প্রদান করিতে হইত। তাহাতে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি রাজার বিদ্বেষ জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইত এবং উহা হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত প্রজাদিগেরও পরস্পরের বিদ্বেষ ও অসূয়ার এক প্রবল হেতু ছিল। আকবর সেই সকল বিবেচনা করিয়া, উহা রহিত করেন। আরাঙ্গিব পুনঃ প্রচলিত করায়, দিল্লীবাসী হিন্দুরা মহাগোলযোগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিল, কিন্তু অবশেষে দণ্ডভয়ে অগত্যা সম্মত হইল। এপর্য্যন্ত রজঃপূতেরা দিল্লী-পতির প্রধান অবলম্বন ছিল। তাহাদের বাহুবলে তিনি বহুল সংগ্রামে জয়লাভ করেন। কিন্তু জিজিয়া পুনঃ প্রচলিত হওয়ায়, তাহারা একবারে বক্র হইয়া উঠিল। আর, দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুরা সকলেই অন্ততঃ মনে মনে শিবজির পক্ষ (১৬৭৭) অবলম্বন করিল। ধর্ম্মভেদে প্রজাবিশেষের লাঘব গৌরব করা রাজার নিতান্ত অনুচিত। করিলে প্রায়ই রাজ্যের মঙ্গল হয় না। পরিণামে দৃষ্ট হইবে, অদূরদর্শী আরাঙ্গিব তাহা করিয়াই ভারতবর্ষে মোগল-প্রভুতা বিনাশোন্মুখ করিয়া যান।

জিজিয়ার পুনঃস্থাপনের অনতিদীর্ঘকাল পরে রাজা যশোবন্ত সিংহ গতাসু হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সম্রাট্-কার্য্যে কাবুলে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার স্ত্রী ও দুই শিশু পুত্র সঙ্গে ছিল। এক্ষণে ইহাঁরা, সম্রাটের অনুমতি বিনা, স্বজাতীয় অনুচরবর্গের সহিত স্বদেশে প্রতিগমন আরম্ভ করিলেন। দুর্গাদাস নামে সম্ভ্রান্ত রজঃপূত সকলের নেতৃস্বরূপ হইয়া, সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। আটক

নগরে সম্রাটের লোকেরা তাঁহাদিগকে রুদ্ধ করিল। তাঁহারা বলপূর্ব্বক সিন্ধুর এ পারে আসিলেন। তাহাতে আরাঙ্গিব রাগান্ধ হইয়া যশোবন্তের সন্তানদিগকে ধরিবার জন্য, সেনা প্রেরণপূর্ব্বক, তাহাদের জননীর শিবির অবরোধ করিলেন। যাহা হউক, রজঃপূতসেনানী দুর্গাদাস সমভিব্যাহারী অপরাপর মহিলাগণ ও সন্তানদিগকে স্বদেশে প্রেরণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তাহাদের মধ্যে ছদ্মবেশে যশোবন্তের রাজ্ঞী ও তাঁহার সন্তান দুইটীকেও পাঠাইয়া দিলেন। রাজ্ঞীর এক পরিচারিণী রাণী সাজিয়া শিবিরে রহিল এবং দুইটী অপর শিশু যশোবন্তের সন্তান বলিয়া ঘোষিত হইল। অনতিবিলম্বে আরাঙ্গিবের সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি রাণী ও সন্তানদিগকে দুর্গমধ্যে আনয়নের জন্য রজঃপূত-শিবিরে দূত প্রেরণ করিলেন। তখন রজঃপূতেরা দেখিলেন যদি কৃত্রিম রাণী দুর্গে প্রেরিত হন, তাহা হইলে সমুদায় চাতুরী প্রকাশ হইতে পারে এবং তদনন্তর আরাঙ্গিব অবশ্যই প্রকৃত রাণীর অনুসরণে লোক প্রেরণ করিবেন, এই বিবেচনায় তাঁহারা আরাঙ্গিবের আজ্ঞাপালনে অসম্মত হইলেন। তদনন্তর সম্রাট সেনা প্রেরণ করিলেন। রজঃপূতেরা অনেক দিন ঘোর সংগ্রাম করিল। পরে তাহাদের অধিকাংশ হত হইলে কৃত্রিম রাণী ও সন্তানগণ ধৃত হইল, কিন্তু তৎকালে প্রকৃত রাণী নিজ সন্তানগণের সহিত নিরাপদে যোধপুরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

যশোবন্তের পরিবারের প্রতি তাদৃশ অবমানকর আচরণ ও জিজিয়ার প্রচলন, এই উভয় কারণে রজঃপূতেরা প্রায় সকলেই একবাক্য হইয়া আত্মরক্ষার্থ সঙ্কল্প করিল। উদয়পুরপতি তাহাদের সেনানী হইলেন, কিন্তু

সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত ও বশীভূত করিলেন। যাহা হউক, তিনি ফিরিতে না ফিরিতেই উদয়পুরস্বামী আবার বিদ্রোহিতা করিতে লাগিলেন। তাহাতে আরাঞ্জিব বৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া বহুল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সম্রাটের আদেশমত সেনারা উদয়পুরের বাক্পথাতীত অনিষ্ট বিধান করিতে লাগিল। রাণা অর্ব্বলী পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন; মোগল সেনারা তাঁহার আসার রোধ করিল। তাহাদের দৌরাত্ম্যে গ্রামসকল ভগ্ন ও ভস্মীভূত, ফলী বৃক্ষ সকল বিচ্ছিন্ন এবং স্ত্রী ও শিশুগণ বন্দীকৃত হইতে লাগিল। এ দিকে রজঃপূতেরাও বৈরনির্যাতনে নিতান্ত নিরস্ত ছিল না। তাহারা সময়ে সময়ে পর্ব্বত হইতে বিনির্গত হইয়া শক্র-সেনাদিগকে আক্রমণ ও অনেককে যমালয়ে প্রেরণ করে। অবশেষে, "দিল্লীর সিংহাসন-প্রাপ্তি বিষয়ে আনুকূল্য করিব" এই প্রলোভন দ্বারা দুর্গাদাস সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র আকবরকে হস্তগত করিলেন। তখন আরাঞ্জিব অনধিক সহস্র সেনার সহিত আজমীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আকবর আপনার অধীন ৭০,০০০ যোদ্ধার সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সম্রাট বিবেচনা করিয়া দেখিলেন আকবরের সেনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্রোহী হয় নাই, কেবল কুমারের প্রভাব ও প্রবর্ত্তনাতেই তাহারা বিদ্রোহ-পদবীতে পদার্পণ করিয়াছে। অতএব সম্রাট সেনাদিগের উপর ক্রোধ না করিয়া তাহাদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহারা প্রায় সকলেই তাঁহার পক্ষ হইল। তখন রজঃপূতেরা আকবরকে অসহায় দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কেবল দুর্গাদাস সেই কুমারের

সমভিব্যাহারে রহিলেন। আকবর অগত্যা পলায়নপর হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণাগত হইলেন (১৬৭১)।

এদিকে রজঃপুতদিগের সহিত সংগ্রাম চলিতে লাগিল, সেই সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই বিপুল অনিষ্ট ঘটিয়া ছিল। অবশেষে আরাঙ্গিব জিজিয়ার কোন প্রসঙ্গ না করিয়া, উদয়পুরপতির পক্ষে অনুকূল গণে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন; তাহাতে তৎকালে রজঃপুতদিগের সহিত সংগ্রামের কথঞ্চিৎ অবসান হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের মত প্রণয় ও সদ্ভাব আর পুনঃস্থাপিত হইল না। আরাঙ্গিবের অবশিষ্ট আয়ুষ্কালে মোগল ও রজঃপুত-দিগের মধ্যে বারংবার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল।

যৎকালে আরাঙ্গিব আর্য্যাবর্ত্তে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে দাক্ষিণাত্যে বিজয়পুরপতি পরলোক গমন করায় তদীয় রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ উপস্থিত হয়। শিবজি সেই সুযোগ পাইয়া আপনার প্রভুতা বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হন। সমস্ত কঙ্কণ এবং সহ্যাদ্রির পশ্চিমেও অনেক ভূভাগ তাঁহার অধিকৃত হইয়া উঠে। তদনন্তর ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে শিবজি পুনরায় মহাড়ম্বরে মুকুট ধারণ এবং পারস্য শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত অনুযায়ী শব্দ-পরম্পরায় আপন কর্ম্মচারীদিগের উপাধি প্রদান করেন। আর মুসলমান ধর্ম্মে আরাঙ্গিবের যত দূর গোঁড়ামি ছিল, শিবজিও সেই পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

পর বৎসর (১৬৭৫) শিবজির প্রেরিত সেনারা, নর্ম্মদা পার হইয়া, মোগলদিগের অধিকারে আসিয়া, গুজরাটের কিয়দংশ পর্য্যন্ত লুঠ করিল। তদনন্তর শিবজি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে অতঃপর মোগলেরা ত্রস্ত হইয়া

কিছুকাল স্তব্ধ থাকিবে, তাঁহার রাজ্যে কোনরূপ উৎপাত করিতে সাহস করিবে না। সেই অবসরে তিনি মহীসুর দেশে যাইয়া পৈতৃক জায়গীর অধিকার করিবার বাসনা করিলেন। তদানীং তাঁহার কনিষ্ঠ বঙ্কজি সেই ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। শিবজি অগ্রে গোলকুণ্ডাপতির সহিত মৈত্র করিলেন। পরে ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে ৩০,০০০ অশ্ব ও ৪০,০০০ পদাতিকের সহিত মহীসুরে যাইয়া সমুদায় জায়গীর অধিকার করিয়া উঠিলেন। অনন্তর তাহার রাজস্বের অর্দ্ধেক ভাগ আপনি পাইবেন এই পণে ভ্রাতার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, অষ্টাদস মাস অনুপস্থিতির পর পুনরায় রায়গড়ে উত্তীর্ণ হইলেন (১৬৭৮)। রায়গড় পুনার সন্নিহিত, ঐ নগরেই শিবজি সচরাচর অবস্থিতি করিতেন।

পর বৎসর মোগল সম্রাটের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দক্ষ সেনানী দিলির আসিয়া তদানীন্তন বিজয়পুর-পতিকে আক্রমণ করিলেন। তদীয় রাজধানী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। তিনি শিবজির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ; শিবজিও সাহায্যদানে সম্মত হইলেন; কিন্তু মোগলদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে আপনাকে অসমকক্ষ ভাবিয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ মোগলদিগের রাজ্য লুঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও মোগলেরা বিজয়পুরের অবরোধ পরিত্যাগ না করায়, অবশেষে শিবজি সেই অবরোধক সৈন্যের রসদ-রোধের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে তিনি এমনি কৃতকার্য্য হইলেন যে দিলিরকে অগত্যা নগরের অবরোধ পরিত্যাগ করিতে হইল। এই সাহায্য জন্য বিজয়পুরপতি শিবজিকে কিয়ৎ পরিমাণে ভূসম্পত্তি পুরস্কার দেন এবং

মহীশুরের জায়গীরের উপর তাঁহার নিজের যে কিছু দাওয়া ছিল সমস্ত পরিত্যাগ করেন। শিবজি সেই পুরস্কার পাইয়াই তুষ্ট হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার আরো কোন অভিপ্রায়-সাধন মানস ছিল, তাহা প্রকাশ হয় নাই। কারণ, পর বৎসর, তিপ্পান্ন বর্ষ বয়সে, তাঁহার আয়ুষ্কাল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল (১৬৮০)।

শিবজি অতিশয় দক্ষ, উজ্জ্বল ও অনলস পুরুষ ছিলেন; সেই সকল গুণে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কেহই তাঁহার তুল্য হন নাই। বস্তুতঃ কহিতে হইলে তিনি দস্যুদলের সরদারী হইতে, ক্রমে ক্রমে আপনার বুদ্ধি-কৌশলে, এমন প্রতাপান্বিত রাজা হইয়া উঠেন যে, অতি প্রাচীন কালে ভিন্ন তাঁহার সমান প্রভাবশালী হিন্দু দেখা যায় নাই। তিনি সেনানীর কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ ও রাজনীতি-বিষয়েও অতিশয় বিশারদ ছিলেন। গোঁড়ামি ও অতিবুদ্ধিতানিবন্ধন আরাঙ্গিব রাজ্যশাসনবিষয়ে যে সকল ভ্রমে পতিত হন, শিবজি তৎসমুদায়ের সুযোগেই আপনার রাজ্য উপার্জ্জন করিয়া লন। শিবজি স্বভাবতঃ ক্রূর ছিলেন না; যুদ্ধ হেতু লোকের যে সমস্ত ক্লেশ উপস্থিত হয় তত্তাবতের লাঘব সম্পাদন মানসে তিনি অনেক সদয় নিয়মের ব্যবস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শিবজির পরলোক গমন সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজি, নিজের দুশ্চরিত্রতা দোষে, পিতার আদেশক্রমে কারারুদ্ধ ছিলেন। শম্ভুজির স্বভাব অতীব প্রচণ্ড ছিল, এজন্য কাহারই ইচ্ছা ছিল না যে তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হন। আর এমন জনরবও হইয়া উঠিল যে মৃত্যু-সময়ে শিবজি দ্বিতীয় পুত্র রাজারামকে উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তখন রাজারামের বয়স দশ

বৎসর মাত্র; কিন্তু শম্ভুজি প্রাপ্তবয়স্ক। শেষোক্ত কুমার সেনাদিগকে হস্তগত করিয়া, তাহাদের সাহায্যে রাজ-ছত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক রায়গড়ে উত্তীর্ণ হইলেন। আসিয়াই রাজারামের জননীকে নিদারুণ যাতনার সহিত সংহার করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-জাতীয় ভিন্ন অন্যান্য পিতৃমন্ত্রী-দিগকেও সেই পথে পাঠাইলেন। পরে রাজারাম ও তৎ-পক্ষীয় ব্রাহ্মণ সচিবদিগকে কারারুদ্ধ করিলেন। শম্ভু এরূপ গর্হিত অনুষ্ঠানপরম্পরা দ্বারা সিংহাসনে দৃঢ়াসীন হইয়া, পরে একান্ত ব্যসনাসক্ত হইয়া উঠিলেন। কলুসা নামে এক হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল। সে তাঁহার কুক্রিয়াসক্তি প্রদীপ্ত করিত এবং স্বয়ং বিলক্ষণ বাক্‌চতুর ছিল, এজন্যই তাহার প্রতি শম্ভুর সন্তোষ জন্মে। এক্ষণে এই ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রী হইল। অনধিক-কাল-মধ্যেই শম্ভু, পিতার আহৃত তাবৎ সম্পত্তি বিস-র্জ্জন দিয়া করবৃদ্ধি দ্বারা প্রকৃতিকুলের অসন্তোস উত্তে-জিত করিলেন। সেনারা নিয়মিত ভৃতির অভাবে যুদ্ধের তাবৎ লোপ্ত্র আত্মসাৎ করিতে লাগিল এবং তদবধি সেনাদিগের বেতন-সংক্রান্ত শিবজির সমুদায় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রহিত হইল; মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকেরা লুঠ করিতেই একান্ত আসক্ত হইয়া উঠিল।

শম্ভুজি বর্ণিত প্রকারে শিবজির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতে ছিলেন, এদিকে আরাঞ্জিব উদয়পুরপতির সহিত সন্ধি করিয়া প্রাপ্তাবসর হইয়া সমস্ত দাক্ষিণাত্য আত্মসাৎ করিবার মানসে সেই ভূভাগে গমন করিলেন। ১৬৮৩খৃঃঅব্দে তিনি প্রথমতঃ বুরানপুর, তদনন্তর ঔরঙ্গা-বাদে উপস্থিত হইলেন। উভয়স্থানেই রাজসংক্রান্ত বন্দো বস্ত, বিশেষতঃ জিজিয়া আদায় জন্য, কিয়ৎকাল অব-

স্থিতি করিলেন। বুরানপুরে অবস্থিতি কালে আরাঙ্গিব কঙ্কণ দেশ লুঠ করিবার জন্য, কুমার মোয়াজিমকে তথায় প্রেরণ করেন। মোয়াজিম কঙ্কণের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কেহই তাঁহার প্রতিরোধ করিল না। কিন্তু দেশের জল বায়ুর দোষ ও আহার সামগ্রীর অভাবে তাঁহার সমস্ত অশ্ব ও বলদ মরিয়া গেল; সৈনিকেরা অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল। অবশেষে মোয়াজিম কঙ্কণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সহ্যাদ্রির অধিত্যকায় অধিরোহণ করিলেন। তথায় মহামারী উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার অধিকাংশ যোদ্ধা নিধন প্রাপ্ত হইল। অতঃপর সম্রাট্ বিজয়পুরের আক্রমণ সঙ্কল্প করিলেন। তজ্জন্য তিনি স্বয়ং অহমদনগরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং আজ্ঞা করিলেন, পশ্চিম দিক্ হইতে মোয়াজিম এবং পূর্ব্ব দিক্ হইতে কুমার আজিম যাইয়া, দুই জনেই যুগপৎ বিজয়পুর আক্রমণ করুন। কিন্তু তখন পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে মোয়াজিমের সঙ্গে অধিক সৈন্য না থাকায়, তিনি সেই আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। আজিম দেখিলেন, যে তিনি একাকী কিছুই করিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনিও নিবৃত্ত হইলেন। এদিকে কঙ্কণ আক্রমণ হেতুক ক্রোধে শম্ভুজি, নিঃশব্দে সম্রাটের পশ্চাদ্বর্ত্তী ভূভাগে যাইয়া, বুরানপুর লুঠ ও অগ্নিময় করিয়া স্বস্থানে পরাবর্ত্তন করিলেন।

আজিম বিজয়পুর-গ্রহণে অসমর্থ হইলে পর, সম্রাট্ স্বয়ং সেই নগরীর বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। তখন শম্ভুজি তাঁহাকে দক্ষিণ প্রদেশে একান্ত ব্যাপৃত দেখিয়া দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিম ভাগ লুঠ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, পরে সেই অভীষ্ট সম্পন্ন করিয়া স্বস্থানে প্রতিগত

হইলেন। ইতিপূর্ব্বে শম্ভু পরস্পর সহায়তার পণে গোলকুণ্ডারাজের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। আরাঞ্জিব সেই ব্যাপার অবগত হইবামাত্র, গোলকুণ্ডাপতির সহিত বিরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিজয়পুরজয়ের লালসা আপাততঃ স্থগিত করিয়া, সমস্ত প্রযত্নে গোলকুণ্ডারাজের বিনাশ-সাধন সঙ্কল্প করিলেন (১৬৮৬)। গোলকুণ্ডাপতি, মদনপান্থ নামক অতিদক্ষ এক ব্রাহ্মণকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিধর্ম্মী মন্ত্রী হওয়ায়, রাজার সমস্ত মুসলমান কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য আরাঞ্জিবের সৈন্য পঁহুছিলে গোলকুণ্ডারাজের প্রধান প্রধান সেনানীর অধিকাংশই সৈন্যসমেত শত্রুদলে মিলিত হইল। রাজধানীর অভ্যন্তরে দাঙ্গা উপস্থিত হইয়া মদনপান্থ হত হইলেন। তখন রাজা অগত্যা গোলকুণ্ডার দুর্গে পলায়ন করিলেন। তাঁহার রাজধানী হায়দরাবাদ শত্রুহস্তে পতিত হইল। তাহারা সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইল। অবশেষে রাজা ধন দ্বারা সম্রাটের নিকট হইতে সন্ধি ক্রয় করিলেন। তখন সম্রাট্‌-সেনারা আবার বিজয়পুরের বিরুদ্ধে নীত হইল। কিয়ৎকাল অবরোধ সহনের পর তন্নগর বশীভূত হইল এবং তত্রত্য রাজপাট একবারে উঠিয়া গেল। অতঃপর আরাঞ্জিব দারুণ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক হৃতসর্ব্বস্ব ও নিরপরাধ গোলকুণ্ডারাজের সহিত সন্ধিভঙ্গ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে উৎকোচ দ্বারা আরাঞ্জিব তাঁহার কর্ম্মচারী ও সেনাদিগকে বশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজা অপরিমিত দক্ষতার সহিত সাত মাস দুর্গ রক্ষা করিলেন। অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা-নিবন্ধন তাহাও শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে হইল। এরূপে গোলকুণ্ডা রাজ্যও উচ্ছিন্ন হইল।

কিছুকাল পরে আরাঙ্গিব, মহীসুর দেশে মহারাষ্ট্রীয়-রাজ্যের জায়গীরও আত্মসাৎ করিয়া, কুমারিকা পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করিলেন। কিন্তু সেই রাজ্য-বিস্তৃতি, শোথরোগে শরীর স্থূল হওয়ার ন্যায়, নিরবচ্ছিন্ন অন্তঃসারবিহীন ছিল, এবং যে মাত্র স্ফীতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইল, অমনি নাশ-কবলে পতনোন্মুখ হইয়া "অভ্যুত্থানং হি পতনায়" এই সাধু বাক্যের প্রমাণাস্পদ হইয়া উঠিল।

এতাবৎকাল শম্ভুজি আলস্য ও ব্যসনে নিমগ্ন হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছিলেন। একদা তিনি কতিপয় সমভিব্যাহারী লইয়া কঙ্কণ দেশে এক অভিমত আলয়ে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক মোগল সেনানী কতিপয় অতিদক্ষ যোদ্ধার সহিত অকস্মাৎ ধাবমান হইয়া সেই আলয় অবরোধ করিলেন। তৎকালে শম্ভুজি মাদকসেবনে প্রমত্ত হইয়াছিলেন। তিনি সহজেই রুদ্ধ হইলেন। কলুসাও তাঁহার উদ্ধার-চেষ্টা পাওয়ায় আহত ও রুদ্ধ হইল। উভয়ে সম্রাট-সকাশে প্রেরিত হইলেন। তখন শম্ভুজির মোহ বিগত হইল। তিনি আপনাকে নিতান্ত অবমানিত দেখিয়া জীবন পরিত্যাগে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে সম্রাট তাঁহাকে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কহিলেন। তচ্ছ্রবণে শম্ভু বিদ্রূপ করিয়া পাঠাইলেন, তাহাতে গোঁড়া আরাঙ্গিবের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি অতিশয় যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয় রাজার শিরশ্ছেদন আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার সহিত কলুসাও হত হইল (১৬৮৯)।

শম্ভুজির মৃত্যু হইলে, মহারাষ্ট্রীয় অমাত্যগণ সাহু নামে তাঁহার এক শিশুকে রাজ্যাধিকারী বলিয়া অঙ্গী-

কার করিলেন। সাহের বয়ঃসন্ধি পর্য্যন্ত শম্ভুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রাজকার্য্যনির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইলেন। এদিকে এক দল মোগল-সৈন্য আসিয়া রায়গড় আক্রমণ করিল, এবং কোন কোন মহারাষ্ট্রীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই দুর্গ বিজিত হইলে, সাহ শত্রুহস্তে পতিত হইলেন। তখন অমাত্যদিগের পরামর্শানুসারে রাজারাম কর্ণাটের অন্তর্গত জিঞ্জি নামক সুদৃঢ় দুর্গে যাত্রা করিয়া, ছদ্মবেশে তথায় উত্তীর্ণ হইয়া, রাজ উপাধি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর আরাঞ্জিব জিঞ্জি অধিকারের জন্য জলফকির নামে এক প্রধান সেনানীকে প্রেরণ করিলেন। সেনানী যাইয়া জিঞ্জি অবরোধ করিলেন, কিন্তু দেখিলেন সঙ্গে যত সেনা ছিল তদপেক্ষা অধিক না আনিলে দুর্গ অধিকৃত হইবে না। অতিরিক্ত সৈন্যের জন্য তিনি আরাঞ্জিবের নিকট লোক পাঠাইলেন। কিন্তু সম্রাটের তখন আর সৈন্য পাঠাইবার যো ছিল না (১৬৯২)।

অতঃপর মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে প্রকৃত রূপে সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কর্ণাট হইতে রাজারাম, সন্তুজি ও দনজি নামে দুই প্রধান সরদারকে, মহারাষ্ট্রীয় দেশে প্রেরণ করিলেন। উভয়েই অনুমত হইলেন যেখানে সাধ্য লুঠ ও চৌথ আদায় করিবেন। পূর্ব্বে গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের রাজসরকারে যে সমস্ত সৈনিক পুরুষ নিযুক্ত ছিল, তন্মধ্যে বহুসংখ্যা আসিয়া, এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত মিলিত হইল এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্য, লুঠ গৃহদাহ প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিল।

মোগল ও মহারাষ্ট্রীয় অশ্বসেনারা দেখিতে পরস্পর অতিশয় বিসদৃশ ছিল। প্রথমোক্তেরা বিস্তৃত পর্য্যাণ ও নানাভরণসমন্বিত অন্যান্য সজ্জা-শোভিত দীর্ঘকায় স্থূল

ঘোটকে আরোহণ করিত। অশ্বারোহীদিগের শরীর বর্ম্মে সংরক্ষিত থাকিত। তাহারা কোনরূপ শাসন বা নিয়মিত শৃঙ্খলার পরতন্ত্র হইয়া চলিত না; তাহারা অতিশয় বিস্তৃত শিবিরে বাস করিত, সঙ্গে পরিবার, পরিচারক ও অসংখ্য বণিক অনুসরণ করিত। তাহারা যেখানে যাইত, অল্পকালমধ্যেই তত্রত্য তাবৎ আহার-সামগ্রী নিঃশেষ করিয়া উঠিত। মোগলদিগের সেনাধ্যক্ষেরা একণে আর পূর্ব্বের মত দক্ষ ও কষ্টসহ ছিল না। জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের রাজত্বকাল অবধি তাহারা ক্রমে ক্রমে বিলাসী ও তন্নিবন্ধন অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনারা যেমন খর্ব্বকায়, অনলস ও কষ্টসহ, তেমনি ক্ষুদ্র, অনলস ও বিলক্ষণ সুশিক্ষিত ঘোটকে আরোহণ করিত। অশ্বের সজ্জার মধ্যে পৃষ্ঠে একটী বালিশ ও তদুপরি একখান কম্বল পাট করা থাকিত। অশ্বারোহীদিগের পরিচ্ছদ লঘু ও অতিসামান্য, আহার-সামগ্রীও তদনুরূপ সুলভ ছিল। এক তরবারি, এক বন্দুক, অথবা আট নয় হাত দীর্ঘ এক বাঁশের বল্লব, অশ্বারোহীরা এই তিন প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিত। তাহারা রাত্রিকালে ভূমিতে বল্লব প্রোত করিয়া, অশ্বের বল্গা বাহুতে বন্ধন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইত এবং শত্রুর সমাগমমাত্র নিমেষমধ্যে আরূঢ় হইত। মহারাষ্ট্রীয়েরা কোনরূপেই মোগল অশ্বারোহীদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিত না। তাহাদের সমাগমে ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িত। পরে যে মাত্র দেখিত তাহারা অনুসরণে আসিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিত এবং নানাপ্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। ফলতঃ রণকুশলতায় তাহারা

বিলক্ষণ কৃতহস্ত ছিল। শত্রুসেনার ব্যয়ের জন্য অর্থ যাই-তেছে একথা একবার কর্ণগোচর হইলেই, যে কোন রূপে হউক, মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহা আত্মসাৎ না করিয়া ক্ষান্ত হইত না। লুঠ পাইবার প্রত্যাশা থাকিলে তাহাদের অধ্যবসায় ও যত্নের ইয়ত্তা থাকিত না। যে কোন সময়ে শত্রুসৈন্যের কিয়দংশ বশীভূত করিতে পারিত, অমনি সামান্য সৈনিকদিগকে উলঙ্গ করিয়া, পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিত। প্রধান-পদাভিষিক্তদিগকে রুদ্ধ রাখিত এবং উপযুক্ত নিষ্ক্রয় বিনা মোচন করিত না। ফলতঃ শত্রুর ধনসম্পত্তি লুঠ করাই মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষণে আর তাহাদের সৈনিকেরা শিবজির সময়ের মত নিয়-মিত বেতন পাইত না। যে যাহা লুঠ করিত, তাহাই তাহার নিজস্ব হইত। কেবল চৌথের টাকামাত্র সরকারে জমা করিয়া দিত।

সন্তুজি ও দনজি ক্রমশঃ জলফকিরের সৈন্যের পার্শ্ব-দেশে উত্তীর্ণ হইয়া, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে তাহাদের খাদ্য-দ্রব্য আসিবার পথ রোধ করিলেন। অধিককাল সেইরূপ থাকিলে সেনাগণ আহারাভাবেই মরিবে এই আশঙ্কায় আরাঙ্গিব যত শীঘ্র সম্ভব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সংগ্রামের শেষ করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইলেন। তদ-নুসারে অচিরকাল-মধ্যে জিঞ্জি-জয়করণ-মানসে কুমার কামবক্সের অধীনে আর এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কুমারের প্রতি কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পিত হওয়াতে জল-ফকির অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, এবং তন্নিবন্ধন অবরুদ্ধ-দিগের সন্ধিপ্রস্তাবনায় কর্ণপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে কুমার দেখিলেন বস্তুতঃ জলফকিরই সর্ব্বেসর্ব্বা, স্বয়ং

নামে মাত্র কর্ত্তা। তাহাতে তিনিও বিরক্ত হইয়া দনজির সন্ধিপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন*। তৎকালে দনজি, বিংশতি সহস্র অশ্বারোহীর সহিত কর্ণাটে প্রবিষ্ট হইয়া, অবরোধক মোগল সেনার অনিষ্ট-সম্পাদন-চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। এদিকে সেই মোগল-সেনার অধ্যক্ষদিগের পরস্পর অকৌশল হেতু, তাঁহাদিগকে জিঞ্জির অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া ওয়ান্দিওয়াস নগরে যাইয়া সম্রাটের আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতে হইল (১৬৯৭)। তথাপি সময়ে সময়ে মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে জলফকির দেখিলেন যে তাঁহাকে হয় জিঞ্জি অধিকার করিতে, নয় অবমাননার সহিত কর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে। এরূপ হৃদয়ঙ্গম হওয়ায়, তিনি সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত পুনর্ব্বার রণভূমে অবতীর্ণ হইলেন, এবং অল্পকালমধ্যেই জিঞ্জি অধিকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই রাজারাম তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন (১৬৯৮)।

অতঃপর মহারাষ্ট্রীয় সেনানীদিগের আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। রাজারাম দনজির পক্ষ অবলম্বন করিলেন, সন্তুজি আপন সেনাদিগের উদ্দামতা-নিবারণে প্রয়াস পাওয়ায়, তাহারা চক্রান্ত করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজারাম সিতারায়

*আরাঙ্গিব অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। পাছে অধিক সৈন্যের উপরে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পাইয়া কোন সেনানী বিদ্রোহী হন, এই আশঙ্কায়, তিনি প্রায়ই এক সেনানীর উপরে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পণ করিতেন না। তিনি প্রায়ই প্রত্যেক দলে দুই জন প্রধান সেনানী নিযুক্ত করিতেন। এক জনের হস্তে প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব থাকিত, অপর জন নামে মাত্র কর্ত্তা থাকিতেন। এইরূপ বন্দোবস্তে সেনানীরা অনেক সময়েই কায়-মনে স্বামিকার্য্যসাধনে যত্ন করিতেন না।

বাসস্থান নিরূপিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি স্বয়ং সেনানীত্ব গ্রহণ করিলেন। এবারে যত মহারাষ্ট্রীয় সেনা একত্র হইয়াছিল, পূর্ব্বে কখনই তত দেখা যায় নাই। রাজারাম তাহাদিগকে লইয়া দাক্ষিণাত্যের সমগ্র উত্তর ভাগে লুঠ ও চৌথ আদায় করিতে লাগিলেন। এপর্য্যন্ত আরাঙ্গিব স্বয়ং এক স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, তথা হইতে নানা দিকে সৈন্য প্রেরণ করিয়াই, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। অধুনা সে প্রণালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আপনার সমস্ত সৈন্য দুই দলে বিভক্ত করিয়া এক দল লইয়া স্বয়ং মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুর্গ-পরম্পরা-আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। জলফকিরকে অবশিষ্ট দলের সেনানী করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। ১৭০০ খৃঃ অব্দে কয়েক মাস অবরোধের পর, সিতারা সম্রাটের বশীভূত হইল।

এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজারাম গতাসু হন। তাঁহার পুত্র শিবজি* পিতৃপদ উত্তরাধিকার করেন, কিন্তু তখন তাঁহার বয়স অল্প ছিল, এজন্য তাঁহার মাতা তারা বাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজারামের মৃত্যুতেও যুদ্ধের বিরাম হইল না। আরাঙ্গিব মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুর্গ-পরম্পরার অধিকার সম্পাদনে ব্যাপৃত রহিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরাও অসম-সাহসে অনেক দুর্গের রক্ষার প্রয়াস পাইতে লাগিল। যাহা হউক, চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে, প্রধান প্রধান সমুদায়ই সম্রাটের হস্তগত হইল। কিন্তু তখনও যুদ্ধের অবসান হওয়ার কোন আকারই দৃষ্ট হইল না। এদিকে জলফকিরের সেনারা ক্রমশঃ ক্লান্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল; মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের

* ইহাকে দ্বিতীয় শিবজি কহে।

সংখ্যা বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছিল। শেষোক্তেরা লুঠ প্রভৃতি দ্বারা সমুদায় দাক্ষিণাত্য মরুতুল্য করিয়া অবশেষে মালব ও গুর্জ্জরে প্রবিষ্ট হইল। ক্রমশঃ তাহারা সম্রাট কর্ত্তৃক হৃত দুর্গসকলেরও পুনরধিকার আরম্ভ করিল এবং ছায়ার ন্যায় সম্রাটসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাহাদের ভক্ষ্যাগমের ব্যাঘাত ও অন্যান্য নানা উপদ্রব করিতে লাগিল। অবশেষে এমন ঘটিয়া উঠিল যে তাহাদের ভয়ে মোগলেরা কেহই একাকী শিবির হইতে একপদ যাইতে পারিত না। যখন তাহাদের বিরুদ্ধে সম্রাটের সমস্ত সৈন্য চালিত হইত, তখন তাহারা অন্তর্দ্ধান করিত। পরে যখন মোগলেরা বৃথা অটাট্যা দ্বারা শ্রান্ত হইয়া পড়িত, তখন কোন নগরে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া জানাইত যে, মহারাষ্ট্রীয় সেনা তথায় যাইয়া লুঠ ও পরে গ্রামদাহ করিতেছে। অধুনা সম্রাটের কোষও শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। সেনাদিগকে নিয়মিত সময়ে নির্দ্ধারিত বেতন দেওয়া অসাধ্য হইতে লাগিল। আর তখনও রজঃপুতদিগের সহিত সংগ্রাম চলিতেছিল এবং আগরার সন্নিকর্ষ-বাসী জাতদিগের বিরুদ্ধেও সেনা-নিয়োগ আবশ্যক হইয়া উঠিল। ঈদৃশ অবস্থায় সম্রাট মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। শেষোক্তেরা তাঁহার তদানীন্তন দুর্দ্দশার বিবরণ বিলক্ষণ অবগত ছিল; তাহারা অসঙ্গত পণ চাহিতে লাগিল। অতঃপর সম্রাট দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া অহমদনগরে আসিলেন, তখনও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার সেনাদিগকে লণ্ডভণ্ড করিতে ক্ষান্ত হইল না। বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে আরাঙ্গিব হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে অহমদনগর হইতে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সঙ্কল্পে বিনির্গত হইয়াছিলেন; অধুনা

১৭০৭ খৃঃ অব্দে, উননবতি বর্ষ বয়সে, সেই নগরেই নৈরাশ্যম্লান-হৃদয়ে তাঁহার আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হইল।

আরাঞ্জিবের চরিত্রের যথাযথ বিবরণ বর্ণন করা অতীব দুঃসাধ্য। তিনি সাহসী, অধ্যবসায়ী ও দক্ষ ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারই রাজত্ব অবধি ভারতবর্ষে মোগল-প্রভুতার বিনাশ আরম্ভ হয়। কালে আপনাহইতেই মোগলেরা লয় পাইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আরাঞ্জিবের চরিত্রই সেই লয়প্রাপ্তির প্রধান সাধন বলিতে হইবে। তাঁহার অনুচিত গোঁড়ামি ও দৌরাত্ম্য হেতুই হিন্দুরা তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করে এবং তজ্জন্যই মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রবল হইয়া উঠে। তিনি সকলকেই সন্দেহ করিতেন, কাহারও প্রতিই তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল না, এজন্য তাঁহার প্রতিও কোন অমাত্যের অনুরাগ দেখা যায় নাই। এমন কি তাঁহার পুত্রেরাও মনে মনে তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতেন না। যাহা হউক, আরাঞ্জিব যেমন সময়ে রাজা হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আকবরের সদৃশ গুণসম্পন্ন হইলেও, এক দিকে মহারাষ্ট্রীয়দের, অন্য দিকে পারস্য ও কাবুলের অধিবাসীদিগের আক্রমণ হইতে, মোগল-সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

ভারতবর্ষের মুসলমানেরা আরাঞ্জিবের যাদৃশ প্রশংসা করেন, আকবর ও বাবরের তাদৃশ প্রশংসা করেন না। বাস্তবিকও তাঁহার অনেক প্রশংসনীয় গুণ ছিল। তিনি শিল্প ও পাণ্ডিত্যের উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন। তিনি অনেক বিদ্যালয় ও হর্ম্ম্যের স্থাপন করেন। বিচার বিষয়ে তাঁহার কিছুই পক্ষপাত ছিল না। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, অনধিক চারি দণ্ড বেলার মধ্যে, সভামণ্ডপে আসীন হইতেন। তথায় সকল প্রজাই যাইতে

পারিত। তিনি সকলেরই অভিযোগে কর্ণপাত করিতেন। কোন দরিদ্র ব্যক্তি, বিচারার্থী হইয়া, সভায় আসিয়া যতক্ষণ আবদ্ধ থাকিত, ততক্ষণ কর্ম্ম করিলে সে যাহা উপার্জ্জন করিতে পারিত, সম্রাট তাহাকে তদুপযুক্ত অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। আরাঙ্গিব বিলক্ষণ দাতৃত্বপ্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহার সভায় প্রচুর সমৃদ্ধি ও আড়ম্বর দৃষ্ট হইত। যাহা হউক, তিনি যেরূপ প্রতারক, পরস্বাপহারক ও মনুষ্যঘাতক ছিলেন, তাহাতে প্রাগুক্ত সদ্গুণাবলী সত্ত্বেও তাঁহাকে ভারতবর্ষের এক প্রধান উৎপাত বলিয়াই উল্লেখ করিতে হয়। আরাঙ্গিব পিতার প্রতি যেরূপ অনুচিত ব্যবহার করেন, তজ্জন্য তিনি যে বিশেষ অনুতাপিত হইয়াছিলেন, তাঁহার যে সকল লিখন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদায় দ্বারা তাহার কিছুই জানা যায় না। কিন্তু জীবদ্দশায় সময়ে সময়ে সেই অনুতাপ প্রকাশ পাইত, এবং তাঁহার নিয়ত এই আশঙ্কা ছিল সাজাহানের প্রতি তিনি যাদৃশ আচরণ করিয়াছিলেন, নিজ পুত্রেরাও তাঁহার প্রতি তদনুরূপ করিবেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আরাঙ্গিবের উত্তরাধিকারিগণ।

পরলোকযাত্রাসময়ে আরাঙ্গিব নির্দ্দেশ করিয়া যান যে তাঁহার তিন পুত্র সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া লইবেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র আজিম সেই নির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়া আপনাকে সমগ্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎকালে জ্যেষ্ঠপুত্র মোয়াজিম কাবুলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠতা-হেতু আপনাকেই প্রকৃত উত্ত-

রাধিকারী জানিয়া তিনিও রাজমুকুট ধারণ এবং বাহাদুর সাহা এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতাদিগের পরস্পর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে আজিম ও তাঁহার দুই প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র হত এবং অতি অল্পবয়স্ক অবশিষ্ট পুত্র বন্দীভূত হইলেন। তদনন্তর আরাঙ্গিবের তৃতীয় পুত্র কামবক্স বাহাদুরের অধীনতা অস্বীকার করিলেন। তাহাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না। সে বারেও বাহাদুর জয় এবং বিপক্ষ ভ্রাতা নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, শম্ভুজির পুত্র সাহ মোগলদিগের নিকটে বন্দী হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে মহারাষ্ট্রীয়েরা সকলেই, রাজারাম ও তদনন্তর তদীয় পুত্র দ্বিতীয় শিবজির রাজত্ব স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সাহ যে রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী তাহা অনেকের স্মরণ ও অবধারণ ছিল। অতঃপর সাহ রাজ্য-প্রার্থী হইলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া কুমার আজিম, বাহাদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে, সাহকে মোচন করিয়াছিলেন। আর প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যদি তিনি মহারাষ্ট্রে আপনার স্বত্ব সমর্থন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অনুকূল নিয়মে সন্ধি করিবেন। সাহ উপস্থিত হইবামাত্র মহারাষ্ট্রীয়েরা দুই দলে বিভক্ত হইল। এদিকে বাহাদুর সাহা প্রথমতঃ আজিমকে, পরে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া কামবক্সকেও নিহত করিয়া, দিল্লী-সাম্রাজ্যের অবিসম্বাদিত অধীশ্বর হইলেন। অনন্তর বাহাদুর দেখিলেন মহারাষ্ট্রে চরমে সাহর পক্ষই প্রবল হইবে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত বিবাদের অবসান হয় ইহা তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। এজন্য দাক্ষিণাত্যে বাহাদুরের

নিযুক্ত, তদানীন্তন প্রধান সচিব দাউদ খাঁ, সাহব সহিত এই নিয়মে সন্ধি করিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাঞ্ছিত চৌথ * তাঁহাকেই প্রদত্ত হইবে· কিন্তু মোগলেরাই উহা আদায় করিয়া দিবে, মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনারা আদায় করা হইতে ক্ষান্ত থাকিবে।

শান্তির পুনঃস্থাপন করাই বাহাদুরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তজ্জন্য তিনি রজঃপূতদিগেরও সহিত তাহাদের পক্ষে অনুকূল নিয়মে সন্ধি করিলেন। তিনি সৈনিক-কার্য্যে অপটু বা অনুদ্যুক্ত ছিলেন এমন নহে। অন-ধিককালবিলম্বেই এক অভিনব শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করিতে হইল।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেকেন্দর লোডীর রাজত্বসময়ে নানক-নামক এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হন। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ীদিগকে এক-ধর্ম্মাক্রান্ত করিবার নিমিত্ত এক অভিনব মতের উদ্ভাবন করেন। নানক একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বর মানিতেন এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলা-পের কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার শিষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শিষ্যেরা শিখ এই নামে অভিহিত হইল। আকবরের রাজত্বের শেষ কাল পর্য্যন্ত শিখসম্প্রদায়ের উত্তর উত্তর সংখ্যা-বৃদ্ধিই হইয়াছিল। সম্রাটেরা ঐ অভিনব সম্প্রদায়ের উপর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। শিখেরাও নিরীহভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয় আসিতেছিল।

* যৎকালে পূর্ব্বে আরাঙ্গিব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিয় ছিলেন তৎকালে তাহারা চৌথের দাওয়া করে। তখন তাহা পাইলেই তাহারা ক্ষান্ত থাকিত।

শিখদিগের এক মত এই যে, অর্চ্চনার প্রণালীভেদে কিছুই ইতর-বিশেষ নাই; যে কোন প্রণালীতে হউক কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের অর্চ্চনা করিলেই সুকৃতি জন্মে। হিন্দুদিগের পক্ষে এই মতে কিছুই নূতন বা দূষ্য নাই। কিন্তু মহম্মদ-শিষ্যেরা ততদূর স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে মুসলমান ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই স্বর্গলাভের একমাত্র দ্বার। সুতরাং তাঁহাদের কর্ণে শিখদিগের উপরি-উক্ত মত অতিশয় দোষাবহ শ্রুত হইয়াছিল, তজ্জন্য, ১৬০৬ খৃঃ অব্দে, আকবরের মৃত্যুর পর এক বৎসর কালের মধ্যেই, মুসলমানদিগের হস্তে তদানীন্তন শিখ-গুরুর শিরশ্ছেদ হইল। গুরুর নিগ্রহে নিরীহ শিখেরা অতীব উগ্র হইয়া উঠিল। নিহত গুরুর পুত্র হরগোবিন্দের প্রবর্ত্তনায় তাহারা শান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া, সকলেই সৈনিক ব্রত অবলম্বন করিল। কিন্তু সম্রাট-সেনাদিগের প্রভাবে, তাহাদিগকে তৎকালে আপনাদের আকরস্থান লাহোর পরিত্যাগপূর্ব্বক তদুত্তর-বর্ত্তী পার্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তথায় তাহারা ১৬৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। তত্তাবৎ কাল তাহাদের হৃদয়ে মুসলমানদিগের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ও বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা নিয়ত জাগরূক ছিল। অতঃপর হরগোবিন্দের পৌত্র গোবিন্দ, গুরুর পদে অভিষিক্ত হইয়া, শিখদিগকে রণপণ্ডিত করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইলেন (১৬৭৫)। নানক হইতে গোবিন্দের সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ক্রমান্বয়ে নয় ব্যক্তি গুরুর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। দশম গুরু গোবিন্দ জাতিভেদ একবারে উচ্ছিন্ন করিলেন, এবং হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সকলকেই সমভাবে নিজ সম্প্রদায়ে গ্রহণ

করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকেই অভেদে নীলবর্ণের সমান আকারের পরিচ্ছদ ধারণ করাইলেন; আর নিয়ম করিলেন যে শিখেরা সকলেই কেশ ও শ্মশ্রু আক্লিপ্ত রাখিবে এবং সম্প্রদায়ে প্রবেশ অবধি সকলকেই চির-সৈনিক ব্রতে দীক্ষিত হইতে এবং, যে কোন প্রকারে হউক, অঙ্গে লৌহ ধারণ করিতে হইবে। তিনি তৎকাল-প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের অর্চ্চনা-প্রণালীর পরিবর্ত্তে নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত করিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সম্মানের আদেশ, গোবধ ও গোমাংসভক্ষণ নিষেধ ইত্যাদি।

গুরুগোবিন্দের সময়েও শিখেরা সংখ্যায় এত অল্প ছিল যে তাহারা সম্রাট-সেনাদিগের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তাহারা নিয়তই নিগৃহীত ও নিহত এবং তাহাদের দুর্গসকল শত্রুহস্তে পতিত হইতেছিল। অনন্তর গোবিন্দের শিষ্যেরা একান্ত লণ্ডভণ্ড এবং তাঁহার জননী ও দুই পুত্র শত্রুহস্তে পতিত ও নিহত হইল। সেই দুঃখ-পরম্পরায় তিনি স্বয়ংও উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। অবশেষে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তাঁহার এক শত্রু তাঁহার প্রাণবধ করিল। শিখেরা এত উৎপীড়িত হইয়াছিল বটে, তথাপি একবারে হতাশ হয় নাই, বরং তাহাদের বৈরনির্যাতন-সঙ্কল্প অনুদিন প্রদীপ্তই হইয়াছিল। ফলতঃ কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক একবার বদ্ধমূল হইয়া উঠিলে, নিগ্রহ ও নিষ্পীড়ন দ্বারা সহসা তাহাদের উচ্ছেদ চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বহুকাল ব্যাপিয়া উৎপীড়ন করিতেপারিলে পরিণামে উচ্ছেদ সম্পন্ন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মোগল সম্রাটেরা

যেরূপ হীনবল হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা বহুকাল ব্যাপিয়া নিরন্তর শিখদের উপর দৌরাত্ম্য করিতে পারেন নাই। সুতরাং সময়ে সময়ে তাঁহারা যে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা কেবল শিখদের ক্রোধই বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল।

গোবিন্দের মৃত্যুর পর বন্দুনামে এক ব্যক্তি শিখসম্প্রদায়ের নায়ক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অধীনে শিখেরা পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে অবরোহণ করিয়া পঞ্জাবের পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়া লুঠ ও অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার করিতে লাগিল। যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী সাহরণপুর পর্য্যন্ত তাহাদের দৌরাত্ম্যে কম্পিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তাহারা শতদ্রু নদী ও পর্ব্বতাবলীর অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগে অবস্থিত হইয়া পূর্ব্বদিকে দিল্লী, পশ্চিমে লাহোর পর্য্যন্ত যৎপরোনাস্তি উপদ্রব করিতে লাগিল। সেই সকল উৎপাত নিবারণ মানসে সম্রাট বাহাদুর সাহা তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং অনধিককালমধ্যেই তাহাদিগকে পার্ব্বতীয় প্রদেশে তাড়াইয়া দিলেন। পরে বন্দুকে এক দুর্গে অবরোধ করিয়া ভাবিলেন, তাহাকে ধরিয়া একবারে সমস্ত উৎপাত নিরাকৃত করিবেন। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই বন্দু নিরুদ্ধ দুর্গ হইতে নির্গম সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন। অনন্তর সম্রাট লাহোরে পরাবর্ত্তন করিলেন এবং অল্পকাল পরেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন (১৭১২)। বাহাদুর পাঁচ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন।

বাহাদুরের চারি পুত্র ছিল। পিতার জীবদ্দশায় ইহারা কোনরূপ বিদ্রোহিতা করে নাই, কিন্তু এক্ষণে সিংহাসনঅধিকারের জন্য পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। যাহা হউক, তদানীন্তন প্রভূতক্ষমতাশালী অমাত্য জুল-

ফকির জ্যেষ্ঠের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং অবশিষ্ট তিন জনের প্রাণসংহার সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাকেই রাজাসনে উপবেশন করাইলেন। অভিনব সম্রাট্‌, জাহান্দার সাহা এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। জাহান্দার সম্রাটপদের নিতান্ত অনুপযুক্ত ছিলেন। তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ ব্যসনে নিমগ্ন হইলেন। এক সামান্য নর্ত্তকী তাঁহার কর্ত্রী হইয়া উঠিল। সম্রাট সেই কুলটার কুটুম্বদিগকে উচ্চ উচ্চ পদে উন্নমিত করিলেন। তজ্জন্য প্রধান প্রধান অমাত্যেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। জুলফকির উজির পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপনার অকর্ম্মণ্য ও নিতান্ত সাক্ষীগোপাল সদৃশ প্রভুর প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর তিনি স্বয়ং এমন মাৎসর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন যে অন্যান্য সকল অমাত্যই তাঁহার বিপক্ষ হইল।

উপরি-উক্ত প্রকারে সম্রাট ও তাঁহার উজির অমাত্যকুলের অশ্রদ্ধার আস্পদ হইয়াছিলেন, এমন সময়ে এক আগন্তুক শত্রু তাঁহাদের উভয়ের বিরুদ্ধে ধাবমান হইতে লাগিলেন। জাহান্দার সিংহাসনে উঠিয়াই, তাঁহার পূর্ব্বগত সম্রাটদিগের বংশসম্ভূত যে সমস্ত কুমারকে হস্তে পাইয়াছিলেন তত্তাবতেরই প্রাণসংহার করেন। কেবল ফেরক্সের নামে তাঁহার এক ভ্রাতৃপুত্র, বঙ্গদেশে অবস্থিতি নিবন্ধন, তাঁহার হস্তের বহির্ভূত থাকায়, এপর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ফেরক, সায়দবংশসম্ভূত দুই পরাক্রান্ত ভ্রাতার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ আবদুল্লা আলাহাবাদের, কনিষ্ঠ হুসেন বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহাঁদের সাহায্যে ফেরক সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। তৎশ্রবণে জাহান্দার, ফেরকের আগমন

ব্যাঘাত সম্পাদনের জন্য সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ফেরক্ সেই সেনাদিগকে পরাস্ত করিলেন। পরে আগ্রার সন্নিকর্ষে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন জলফকির ও জাহান্দার ৭০,০০০ সেনা লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। উভয় দলে তুমুলসংগ্রাম হইতে লাগিল; অবশেষে সম্রাট্ পরাজিত হইয়া পড়িলেন। তখন জলফকির বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা সেই বিপন্ন ও পলায়মান প্রভুকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই দুশ্চেষ্টা বিফল হইল। শত্রুরা তাঁহার ও তাঁহার প্রভুর, উভয়েরই প্রাণসংহার করিল (১৭১৩)।

অতঃপর ফেরক্রের সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; সুতরাং জ্যেষ্ঠ সায়দ উজির, কনিষ্ঠ আমির-উল-ওমরা অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। সায়দেরা সমুদায় প্রকৃত রাজ-ক্ষমতা আপনারা অধিকার করিলেন। সম্রাট নিরবচ্ছিন্ন পুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে আসীন রহিলেন। পূর্ব্বে যখন ফেরক্ সায়দদিগের শরণাগত হন তখন তিনি নানাপ্রকারে তাহাদের তোষামোদ করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতও নিতান্ত অব্যবস্থিত-চিত্ত ও একান্ত কাপুরুষ ছিলেন। এজন্য সায়দেরা মনে করিয়াছিলেন যে তিনি সম্রাটের নাম ও তদুপযুক্ত বৃত্তি পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, তাঁহার নামে আমরাই নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিব। কিন্তু এক্ষণে সহজে সেরূপ হইল না; সম্রাট তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্ব দর্শনে অসন্তুষ্ট হইলেন। আর মিরজুম্লা নামে তাঁহার এক প্রিয়পাত্র ছিল, সে বিশেষ বুদ্ধি বা গুণসম্পন্ন ছিল না বটে, কিন্তু অসার সম্রাট তাহার একান্ত বশীভূত হইয়াছিলেন। মিরজুম্লা সায়দদিগের প্রভুতার দারুণ বিদ্বেষী হইয়া

উঠিল এবং সম্রাটের সহিত মিলিয়া তাহাদের বিনাশের উপায় উদ্ভাবনে তৎপর রহিল।

অনন্তর উপর্য্যুপরি চক্রান্তের শ্রেণী চলিতে লাগিল। সম্রাট ও সায়দদিগের মধ্যে পরস্পর দারুণ অবিশ্বাস জন্মিয়া উঠিল। যাহা হউক, অবশেষে সায়দেরা সম্রাটকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিল যে তাঁহাকে মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাহাদের সহিত মিলনের চেষ্টা পাইতে হইল। সেই মিলনের পর সায়দ হুসেন আপনার সেনাগণ সমেত দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইলেন। সায়দদিগের সহিত সম্রাটের মিলন যে নিতান্ত মৌখিক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। উভয় পক্ষেরই পরস্পরের আন্তরিক বিদ্বেষ সম্পূর্ণ প্রবল ছিল।

ইতিপূর্ব্বে শিখেরা, মুসলমানদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার গৃহবিচ্ছেদে ব্যাপৃত দেখিয়া, আবার দারুণ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। বন্দু স্বীয় আশ্রম হইতে অবরোহণ করিয়া সম্রাট-সেনাদিগকে পরাস্ত এবং পঞ্জাবের সমগ্র সমতল ভাগ লুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। অতঃপর এক রণ-পণ্ডিত মুসলমান-সেনানী শিখদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। সর্ব্বত্র শিখেরা পরাভূত হইল, অবশেষে বন্দু স্বয়ং বহুসংখ্য অনুচরের সহিত বন্দীভূত হইলেন। অবিলম্বে সেই সকল অনুচরের কিয়দংশের শিরশ্ছেদ হইল। অবশিষ্ট ৭০০, বন্দুর সমভিব্যাহারে, দিল্লীতে প্রেরিত হইল। তথায় প্রথমতঃ তাহারা দিল্লীর সমুদায় রাজপথে ভ্রামিত হইল। পরে তাহাদিগকে বলা হইল যে তাহারা নানকের মত পরিত্যাগ করিয়া, মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাহারা অস্বীকৃত হইল। তখন প্রতিদিন শত ব্যক্তির শিরশ্ছেদ হইতে লাগিল। অবশেষে

বন্দুর মরিবার দিবস উপস্থিত হইল। সেদিন তিনি লৌহ-পিঞ্জরে রুদ্ধ ও সুবর্ণ-রঞ্জিত বসনে পরিহিত ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি তদবস্থায় নগরীর পথে পথে ভ্রামিত হইলেন। ভ্রমণ-সময়ে তাঁহার অনুচরবর্গের ছিন্ন মুণ্ড সকল, বর্শার অগ্রভাগে উত্তোলন করিয়া, আসা-সোটার ন্যায়, তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে নীত হইল। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার এক অপোগণ্ড শিশু ছিল। ভ্রমণ সমাপ্ত হইলে, পাষণ্ড মুসলমানেরা বন্দুর হস্তে এক ছুরিকা দিয়া কহিল, স্বীয় শিশুর প্রাণ বধ কর। বন্দু অস্বীকার করিলেন। তখন নির্দ্দয় শত্রুরা সেই নিরপরাধ শিশুর সংহার করিয়া তাহার শোণিত ও শিরা তদীয় পিতৃমুখে নিক্ষেপ করিল। তদনন্তর সন্দংশ*পরম্পরা প্রয়োগ দ্বারা বন্দুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বন্দু সেই বাক্‌পথাতীত যাতনার সময়েও অনবরত পরমেশ্বরের স্তুতিপাঠ করিয়াছিলেন। বন্দুর মৃত্যুর পর মুসলমানেরা, যেখানেই হউক, শিখ দেখিলেই বন্যপশুর ন্যায় নিপাত করিতে লাগিল। তথাপি শিখ সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইল না।

বাহাদুর সাহার রাজত্বকালে, দাক্ষিণাত্যে মোগল-দিগের তদানীন্তন প্রধান সচিব দাউদ খাঁ সাহুর সহিত যে সন্ধি করেন, তাহার স্থূল বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সন্ধির পর দাউদ দাক্ষিণাত্য হইতে স্থানান্তরে নিযুক্ত হন, অমনি তাঁহার কৃত সন্ধিও ভগ্ন হয়। পরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৃহবিচ্ছেদ দারুণ প্রবল হইয়া উঠে, সেই সুযোগে দাউদের উত্তরাধিকারী চিনক্লিচ খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৃহবিচ্ছেদের যাহাতে অধিকতর বৃদ্ধি হয়, নিরন্তর এরূপ চেষ্টা পান। তাঁহার তাদৃশ চেষ্টায়

* সাঁড়াশি।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিক্রম সঙ্কুচিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের দৌরাত্ম্য একবারে নিঃশেষ হইল না। অনন্তর চিনক্লিচ খাঁ স্থানান্তরে, এবং তাঁহার কর্ম্মে সায়দ হুসেন নিযুক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়-দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করা হুসেনের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। আরও তিনি ফেরক্সের ও তৎপক্ষীয়দিগের ষড়যন্ত্রহইতে ভ্রাতাকে সংরক্ষিত করিবার মানসে অনতি-দীর্ঘ কালের মধ্যেই দিল্লীতে প্রতিগমনের জন্য একান্ত উৎসুক হইলেন। এজন্য তিনি সাহুর সহিত এই নিয়ম করিলেন যে, সাহু সমগ্র দাক্ষিণাত্যের উপরে চৌথ আদায় করিতে পারিবেন। আর সেই চৌথ বাদ দিয়া যে রাজস্ব অবশিষ্ট থাকিবে তাহারও দশাংশের একাংশ প্রাপ্ত হইবেন। এদিকে সাহু অঙ্গীকার করিলেন যে তিনি সম্রাটকে দশ লক্ষ টাকা কর এবং আবশ্যক হইলেই সম্রাটকার্য্যে নিয়োগ জন্য, ১৫০০০ অশ্ব-সেনা প্রদান করিবেন; আর দাক্ষিণাত্যে কোন প্রকার উৎপাত হইলে তদ্ভাবতের জন্য তিনিই দায়ী থাকিবেন। হুসেন সম্রাটের সম্মতি ও স্বাক্ষরের জন্য সেই নিয়মপত্র দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সম্রাট অবমানবোধে সেই সকল নিয়মে সম্মত হইলেন না। তাহাতে সায়দেরা সম্রাটের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

ফেরক্সের ও তৎপক্ষীয়েরা নিয়ত সায়দের নিপাত-সাধনে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, কিন্তু পরিশেষে সায়দেরা তৎসমুদায় বিফল করিয়া ফেরক্সেরের প্রাণসংহার সম্পা-দন করিলেন। ফেরক্সের সপ্ত বর্ষ রাজত্ব করেন। তিনি মাড়োয়ারের এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মোগল ও রজঃপূতদিগের মধ্যে সেই শেষ বিবাহ।

ফেরক্সেরের সংহার করিয়া সায়দেরা আর এক সাক্ষীগোপাল সম্রাটের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহারা ক্রমান্বয়ে দুই জনকে সিংহাসনে বসাইল, কিন্তু সেই দুই জনই অল্পকালমধ্যে কাল-কবলে পতিত হইল। তখন তাহারা মহম্মদ সাহা উপাধি-বিশিষ্ট তৃতীয় ব্যক্তির মস্তকে রাজমুকুট অর্পণ করিল। এই ব্যক্তির জননী বিলক্ষণ-বুদ্ধিশালিনী ছিলেন।

সায়দদিগের অসীম প্রভুতা দর্শনে অন্যান্য অমাত্যেরা অতিশয় অসূয়-পরবশ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন বিশেষ অনিষ্ট সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে সায়দেরা চিনক্লিচ খাঁ নামক অতিদক্ষ রাজপুরুষকে আপনাদের বিপক্ষ করিয়া তুলিলেন। কালক্রমে এই ব্যক্তি আসফজা ও নিজাম-উল-মুল্ক এই দুয়ের অন্যতর উপাধিতেই অধিক প্রসিদ্ধ হন; এজন্য আমরা, নামের গোলযোগ নিবারণ-মানসে, অতঃপর ইহাকে ঐ দুয়ের অন্যতর উপাধিতেই উল্লেখ করিব। ইনি গাজিউদ্দিন নামে আরাঞ্জিবের এক প্রিয় সচিবের পুত্র। ফেরক্সেরের সিংহাসনারোহণ-কালে ইনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হন। পরে হুসেন সায়দ ইহাকে তথা হইতে অপসারিত করেন, তথাপি ইনি সায়দদিগের পক্ষই ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সায়দেরা ইহাঁকে কেবল একমাত্র মালব প্রদেশের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইনি কিছুকাল আপনার অসন্তোষ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, সঙ্গোপনে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক, বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিলেন। পরে ১৭২০ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া তথায় আপনার প্রভুতা স্থাপন করিয়া উঠিলেন। সায়দেরা ইহাঁর বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন বটে

কিন্তু সেই সেনারা নিতান্ত পরাভূত হইল। তখন সায়দেরা অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এপর্য্যন্ত সম্রাট মহম্মদ, জননীর আদেশমত, সায়দদিগের সহিত মৌখিক সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেছিলেন, অধুনা তাহাদের উপস্থিত বিভ্রাট শ্রবণ করিয়া মনে মনে পুলকিত হইলেন এবং তাহাদের নিপাতের জন্য কতিপয় প্রধান অমাত্যের সহিত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন।

অতঃপর আজফজার দমনের জন্য হুসেন স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। নিজের অনুপস্থিতিকালে পাছে সম্রাট ও তৎপক্ষীয়েরা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লার কোন অনিষ্ট করিয়া উঠেন এই আশঙ্কায় হুসেন সম্রাটকে সঙ্গে লইলেন, আবদুল্লা দিল্লীতে রহিলেন। এদিকে সম্রাটের ষড়যন্ত্র পরিপক্ক হইয়াছিল। হুসেন ও সম্রাট আগরা হইতে অল্প দূর গমন করিয়াছেন এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর পুরুষ আবেদন-পত্র প্রদানচ্ছলে হুসেনের পাল্‌কির সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকে এমনি সাংঘাতিক আঘাত করিল যে অল্পকালমধ্যেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। হুসেন আহত হইবামাত্রই সম্রাটের তাবৎ ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তজ্জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে স্বপক্ষদিগকে এই মাত্র আদেশ করেন "তোমরা সম্রাটকে সংহার কর।" তাহারা তদর্থে ধাবমান হইল, কিন্তু পূর্ব্বেই সেরূপ চেষ্টিতের প্রতিবিধান করা হইয়াছিল। অতঃপর মহম্মদ দিল্লীর অভিমুখে পরাবৃত্ত হইলেন। সম্রাট পঁহুছিবার পূর্ব্বে হুসেনের হত্যাসম্বাদ পাইয়া আবদুল্লা, আত্মরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া, এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মদ তাঁহাকে পরাস্ত ও কারারুদ্ধ করিলেন (১৭২০)।

প্রাগুক্ত রূপে নিষ্কণ্টক হইয়া মহম্মদ মহাড়ম্বরে দিল্লীতে

প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু অল্পকালমধ্যেই অতিশয় বাসনা-সক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি উজীর-পদ-প্রদানের জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে আজফজাকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে ১৭২২ খৃঃ অব্দে আজফজা তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দেখিলেন, সম্রাট একান্ত উপপত্নী-পরায়ণ ও কতিপয় কাপুরুষ প্রিয়পাত্রের নিতান্ত বশীভূত। তাদৃশ প্রভুর কর্ম্মে ভদ্রস্থতা নাই জানিয়া আজফজা উজীরী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিলেন। সাদত খা নামে মহম্মদের আর এক জন দক্ষ ও অনুরক্ত সচিব ছিলেন। তিনিও সম্রাটকে নিতান্ত অসার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া অযোধ্যায় গমন করিলেন। উভয় সচিবই স্ব স্ব স্থানে স্বাধীনকল্প হইয়া উঠিলেন। কালক্রমে উঁহাদের উভয় হইতেই এক এক স্বাধীন রাজ-বংশের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে আজফজার উত্তরাধি-কারী, নিজাম এই নামে অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত হায়দরাবাদে রাজত্ব করিতেছেন। সাদত খাঁর উত্তরাধি-কারীরাও বহুকাল অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন, অল্প দিন হইল ইহাঁরা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন।

মহম্মদের সভা হইতে দাক্ষিণাত্যে যাইয়া আজফজা হায়দরাবাদ নগরে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তখন সেই ভূভাগে মহারাষ্ট্রীয়েরাই তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তদানীং তাহারা অভূতপূর্ব্ব বিক্রান্ত হইয়া উঠিয়া-ছিল। রাজা সাহর পেশোয়া অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী বলজি-বিশ্বনাথ নামক ব্রাহ্মণই, মহারাষ্ট্রীয়দিগের তাদৃশ বলো-পচয়ের প্রধান হেতু ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের ভাবি উন্নতি-সাধনোদ্দেশে বলজি এপর্য্যন্ত চৌথ ও তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট রাজস্বের দশাংশের একাংশ প্রাপ্তির দাও-

স্বার* অণুমাত্রও পরিত্যাগ করেন নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ফেরক্সের সম্রাট সেই দাওয়ায় সম্মত হন নাই। কিন্তু পরে বলজির কৌশল-বশে মহম্মদ সাহা উহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বলজি চৌথ প্রভৃতির বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট ভূসম্পত্তি বা বৎসর বৎসর নিয়মিতসংখ্যক টাকা গ্রহণে যত্ন করেন নাই। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের দাওয়া যত অনিশ্চিত থাকিবে ততই তাহাদের পক্ষে অধিক লাভ হইবে সন্দেহ নাই। মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যে পেশোয়ার পদ যেরূপ প্রধান, রাজ-প্রতিনিধির পদও অন্ততঃ তদনুরূপ ছিল। প্রথমোক্ত পদ বলজির পরিবারেই পুরুষানুক্রমিক হইয়া উঠে।

১৭২০ খৃঃ অব্দে বলজি পরলোক গমন করায়, তদীয় পুত্র বাজি রাও পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত হইলেন। শিবজির পর বাজির সদৃশ দক্ষ পুরুষ মহারাষ্ট্রে দ্বিতীয় দেখা যায় নাই। তিনি পেশোয়া-পদে আরোহণ করিয়াই দিল্লীপতিকে আক্রমণ জন্য আপন প্রভুকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন "আমরা অগ্রে সেই জীর্ণ তরু ছেদন করি, পরে তাহার শাখা প্রশাখা সকল আপনা হইতেই নিপতিত হইবে।" সাহ তাঁহার পরামর্শে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে বাজিরাও মালবদেশ লুঠ ও গুজরাটের শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে চৌথ আদায় করিয়া উঠিলেন।

অতঃপর আজফজা দাক্ষিণাত্যে আপনাকে বদ্ধমূল জ্ঞান করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভুতা সংযত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ হায়দরা-

---

* ২৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

বাদের সন্নিহিত প্রদেশের চৌথ ও সরদশমুখীর (অর্থাৎ চৌথ বাদে অবশিষ্ট রাজস্বের দশাংশের একাংশের) বিনিময়ে বৎসর বৎসর নিরূপিত সংখ্যক টাকা প্রদানের প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্মত হইল না। অনন্তর আজফজা এই ছল অবলম্বন করিলেন যে, সাহর প্রতিদ্বন্দ্বী শম্ভু* এখনও জীবিত আছেন। মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগ তাঁহার অধিকৃত রহিয়াছে, অবশিষ্ট ভাগও তিনি দাওয়া করিতেছেন। অতএব চৌথ প্রভৃতি কাহার প্রাপ্য? সাহ ও শম্ভুর মধ্যে কে ন্যায়ানুগত অধিকারী, অগ্রে তাহার অবধারণ করা আবশ্যক।

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া সাহ ও তাঁহার পেশোয়া অতিশয় রাগত হইলেন। বর্ষার অবসানমাত্র বাজি, আজফজার অধিকার আক্রমণ ও বুরানপুর নগর অবরোধ করিলেন। এদিকে আজফজা, প্রকাশ্যরূপে শম্ভুর সহিত মিলিত হইয়া, বুরানপুরের রক্ষার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তখন বাজি, কিয়দ্দিবসের জন্য প্রস্থান করিয়া গুজরাট লুণ্ঠন-পূর্ব্বক, অতি সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর তিনি আজফজাকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, সেই মুসলমান সামন্তকে অগত্যা শম্ভুর পক্ষ পরিত্যাগ ও অন্যান্য কার্য্য দ্বারা সাহর আক্রোশ নিবারণের চেষ্টা দেখিতে হইল।

অতঃপর বাজি রাও মালবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, ইত্যবসরে একদা রাজপ্রতিনিধি অতর্কিতরূপে শম্ভুকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাভব করিয়া উঠিলেন। তখন শম্ভু অনন্যোপায় হইয়া, প্রতিনিধির আদেশানুরূপ এক সন্ধি-

---

* ১৭২২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় শিবজি পরলোক গমন করেন, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শম্ভু তদীয় পদে অভিষিক্ত হন।

পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সেই সন্ধিদ্বারা এই নির্দ্ধারিত হইল যে, সাহ মহারাষ্ট্রে আধিপত্য করিবেন। শম্ভু কেবল কোলাপুরের সন্নিহিত সঙ্কীর্ণ ভূভাগের অধিস্বামী হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনিও সাহের ন্যায় রাজ-উপাধি গ্রহণ ও অন্যান্য রাজসম্মান সম্ভোগ করিতে পারিবেন। ইতিপূর্ব্বে সাহ ও শম্ভুর পরস্পার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায়, আজফজা মনে করিয়াছিলেন যে, যখন যে পক্ষ প্রবল দেখিবেন তখন তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক নিয়ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিরক্ত করিতে থাকিবেন। কিন্তু এক্ষণে সন্ধি দ্বারা সাহর প্রভুতা অবিসম্বাদিতরূপে নিরূপিত হওয়াতে আজফজাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিরক্ত করিবার জন্য প্রকারান্তর চেষ্টা করিতে হইল। এক্ষণে মহারাষ্ট্রে পেশোয়া বাজিরাওই প্রকৃত কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন, সাহ নামে মাত্র রাজা ছিলেন। অতএব আজফজ পেশোয়াকেই ব্যতিব্যস্ত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন।

মহারাষ্ট্ররাজ্যে পেশোয়া ও রাজপ্রতিনিধি পদ যেরূপ পুরুষানুক্রমিক, প্রধান সেনাপতির পদও সেইরূপ ছিল। সাহর সময়ের প্রধান সেনাপতি দবরীর বিক্রমেই মহারাষ্ট্রীয়েরা গুজরাট প্রদেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া উঠে। অধুনা দবরী সকল বিষয়ে বাজির প্রভুত্ব দেখিয়া একান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আজফজা ইহারই সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অবশেষে দবরী আজফজার নিকট হইতে প্রচুর সাহায্যের অঙ্গীকার পাইয়া ৩৫০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এবং বাজির প্রাধান্য বিলোপ করিয়া, রাজার হস্তে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিবার প্রতিজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক, দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন।

এই সম্বাদ-প্রাপ্তিমাত্র বাজি নর্ম্মদার উদীচ্য প্রদেশ

হইতে সত্বর পরাবৃত্ত হইয়া দবরীর সম্মুখীন হইলেন; সংগ্রামে বাজী জয়ী, দবরী ভূতলশায়ী হইলেন। দবরীর এক শিশু পুত্র ছিল। যুদ্ধের পর বাজি সেই শিশুর জননীর সহিত এই নিয়ম করিলেন যে তিনি বর্ষে বর্ষে, মহারাষ্ট্রীয়রাজের জন্য, পেশোয়ার হস্তে গুর্জ্জরের অর্দ্ধেক রাজস্ব প্রদান, অপরার্দ্ধ স্বয়ং উপভোগ করিবেন। শিশুর পক্ষ হইয়া পিলজি গুইকোয়াড় নামক অমাত্য, প্রধান সেনাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন (১৭৩১)। পরে দৃষ্ট হইবে কালক্রমে এই পিলজি গুইকোয়াড়ের উত্তরাধিকারীরাই গুর্জ্জরের প্রকৃত অধিপতি হইয়া উঠেন।

দবরীর মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উদজি পোআর, মলহার রাও হুলকার ও রণজি সেন্ধিয়া নামে তিন ব্যক্তিকে বাজিরাও উন্নতপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উদজি পোআর অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই ধারাবারের অধিপতি হইয়া উঠিলেন। আদৌ মলহার রাও হুলকার ও রণজি সেন্ধিয়া দুই জনই অতি সামান্য অবস্থার মনুষ্য ছিলেন। যাহা হউক, কালক্রমে ইহাদের হইতে হুলকার ও সেন্ধিয়া রাজবংশ সমুদ্ভূত হইয়া উঠে।

দবরীর পত্নীর সহিত সন্ধির পর বাজিরাও আজফজাকে দমন করিবার অবসর পাইলেন। কিন্তু তখন তাঁহারা উভয়েই বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে পরস্পর বিদ্বেষী থাকিলে উভয়েরই অনিষ্টের সম্ভাবনা। বাজি মনে করিলেন, আমি মালব প্রভৃতি দূরদেশে যাত্রা করিলে, আজফজা রাজার সহিত মিলিত হইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। এদিকে আজফজা ভাবিলেন আমি বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীপতিকে দাক্ষিণাত্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছি, অতঃপর তিনি ক্রোধান্বিত

হইয়া যদি বাজিকে তাঁহার অধীনে দাক্ষিণাত্যের কর্ত্তৃত্ব ভার প্রদান করেন তাহা হইলে আমার দারুণ বিভ্রাটের সম্ভাবনা। এইরূপ বিবেচনায় বাজি ও আজফজা পরস্পরের সহায়তার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

অতঃপর (১৭৩২) বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত এক জন রাজা, মালবের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক উদ্বেজিত হইয়া, বাজিরাওয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে বাজিরাও যাইয়া সেই শাসনকর্ত্তাকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিলেন যে, তিনি অবশেষে মালব ত্যাগ করিয়া গেলেন। তখন বুন্দেলখণ্ডের রাজা প্রত্যুপকার স্বরূপ বাজিকে তদানীং ঝান্সি প্রদেশ সম্প্রদান করিলেন। পরে মৃত্যুকালে তাঁহাকেই আপনার উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন। সেই সূত্রে কালক্রমে সমগ্র বুন্দেলখণ্ড মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত হইল।

মহম্মদ খাঁর পলায়নের পর জয়পুরের তদানীন্তন রাজা জয়সিংহ মালবের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন। জয়সিংহ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলনজন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ, কিন্তু রণচাতুর্য্যে তাদৃশ দক্ষ ছিলেন না। তিনি পেশোয়াকে দমন করা অসাধ্য দেখিয়া তাঁহাকে মালব প্রদেশ সমর্পণ করিলেন। তাহাতে দিল্লীপতি কোন আপত্তি করিলেন না। সম্রাট মনে করিয়াছিলেন মালব লইয়াই বাজি ক্ষান্ত থাকিবেন এবং তদ্দ্বারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের দারুণ উপদ্রব নিবারিত হইবে। কিন্তু সেরূপ হওয়া যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রকৃতির একান্ত বিপরীত তাহা এক বার স্মরণ করেন নাই। বাজি পুনঃ পুনঃ যত বার জয়ী হইতেছিলেন ততই দিল্লীপতির প্রভাবের যে নিতান্ত অবসাদ হইয়াছিল তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে

লাগিল। আর সম্রাটকে সন্ধি করায় উৎসুক দেখিয়া বাজি ক্রমশই উচ্চতর পণ চাহিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি দাওয়া করিয়া পাঠাইলেন "যদি সমগ্র মালব ও চর্ম্মণ্বতী নদীর দক্ষিণবর্ত্তী তাবৎ ভূভাগ এবং এতদ্ব্যতীত মথুরা, প্রয়াগ ও বারাণসী এই তিন নগর জায়গির স্বরূপ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমি সন্ধি করিতে পারি"। কিন্তু সম্রাট মহম্মদ সাহা তখনও আপনাকে এত দূর হীনবল জ্ঞান করেন নাই যে বাজির তাদৃশ অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হন। সুতরাং সন্ধির প্রসঙ্গ একবারে অন্তর্হিত হইল।

দিন দিন দিল্লিপতির প্রভাবের ক্ষয় ও মহারাষ্ট্রীয়-দিগের বিক্রমের উপচয় দেখিয়া অবশেষে আজফজা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন বাজি ক্রমশঃ দিল্লীশ্বরকে যেরূপ ব্যতিব্যস্ত করিতেছেন তাহাতে পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয়েরাই প্রবল হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে পর তাহারা আমার সর্ব্বনাশ সাধন দ্বারা আপনাদিগের একাধিপত্য স্থাপনের জন্য অবশ্যই যত্ন করিবে। এদিকেও অধুনা দিল্লীপতি আজফজাকে আর বিদ্রোহী প্রজা বলিয়া জ্ঞান করিতেছিলেন না, সম্রাট তাঁহাকে স্বাধীন ও সুহৃদ্ রাজা বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের দমনের জন্য তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। আজফজা সেই প্রার্থনা অনুসারে দিল্লী গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে বাজিরাও স্বয়ং আগরার অনতিদূরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর মলহার রাও হুলকারের অধীনেও তাঁহার এক দল সৈন্য যমুনার পূর্ব্ব পারে যাইয়া লুঠ পাট করিতেছিল। কিন্তু অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সাদত খাঁ হুলকারের বিরুদ্ধে ধাবমান হইয়া তাঁহার সেনা-

দিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। তাহারা আসিয়া বাজি-রাওয়ের দলে মিলিত হইয়া নিস্তার পাইল। তখন জন-রব উঠিল যে মহারাষ্ট্রীয়েরা সাদত খাঁর নিকট একান্ত পরাভূত ও সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দূরীকৃত হইয়াছে। সেই জনরবের অলীকতাপ্রদর্শনার্থ ও সাদত খাঁ কর্ত্তৃক অভিভবের অপমান অপনয়ন-মানসে বাজিরাও অতর্কিত রূপে আসিয়া সহসা দিল্লীর সন্নিকর্ষে উত্তীর্ণ হইলেন। তাহাতে নগরবাসীদিগের বাক্‌পথাতীত আতঙ্ক উপস্থিত হইল। যাহা হউক, বাজি রাওয়ের কেবল ভয়প্রদর্শন করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য তিনি নগরে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা দেখিলেন না। পরে যেমন শুনিলেন সাদত খাঁ ও সম্রাটের উজির তাঁহার বিরুদ্ধে ধাবমান হইতে-ছেন, অমনি তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে উত্তীর্ণ হইলেন (১৭৩৭)। বাজির প্রস্থানের অনধিককালবিলম্বে আজফজা দিল্লীতে পঁহুছিলেন। তথায় তিনি স্বয়ং সর্ব্ব-বিষয়িণী প্রভুতার সহিত প্রধান সেনাপতির পদ, এবং তাঁহার পুত্র গাজিউদ্দিন মালব ও গুর্জ্জরের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এক্ষণে দিল্লীশ্বরের এমন হীন দশা উপস্থিত হইয়াছিল যে, আজফজা বিধিমতে যত্ন করিয়াও নিজের অধীনে চৌত্রিশ হাজারের অধিক সেনা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

কিছুকাল পরে বাজিরাও ৮০,০০০ অশ্বারোহীর সহিত আবার নর্ম্মদার উত্তর পারে উপস্থিত হইলেন। আজফ-জা তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা কখ-নই সম্মুখ যুদ্ধে অসামান্য বীরতা প্রকাশ করে নাই। তাহারা যে প্রণালীতে সংগ্রাম করিত তাহাতে যুদ্ধের প্রারম্ভেই সমস্ত বল বিকাশ করিয়া তাহাদের উপরে

ধাবমান হইলে শত্রুপক্ষের জয়লাভের অধিকতর সম্ভা-বনা থাকিত। কিন্তু আজফ সেরূপ করিলেন না। তিনি ভুপালের সন্নিধানে আসিয়া, এক দুরাক্রম্য স্থানে আক্রমণ প্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা লুঠপাঠ দ্বারা তাঁহার চতুঃপার্শ্ব মরুতুল্য করিয়া আহার সামগ্রীর সমাগম রুদ্ধ করিল। তাহাতে আজফ এমনি ব্যতিব্যস্ত হইলেন যে তাঁহাকে অনধিক এক মাসের মধ্যেই প্রস্থান করিতে হইল। তখন অধ্যবসায়ী শত্রুরা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহাকে অগত্যা পেশোয়ার সহিত সন্ধি করিতে হইল। সেই সন্ধির নিয়ম এই হইল যে, চর্ম্মণ্বতীর দক্ষিণবর্ত্তী তাবৎ ভূভাগ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদত্ত হইবে। আজফ অঙ্গীকার করিলেন যে সম্রাটকে সেই নিয়মে স্বীকৃত করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন করিবেন এবং তদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেও-য়াইবেন (১৭৩৮)। কিন্তু এই সকল নিয়ম পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এক অসামান্য আগন্তুক উৎপাত আসিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নাদির সাহার আক্রমণ ও মোগল রাজত্বের বিনাশ।

পূর্ব্বে টাইমুর খাঁ ও বাবরের আক্রমণের প্রাক্কালে দিল্লী সাম্রাজ্যের যেরূপ হীন অবস্থার বিবরণ করা গিয়াছে, ইদানীং সেই সাম্রাজ্য আবার তদ্রূপ ভগ্নদশায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎকালের ন্যায় অধুনাও স্থানা-

ধুরে এক উচ্ছৃঙ্খল যোদ্ধা প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৭১৫ খৃঃ অব্দের পরে পারস্য রাজ্যে নানা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে ১৭২২ খৃঃ অব্দে কাণ্ডাহারের সমীপবর্ত্তী ভূভাগের অধিবাসী, গিলজি বংশীয় পাঠানেরা, তদ্রাজ্য আক্রমণ ও তত্রত্য রাজধানী ইস্পাহান অবরোধ করে। পরে সেই নগর হস্তগত করিয়া পারস্যের তদানীন্তন রাজা হুসেনকে প্রায় সবংশে বিনাশ করিয়া উঠে। কেবল তমাস্প নামে তাঁহার এক-মাত্র পুত্র অবশিষ্ট থাকেন। সেই তরুণবয়স্ক নৃপকুমার কাস্পিয়ান হ্রদের সন্নিকর্ষে পলাইয়া, এক যাযাবর সম্প্রদায়ের শরণাপন্ন হন। যুদ্ধকুশল ও কষ্টসহ যাযাবরেরা, রাজভক্তি ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগে প্রদীপ্ত হইয়া, বৈদেশিকদিগকে দূরীকরণ পূর্ব্বক, প্রাচীন রাজাদিগের বিনাশাবশিষ্ট বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে। ক্রমশঃ বহুসংখ্য যোদ্ধা একত্র ও দলবদ্ধ হয়।

সেই সকল যোধগণের মধ্যে নাদির নামে এক জন সরদার ছিলেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহাতিশয় ও দক্ষতা প্রদর্শন করায়, সকলে তাঁহাকে সেনানীত্বে বরণ করে। পারস্যে নাদিরের তুল্য রণপণ্ডিত ব্যক্তি দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করেন নাই। পুনঃ পুনঃ রণজয়ী হইয়া অবশেষে নাদির ইস্পাহান অধিকৃত এবং পারস্য হইতে পাঠানদিগকে দূরীভূত করিলেন। তাঁহার অসামান্য দক্ষতা দর্শনে সেনারা ক্রমে ক্রমে তমাস্পের অপেক্ষা তাঁহারই অধিক অনুরক্ত হইয়া উঠিল। তখন নাদির সিংহাসন-প্রাপ্তি অল্পায়াস-সাধ্য দেখিয়া, তমাস্পকে রুদ্ধ ও পরে অন্ধ করিয়া স্বয়ং আরূঢ় হইলেন।

নাদির কেবল পারস্যের রাজা হইয়াই পরিতৃপ্ত রহিলেন না। তিনি আপন সেনাদিগকে প্রভূত সাহসী ও নিতান্ত অনুগত দেখিয়া, দিগ্বিজয় বাসনা করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে পাঠানদিগের দেশ আক্রমণ করেন এবং ক্রমে কাবুল ও কাণ্ডাহার অধিকার করিয়া, অবশেষে ভারতবর্ষের পর্য্যন্তে উত্তীর্ণ হন। তথায় আসিয়া, তদানীন্তন দিল্লীপতির হীন প্রতাপ দর্শনে, তদীয় রাজধানীর পুষ্কল কোষ হইতে স্বয়ং সম্পন্ন হইবার বাসনায়, নাদির বিলক্ষণ উদ্রিক্ত হইলেন, কিন্তু মৌখিক প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে ভারতবর্ষ স্পর্শও করিবেন না। যাহা হউক, অচিরাৎ তদ্দেশ-আক্রমণের হেতু উপস্থিত হইল।

আফগানিস্তান হইতে কতিপয় পাঠান নাদিরের ভয়ে পলায়ন করিয়া, ভারতবর্ষপতির অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য নাদির দিল্লীপতির সমীপে আবেদনপত্র পাঠাইলেন। অনেক বিলম্ব হইল, তথাপি তাঁহার আবেদনের কোন প্রত্যুত্তর যাইল না। নাদির, বিলক্ষণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া, আর এক পত্র লিখিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক জন দূতও প্রেরণ করিলেন, কিন্তু জেলালাবাদে সেই দূত, সমভিব্যাহারি-বর্গ সহিত নিহত হইলেন। মহম্মদ সাহাকে তদ্বিষয় অবগত করায়, তিনি কোন প্রতীকার করিলেন না। তাহাতে পারস্যপতি নিদারুণ ক্রোধ-প্রদীপ্ত হইয়া, এত সত্বর ধাবমান হইতে লাগিলেন যে, ক্রমান্বয়ে পেশোয়ার ও লাহোর পশ্চাৎ করিয়া, দিল্লী হইতে পঞ্চাধিক চল্লিশ ক্রোশমাত্র অন্তরে আসিয়া পঁহুছিলেন (১৭৩৮)। তখনও দীর্ঘসূত্র মহম্মদ সাহা তাঁহার আগমন ব্যাঘাতের বিশেষ উদ্যোগ

করিতে পারেন নাই। অবশেষে মহম্মদ ব্যস্তসমস্ত হইয়া, নিজ সেনাদিগকে একত্র করিয়া, নাদিরের সম্মুখীন হইলেন। আজফজা ও সাদত খাঁ উভয়েই সম্রাটের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পর দারুণ অকৌশল জন্মিয়া উঠিয়াছিল। একে ত ভারতবর্ষীয় সেনারা নাদিরের যোদ্ধাদিগের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট ছিল, তাহাতে আবার যখন শেষোক্তেরা সাদত খাঁকে আক্রমণ করিল, তখন আজফজা* নিরবচ্ছিন্ন নির্লিপ্ত রহিলেন। সুতরাং নাদির স্বল্পায়াসেই জয়লাভ করিলেন। তখন মহম্মদকে অগত্যা জেতার শিবিরে প্রবেশ ও তদনন্তর তাঁহার অনুচর হইয়া, দিল্লীতে আগমন করিতে হইল। প্রথমতঃ দুই দিবস নাদির নগরবাসীদিগের ধন প্রাণ রক্ষার জন্য আপনার সেনাদিগকে বিলক্ষণ সংযত করিয়া রাখিলেন। দ্বিতীয় রজনীতে দুর্ভাগ্যবশতঃ মিথ্যা জনরব উঠিল যে নাদির পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহাতে নাগরিকেরা উত্থিত হইয়া ৭০০ পারসীকের প্রাণ সংহার করিল। তখন নাদির সেই গোলযোগ নিবারণের প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু অবশেষে তাহা অসাধ্য দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া নগরবাসীদিগকে নিপাত করিবার জন্য স্বীয় সৈন্যের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিলেন। প্রভাত হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর হত্যা-ব্যাপার চলিতে লাগিল। দিল্লী-বর্ত্ম সকল শোণিতে প্লাবিত হইল। লুণ্ঠন বলাৎকার ও বৈরনির্যাতনপ্রদীপ্ত উদ্দাম সৈনিকেরা যতপ্রকার বীভৎস সম্পাদনে সমর্থ, ভূরি পরিমাণে তত্তাবৎ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অবশেষে বৈরসাধনে বীতভৃষ্ণ

* কেহ কেহ বলেন, নাদিরের সহিত আজফজার যোগ সাজোস ছিল।

হইয়া, নাদির সেনাদিগকে ক্ষান্ত হইতে কহিলেন। তাহারা তাঁহার এমনি বশীভূত ছিল যে বলিবামাত্র ক্ষান্ত হইল।

নাদির নরশোণিত বর্ষণের জন্য ভারতবর্ষে আসেন নাই, ধনহরণই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর তাহারই চেষ্টা হইতে লাগিল। রাজকোষের তাবৎ বিভব অপহৃত হইল; পরে প্রধান ও সামান্য অধিবাসী-দিগেরও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রদেশীয় শাসন-কর্ত্তারা অনন্যোপায় হইয়া চাঁদা প্রেরণ করিতে লাগি-লেন। অবশেষে নাদির ভারতবর্ষে যত অর্থ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা পাইয়া, দিল্লী হইতে প্রস্থান করি-লেন। পুরাবিদেরা কহেন নাদির অন্যূন ৩০,০০,০০,০০০ নগদ টাকাই লইয়া যান। প্রতিগমনের প্রাক্কালে তিনি হতভাগ্য মহম্মদ সাহাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করিয়া, তাঁহার সহিত এই এক নিয়ম করেন যে, সিন্ধুর পাশ্চাত্য তাবৎ ভূভাগ পারস্যপতির অধীন হইবে। তদবধি আফগানিস্তানে টাইমুর বংশের প্রভুতা একবারে বিলুপ্ত হয়।

নাদিরের প্রস্থানের পর কিছুকাল দিল্লীর অধিবাসীরা অবষ্টম্ভময় হইয়া রহিল। অল্প দিনে তাহাদের আতঙ্ক বিগত ও সম্পত্তি পুনরাহৃত হয় নাই। বহুকাল নগরীর অধিকাংশ পুরীই ভগ্ন, অধিকাংশ পল্লীই নির্ম্মনুষ্য এবং সকল স্থানই অসমাহিত শবরাশির ন্যক্কারজনক পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ ছিল। নাদির গমন করিলে দীর্ঘকাল পরে মোহ-নিদ্রাবসানে জাগরিতের ন্যায় সম্রাট্ ও সদস্যেরা পুন-র্ব্বার রাজকার্য্যের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তখন রাজকোষ রিক্ত, সেনারা অধিকাংশ মৃত ও সমস্ত

সাম্রাজ্যেই রাজধানীর অনুরূপ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তখনও মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্যে দাক্ষিণাত্য ব্যতিব্যস্ত হইতেছিল। এপর্য্যন্ত কেবল আর্য্যাবর্ত্তের কতিপয়মাত্র প্রদেশে সেই প্রবল শত্রুরা উপদ্রব করে নাই এবং সেই কতিপয় প্রদেশই সম্রাটের প্রধান সম্বল ছিল। কিন্তু অধুনা নাদিরের সেনারা সেই সকল প্রদেশ এরূপ নিষ্পীড়িত করিয়া গিয়াছিল যে আগামী বর্ষেও তত্তাবতে রাজস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। এই রূপে দিল্লীপতির রাজশ্রী সহজেই ভ্রংশিতপ্রায় হইয়াছিল, তাহার উপর আবার তাঁহার অমাত্যেরা দুই ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত ও পরস্পর দারুণ বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা আক্রমণ করিলে, বিনাশাবশিষ্ট মোগল-প্রভুতার একবারেই উচ্ছেদ হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয়েরাও আত্ম-বিদ্রোহে ব্যাপৃত হইয়াছিল। তজ্জন্যই দিল্লীপতি কিছুকাল নিষ্কৃতি পাইলেন।

পূর্ব্বে যৎকালে রাজা সাহ, বন্দীদশা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, দাক্ষিণাত্যে প্রথম উপস্থিত হন, তৎকালে যে সকল মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করে তন্মধ্যে পরসজি ভূসলা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। পরসজি ক্রমশঃ উন্নত পদে আরোহণ করেন। অবশেষে রাজা তাঁহাকে বিরার ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগের চৌথ আদায় করিবার ভার দেন *। অধুনা সেই পরসজি ভূসলা ও গুজরাটের গুইকোয়াড় উভয়ে একমিল হইয়া, বাজি রাওয়ের প্রাধান্যবিলোপের চেষ্টা দেখিতেছিলেন। কিন্তু বাজি কৌশল-

---

* উত্তর কালে পরসজির উত্তরাধিকারীরাই বিরারের অধীশ্বর রাজা হইয়া উঠেন।

দ্বারা পরসজিকে কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাঁহা হইতে নিরুদ্বেগ হইলেন। তদনন্তর তিনি আজফ-জার পুত্র নাজির জঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। যৎকালে আজফজা দিল্লী গমন করেন, তৎকালে স্বীয় রাজ্যের শাসনের জন্য তিনি নাজির জঙ্গকে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া যান। বাজি মনে করিয়াছিলেন সহজেই নাজির জঙ্গকে ব্যতিব্যস্ত করিবেন। কিন্তু তিনি আক্রমণ করিলে পর নাজির জঙ্গ এমনি শৌর্য্য প্রকাশ করিলেন যে, অবশেষে বাজিকে নাজিরের সহিত সন্ধি করিতে হইল। তদনন্তর বাজি আর্য্যাবর্ত্ত লক্ষ্য করিয়া নর্ম্মদা-তটে উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু তথায় মৃত্যু তাঁহার সমস্ত দুরাকাঙ্ক্ষার উপশম করিল (১৭৪০)।

বলজি, রঘুনাথ ও সমসের বাহাদুর নামে বাজির তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে সমসের বাহাদুর এক মুসলমান উপপত্নীর গর্ভসম্ভূত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ বলজি পেশোয়া পদ উত্তরাধিকার করিলেন, আর বাজির অন্তিম নির্দ্দেশ অনুসারে বুন্দেলখণ্ডে তাঁহার যে সমস্ত ভূসম্পত্তি ছিল, সমসের তত্তাবৎ প্রাপ্ত হইলেন। রঘুনাথ কোন বিশেষ পদ বা অধিকার প্রাপ্ত হইলেন না, পরে দৃষ্ট হইবে উত্তরকালে ইহাকে অবলম্বন করিয়া ইংরেজেরা বারম্বার মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সংগ্রাম করেন।

বলজির পেশোয়া পদ উত্তরাধিকার-কালে তাঁহার পিতৃ-শত্রুরা বহুবিধ বিঘ্নের চেষ্টা পান। সেই সকল শত্রুর মধ্যে রাজপ্রতিনিধি, দমজি গুইকোয়াড়, ও পরসজির উত্তরাধিকারী রঘুজি ভূসলা, এই তিন জনই প্রধান। যাহা হউক, কিঞ্চিদধিক এক বৎসরের মধ্যে বলজি ইহা-দের বিপক্ষতাচরণ নিবারণ করিয়া পিতৃপদে দৃঢ়াসীন

হইলেন। তখন তিনি আর্য্যাবর্ত্তের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। নাদির সাহার দিল্লীর আক্রমণের পূর্ব্বে আজ্ঞা, সম্রাটের স্থানীয় হইয়া, বাজির সহিত যে সন্ধি * করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই সন্ধির নিয়ম পরিপূরিত হয় নাই। বলজি সেই সকল নিয়ম পরিপূরণের জন্য সম্রাটের উপর জিদ করিতে লাগিলেন। এদিকে ভাস্কর পণ্ডিত নামে রঘুজির এক সেনানী আসিয়া বাঙ্গালা † আক্রমণ করিলেন। তখন আলিবর্দ্দি খাঁ নামে দক্ষ রাজপুরুষ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি ভাস্করকে দূরীভূত করিবার জন্য বিলক্ষণ উদ্যোগী হইলেন; কিন্তু পরে রঘুজি স্বয়ং বাঙ্গালার অভিমুখে ধাবমান হওয়াতে আলিবর্দ্দি ভীত হইয়া সত্বর সাহায্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সম্রাটের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট মহম্মদ সাহার তখন এমন অবস্থা নহে যে, তিনি স্বয়ং সাহায্য করেন; এজন্য তিনি অযোধ্যার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সাদত খার পুত্র সফদর জঙ্গকে ‡ বাঙ্গালা গমনে নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু সফদরও সম্পূর্ণ রূপে রঘুজিকে নিবারণ করিতে পারিবেন না জানিয়া সম্রাট বলজির নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, "যদি তুমি বঙ্গদেশে যাইয়া রঘুজির উপদ্রব নিবারণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে মালব প্রদেশ প্রদান করিব।" পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, রঘুজি বলজির

---

* ২৪২ পৃষ্ঠায় দেখ।

† বঙ্গদেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ ও লুঠ পাট বর্গির হাঙ্গাম নামে প্রসিদ্ধ আছে।

‡ নাদিরের আক্রমণের অনতিদীর্ঘ কাল পরেই সাদত খাঁ গতাসু হইয়াছিলেন।

কুলশত্রু, অতএব সম্রাটের প্রস্তাব মাত্রই বলজি সম্মত হইলেন এবং বঙ্গদেশে যাইয়া তথা হইতে রঘুজিকে তাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর বলজি মালবে প্রতিগমন করিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থিতির পর, সিতারায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে রঘুজি বাঙ্গালা হইতে যাইয়া, রাজপ্রতিনিধি ও গুইকোয়াডের সহিত মিলিত হইয়া, বলজির বিরুদ্ধে এক বিষম ষড়যন্ত্র করিয়া উঠিলেন। বলজি প্রতিগত হইয়া সবিশেষ অবগত হইলেন। তখন তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, কোনরূপে রঘুজিকে ক্ষান্ত করা, নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব বাঙ্গালা ও বিহার দেশে চৌথ আদায় করিবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের যে দাওয়া ছিল, তাহা তিনি রঘুজিকে সমর্পণ করিলেন। তাহাতে রঘুজি ক্ষান্ত হইলেন, এইরূপে রঘুজি ভিন্নমত হওয়ায় গুইকোয়াড় ও প্রতিনিধি বলজির বিপক্ষে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এদিকে রঘুজির সেনারা যাইয়া পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালায় উপদ্রব করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৫১ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দি রঘুজির সহিত এই নিয়ম করিলেন যে তিনি বাঙ্গালার চৌথ স্বরূপ বার্ষিক ১২০০,০০০ টাকা এবং তদ্ব্যতীত কটক প্রদেশের সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রাপ্ত হইবেন। রঘুজি অঙ্গীকার করিলেন যে, তাহা পাইলেই ক্ষান্ত থাকিবেন, বাঙ্গালায় আর কোনরূপ উপদ্রব করিবেন না।

এই সময়ে রাজা সাহু পরলোক গমন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কোলাপুরের রাজাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্কীয় দায়াদ ছিলেন। কিন্তু বলজির সহিত সেই রাজার সদ্ভাব ছিল না, এজন্য বলজি সেই

ভূপতিকে অতিক্রম করিয়া, অন্য কাহাকে রাজা সাহের আসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যখন সাহু দিল্লীর সম্রাটের নিকট বন্দী হন, তখন রাজারাম মহারাষ্ট্রের রাজাসনে উপবেশন করেন। রাজারামের মৃত্যুর পর প্রথমতঃ তারাবাইয়ের গর্ভসম্ভূত দ্বিতীয় শিবজি নামে তাঁহার পুত্র পিতৃপদ উত্তরাধিকার করেন। কালক্রমে সেই দ্বিতীয় শিবজির মৃত্যু হইলে, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শম্ভু তৎপদে অভিষিক্ত হন। সেই শম্ভুই কোলাপুর রাজ্যের প্রথম রাজা। তারাবাই এপর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাঁহারও সহিত বলজির সদ্ভাব ছিল না। যাহা হউক, রাজা সাহের মৃত্যুর পর, বলজি ও তারাবাই ষড়যন্ত্র করিয়া এই প্রকাশ করিলেন যে, দ্বিতীয় শিবজির এক পুত্র আছেন। অনন্তর বলজি, রাম রাজা এই নামে দ্বিতীয় শিবজির সেই পুত্রকে সাহের সিংহাসনে বসাইলেন। রাজা সাহের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ সময়ে আজফজাও গতাসু হন। তাঁহার রাজ্য উত্তরাধিকার করিবার জন্য অনেক বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। সেই সকল বিবাদ বিসম্বাদে ইংরেজ ও ফরাসিরা নিরন্তর ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করেন। অতএব আপাততঃ সেই সকল বিদ্রোহের বিবরণ স্থগিত রহিল। পরে যখন ভারতবর্ষে ইয়ুরোপীয়দিগের আগমন ও অবস্থানের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিখিত হইবে, তখন সেই সকল বিদ্রোহের বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

১৭৫০ খৃঃ অব্দে নাদির সাহার প্রস্থানের পর হইতে ১৭৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যে সকল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ব্বের কয়েক পৃষ্ঠায় তৎসমু-

দায়েরই স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে; সেই একাদশ বৎসর কালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লেখ্য অন্য যে সকল ঘটনা উপস্থিত হয়, এপর্য্যন্ত তত্তাবতের কোন প্রসঙ্গ করা যায় নাই। নিম্নে সেই সকলের মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির স্থূল বিবরণ লিখিত হইতেছে।

নাদিরের প্রস্থানের পর, রোহিলাদিগের প্রাদুর্ভাবই আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা।

বহুকাল অবধি রোহিলা এই নামে খ্যাত বহুসঙ্খ্য পাঠান দিল্লীপতির সরকারে নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্যে বর্ণ্যমান সময়ে আলি মহম্মদ নামে এক সামান্য সৈনিক পুরুষ আপনার বুদ্ধি ও বাহুবলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া অবশেষে গঙ্গা নদী ও অযোধ্যা দেশের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। তদবধি সেই ভূভাগ রোহিলাখণ্ড নামে খ্যাত হয়। যাহা হউক, আলির আধিপত্য লাভের অল্পকাল পরেই দিল্লীপতি স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন আলি পরাস্ত হন। পরে সম্রাট তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সর্হিন্দ প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। আলি অগত্যা তাহাতেই ক্ষান্ত থাকেন (১৭৪৫)। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তের পাঠানেরা পর্য্যুদস্ত হইল বটে, কিন্তু এই সময়েই স্থানান্তরে তদ্বংশীয়েরা বিলক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিতেছিল এবং অচিরকালমধ্যেই ধাবমান হইয়া আসিয়া ভারতবর্ষ সাম্রাজ্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমনের পর নাদির সাহা ক্রমশঃ এমন দুর্ব্বৃত্ত ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠেন যে অবশেষে ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে পারস্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা চক্রান্ত করিয়া

তাঁহার প্রাণ-সংহার করে। আমেদ খাঁ নামে এক জন পাঠান নাদিরের অধীনে সেনানী-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রভুর বিনাশের পর তিনি, স্বীয় যোধগণের সহিত, স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া, তথায় অনায়াসেই রাজচ্ছত্র গ্রহণ করেন। পরে সিন্ধু নদীর পশ্চিম তট হইতে পারস্যের প্রান্ত পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগ তাঁহার অধিকৃত হয়। তিনি দিল্লীপতির তদানীন্তন হীন প্রতাপের বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাহাতে প্রোৎসাহিত হইয়া আসিয়া লাহোর নগর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন, তদনন্তর সর্হিন্দ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় সম্রাট মহম্মদ সাহার প্রেরিত সেনারা তাঁহাকে পরাস্ত করিল। তখন আমেদ অগত্যা কিছু কালের জন্য স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন (১৭৪৮)।

আমেদের প্রস্থানের অনতিবিলম্বেই সম্রাট মহম্মদ সাহা লোকান্তর গমন করায় তাঁহার পুত্র আমেদ সাহা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহিত হইলেন। অধুনা উজিরের পদ শূন্য ছিল, নূতন সম্রাট সাদত খাঁর পুত্র সফদর জঙ্গকে উহা অর্পণ করিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে সফদর জঙ্গ অযোধ্যার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। উজির হওয়ার পরও ঐ প্রদেশ তাঁহারই অধিকৃত রহিল। উজির হইয়া সফদর দেখিলেন আমেদ খাঁ দুরানি স্বদেশের পশ্চিম খণ্ডে ব্যাপৃত আছেন, আশু তাঁহা হইতে ভারতবর্ষের কোন আশঙ্কা নাই। অতএব সেই অবসরে তিনি নিজ প্রতিবেশী রোহিলাদিগের উচ্ছেদ সম্পাদন সঙ্কল্প করিলেন। সেই অভীষ্ট সাধনের জন্য তিনি ফরক্কাবাদের পাঠান সরদারকে স্বপক্ষ করেন; কিন্তু রোহিলাদিগের সহিত সংগ্রামে সেই সরদার গতাসু হন। তখন

সফজর দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে, মৃত মিত্রের পত্নীকে বঞ্চনা করিয়া, ফরক্কাবাদ আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ফরক্কাবাদের অধিবাসীরা দারুণ ক্রোধান্বিত হইয়া রোহিলাদিগের শরণ লইল। তদনুসারে রোহিলারা আসিয়া ফরক্কাবাদে উপস্থিত হইল। তখন উজিরকে স্বয়ং রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে হইল। কিন্তু তাঁহার সেনারা নিতান্ত অবাধ্য ও অকর্ম্মণ্য ছিল, রোহিলারা সহজেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিল। পরে তাহারা লখনৌ পর্য্যন্ত ধাবমান হইল। তখন উজির দারুণ সঙ্কটাপন্ন ও অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। বিপুল বিভব-লোভে মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই প্রার্থনায় সম্মত হইল। ভরতপুরের ভূপতিও উজিরের পক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সম্মিলিত আক্রমণে রোহিলারা পরাস্ত হইয়া হিমালয়ের প্রত্যন্ত শৈলপরম্পরায় পলায়ন করিল। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয়েরা উজিরের সম্মতিক্রমে, রোহিলাখণ্ডের সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক, অবশেষে পলায়িতদিগের আহারসামগ্রী নিঃশেষ করিয়া উঠিল। তখন রোহিলারা অগত্যা উজিরের বশীভূত হইল (১৭৫০)।

অতঃপর সফদর জঙ্গ দিল্লীতে পরাবর্ত্তন করিলেন। তথায় আসিয়া অবগত হইলেন, যে কিছু কাল পূর্ব্বে আমেদ খাঁ আবার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন। আর এই বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন "যদি দিল্লীশ্বর আমাকে ঐ প্রদেশ অর্পণ করেন তাহা হইলে আমি আর তাঁহার সাম্রাজ্যে কোন উপদ্রব করিব না।" সেই অনুসারে দিল্লীশ্বর আমেদকে পঞ্জাব সমর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে

সফদর জঙ্গের বিবেচনায় হইল সেরূপ পঞ্জাব সমর্পণ করা সম্রাটের গৌরবের নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াছে। এই সূত্রে ও অন্যান্য কারণে উজিরের সহিত সম্রাটের দারুণ অকৌশল হইয়া উঠিল। অধুনা দিল্লীর রাজপ্রভাব কীটনিষ্ক্বিত প্রাচীন তরুর ন্যায় নিতান্ত অন্তঃসার বিহীন হইয়াছিল এবং ক্রমশই উহার পতনকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল। সম্রাট স্বয়ং উজিরের দমন করা অসাধ্য দেখিয়া আজফজার পৌত্র গাজিউদ্দিনকে তদ্বিষয়ে নিযুক্ত করিলেন। গাজি বলে কৌশলে এত দূর সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন যে, সফদরকে উজিরী পরিত্যাগ করিতে হইল; কিন্তু তিনি অযোধ্যার শাসনভার হইতে অপসারিত হইলেন না। গাজি স্বয়ং উজির হইলেন। ইতিপূর্ব্বে দিল্লীপতির দুরবস্থার সুযোগ পাইয়া আগরার সন্নিকর্ষবাসী জাত-বংশীয়েরা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। এক্ষণে গাজি তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি অতিশয় অহঙ্কৃত ছিলেন, অচির কালমধ্যেই সম্রাট তাঁহার গর্ব্বিত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিপাতের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। যাহা হউক, গাজি মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল সাহায্যে সম্রাটের সমস্ত ষড়যন্ত্র বিফল করিলেন। পরিশেষে তিনি আমেদ সাহাকে রুদ্ধ ও তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া উঠিলেন। তখন গাজি, দ্বিতীয় আলমগীর এই নাম দিয়া, রাজকুলোদ্ভব এক কুমারকে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন (১৭৫৪)।

অধুনা দিল্লীপতির প্রতাপ এরূপ নিস্তেজ হইয়াছিল যে, যাহার কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষমতা ছিল, সেই আপনি স্বাধীন রাজা হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। কর্দ্দমনিমগ্ন কুঞ্জর

তদানীন্তন দিল্লীশ্বরের বিসদৃশ উপমাস্থল নহে। এমন অবস্থায় ভেকেও পদাঘাত করিতে সঙ্কুচিত হয় না। ইতিপূর্ব্বেই পাঠানেরা মূলতান ও লাহোর সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল ; সেই ভূভাগে শিখেরাও দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, এবং জাত ও রোহিলারাও নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাদের সন্নিহিত প্রদেশে উপদ্রব করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আর মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বত্র হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। এই অশুভ সময়ে দুরাকাঙ্ক্ষ গাজি উদ্দিন পঞ্জাব প্রদেশ আত্মসাৎ করার প্রয়াস পাওয়ায়, দিল্লীর সাম্রাজ্য অচিরাৎ বিনাশোন্মুখ হইয়া উঠিল।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে পঞ্জাব আমেদ খাঁর অধিকৃত হইয়াছিল। তথায় তাঁহার নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা পরলোক গমন করায় অধুনা সেই শাসনকর্ত্তার পত্নী তদীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। শাসনকর্ত্রীর দুহিতার সহিত গাজিউদ্দিনের বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছিল। গাজি বিবাহ সম্পাদন-ছলে নির্ব্বিবাদে লাহোরে প্রবেশ করিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা শাসনকর্ত্রীকে রুদ্ধ ও পঞ্জাব অধিকৃত করিলেন (১৭৫৬)। এই সম্বাদ পাইয়া আমেদের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি অবিলম্বে সসৈন্য আসিয়া গাজির প্রভুর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় পূর্ব্বে নাদির যে প্রকার নৃশংস ও দস্যুবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন অধুনা তাহারই পুনরভিনয় হইতে লাগিল। অধিকন্তু আমেদের সেনারা যাইয়া, মথুরা নগরে তৎকালীন পর্ব্বোপলক্ষে সমাগত অসংখ্য নিরপরাধ হিন্দু যাত্রীর শোণিত বর্ষণ করিল। অবশেষে আমেদ, এক মোগল রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ

করিয়া, গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রের প্রাখর্য্য হেতু কিছুকালের জন্য স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন (১৭৫৮)। তাঁহার প্রস্থান সময়ে সম্রাট্ তাঁহাকে এই অনুনয় করেন যে, "আমি উজির গাজিউদ্দিনের গর্ব্ব ও কর্ত্তৃত্ব-হেতু সতত উৎপীড়িত হই। আপনি এরূপ কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাউন যে উজির আমার উপর প্রাধান্য করিতে না পারে।" সেই অনুসারে আমেদ খাঁ নাজির উদ্দৌলা নামে এক দক্ষ রোহিলা সামন্তকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। আমেদ ভবিয়াছিলেন নাজিরের প্রভাবে গাজিকে সংযত থাকিতে হইবে। কিন্তু আমেদ প্রতিগত হইবামাত্র তাঁহার সেই নিয়োগ নিস্ফল হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে গাজি দিল্লীশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্ত করিলেন। সেই ব্যাপার সম্পন্ন হইলে পর, মহারাষ্ট্রীয়েরা, পঞ্জাব আক্রমণ ও অধিকারপূর্ব্বক, তথায় আপনাদিগের এক জন শাসনকর্ত্তা রাখিয়া, দাক্ষিণাত্যে প্রতিগমন করিল (১৭৫৮)। পঞ্জাব অধিকার করার পর মহারাষ্ট্রীয়েরা অযোধ্যা আক্রমণের অভিসন্ধি ও তদনন্তর সমস্ত ভারতবর্ষে আপনাদের একাধিপত্য স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিল। ফলতঃ তখন তাহারা এমন বলদর্পিত হইয়াছিল যে ভারতবর্ষীয় কোন রাজাই তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ ছিলেন না। যাহা হউক, তাহাদের প্রচীয়মান প্রভাব দর্শনে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সুজাউদ্দৌলা * ও অন্যান্য মুসলমান ভূপতিরা পরস্পরের রক্ষার্থ সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। এদিকে আমেদ খাঁও আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেন্ধিয়া ও হুলকারের অধীন দুই দল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য পরাভূত করিলেন। তখন গাজি দেখিলেন

* ইনি সফদর জঙ্গের পুত্র।

আমেদ খাঁ জয়ী হইলে, তদীয় আনুকূল্যে পূর্ব্বের ক্রোধ হেতু, সম্রাট্ আলম্‌গীর তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবেন। সেই ভাবী অনিষ্ট নিবারণ মানসে, গাজি অবিলম্বে আলম্‌গীরের প্রাণসংহার করিয়া, অপর এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু সে ব্যক্তিকে কেহই সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিল না। আলম্‌গীরের পুত্র সাহা আলমই দিল্লীর সিংহাসনের স্বত্বাস্পদীভূত অধিকারী ছিলেন। তিনি পিতার হত্যাকালে বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরে আমরা তাঁহাব বিষয় বর্ণন করিব, সম্প্রতি উপস্থিত প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। আমেদ খাঁ দুই দল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য বিনাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা অণুমাত্রও ত্রাসিত হইল না। কেনই বা হইবে? তখন ভারতবর্ষে তাহাদের প্রচণ্ড প্রভাব, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাবৎ স্থান কোন না কোন রূপে তাহাদের বশতাপন্ন ছিল। তখন তাহাদেব সেনানিচয় পূর্ব্বের মত নিরবচ্ছিন্ন দস্যুভাবাপন্ন ছিল না, বহুসংখ্যা সুশিক্ষিত অশ্বারোহী ও পদাতিক অনবরত যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে বিলক্ষণ সমরকুশল হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা কামানও অনেক আহরণ করিয়াছিল। সুতরাং সেন্ধিয়া ও হুলকারের সেনাদের পরাজয়-জন্য শঙ্কা হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাতে প্রদীপ্ত-বৈরনির্যাতন হইয়া, পাঠানদিগকে দূরীকরণ পূর্ব্বক, সমস্ত ভারতবর্ষে একাধিপত্য স্থাপনের লালসায়, মহারাষ্ট্রীয়েরা আমেদের সহিত সংগ্রামের জন্য বিপুল আয়োজন করিল। অবশেষে পেশোয়া বলাজির ভ্রাতৃপুত্র সদাশিব ১৪০০০ সৈনিক পুরুষের সহিত স্বদেশ হইতে নির্গত হইলেন। পেশোয়ার পুত্র বিশ্ব-

নাথও সমভিব্যাহারে আসিলেন। সদাশিব স্বভাবতই অহঙ্কৃত ছিলেন; আর তিনি স্বজাতির ও স্বীয় পরিবারের বর্দ্ধনশীল সৌভাগ্য দর্শনে মাৎসর্য্যে একান্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি ক্রমে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন এবং কামান প্রয়োগ দ্বারা তন্নগর অধিকার করিলেন। পরে তত্রত্য সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া বিশ্বনাথকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পরিশেষে বিবেচনা করিয়া আমেদ খাঁকে দূরীকরণ পর্য্যন্ত সেই অভিষেকব্যাপার স্থগিত রাখিলেন (১৭৬০)।

ভরতপুরের জাতবংশীয় ভূপতি নিয়ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বপক্ষ ও বিলক্ষণ বহুদর্শী ছিলেন। তিনি সদাশিবকে পরামর্শ দিলেন "পদাতিক ও গোলন্দাজদিগকে ভরতপুর রাজ্যে রাখিয়া কেবল অশ্বারোহিগণ লইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের চিরাভ্যস্ত প্রণালীতে, আমেদ খাঁর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন। শীতকালের শেষপর্য্যন্ত সেরূপ করিলেই গ্রীষ্মাগমে পাঠানেরা রৌদ্রের আতিশয্য নিবন্ধন আপনা হইতেই স্বদেশে পলায়ন করিবে।" কিন্তু সদাশিব সে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। সর্ব্বাঙ্গীন সৈন্যের সহিত রীতিমত সম্মুখ-যুদ্ধ করাই তাঁহার বিবেচনা হইল। এ পর্য্যন্ত আমেদ খাঁ অযোধ্যার পর্য্যন্তে থাকিয়া সুজাউদ্দৌলা প্রভৃতি মিলিত ভূপতিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি ধাবমান হইয়া এমনই সত্বর ও সাহসে যমুনা নদী অতিক্রম করিলেন যে তচ্ছ্রবণে মহারাষ্ট্রীয়েরা নিশ্চয় বুঝিলেন, যে তাঁহার সহিত সংগ্রাম করা সহজ নহে বরং তাঁহা হইতে দূরতর থাকাই মঙ্গল। এই বিবেচনানুসারে তাঁহারা পানীপথ নগরে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ

করিলেন। আর শিবিরের রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে পরিখাখনন ও কামান-বিন্যাস করিয়া রাখিলেন (১৭৬০)।

আমেদ খাঁও আসিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনতিদূরে শিবির স্থাপন করিলেন। তাঁহার সহিত ৪০,০০০ পাঠান ও পারসীক, ১৩০০০ ভারতবর্ষীয় অশ্বারোহী ও ৩৮০০০ পদাতিক এবং ত্রিশটী কামান ছিল। বিপক্ষ দলে ৭০,০০০ অশ্বারোহী, ১৬০০০ পদাতিক এবং ২০০ কামান ছিল। আমেদ প্রথমতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। তিনি তাহাদের হইতে আক্রমণ প্রতীক্ষায় রহিলেন। ইত্যবসরে অনুযামুন প্রদেশ হইতে ১২০০০ মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব আসিয়া আমেদের আসার প্রসার রুদ্ধ করিল। আহার অভাবে তাঁহার শিবিরে দারুণ কষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই তাঁহার এক দল সৈন্য সেই আগন্তুক অশ্বারোহীদিগকে আক্রমণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। তাহাতে সন্নিহিত ভূভাগ তাঁহার অধিকৃত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে আহার সামগ্রীর সমাগম বন্ধ হইল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতে লাগিল। তথনও আমেদ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন না দেখিয়া পরিশেষে সদাশিব নিশ্চয় করিলেন, অনশনে লয় হওয়ার অপেক্ষা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। ইতিপূর্ব্বে তিনি সন্ধির প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু আমেদ তাহাতে স্বীকৃত হন নাই।

অবশেষে ১৭৬১ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসের ষষ্ঠ দিবসে, নিজ গোলন্দাজদিগকে অগ্রভাগে লইয়া, সদাশিব সমস্ত সৈন্যের সহিত শত্রুশিবির আক্রমণে ধাবমান হইলেন। আমেদ সেই আক্রমণ সম্বাদ পাইয়া আপন

শিবিরের সম্মুখে বলবিন্যাস করিলেন। সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের জয়, আমেদের বল-ক্ষয় হইতে লাগিল। যাহা হউক, অবশেষে পাঠান-রাজের ভাগ্যই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি একবারে সমস্ত সৈন্যের সহিত বিপক্ষদল আক্রমণ করিলেন, অমনি যেন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রপ্রভাবে শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। সদাশিব ও বিশ্বনাথ নিহত হইলেন। অন্যান্য প্রধান মারহাট্টা সেনানীরাও কেহ হত ও কেহ আহত হইয়া পড়িলেন। পলায়মান সৈনিকেরাও কেহই নিস্তার পাইল না। পাঠানেরা বহু দূর অনুসরণ করিয়া অধিকাংশেরই নিপাত করিল, আর মহারাষ্ট্রীয়দিগের পূর্ব্বতন অত্যাচার হেতু সকল লোকই তাহাদের উপরে দারুণ ক্রোধান্বিত হইয়াছিল। এজন্য যাহারা কথঞ্চিৎ পাঠানদের হস্ত হইতেও নিষ্কৃতি পাইল, কৃষকেরা তাহাদের সংহার করিল। এমন কি, সেই মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের এক প্রাণীও জীবিত ছিল কি না সন্দেহ। এই অসামান্য পরাভবের সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর, অনতি-দীর্ঘকালমধ্যেই শোক ও মনস্তাপে পেশোয়া বলজির প্রাণবিয়োগ হইল। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয় প্রধান বর্গের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইতে লাগিল। পানিপথযুদ্ধের পর বহুকাল মহারাষ্ট্রীয়েরা বিষশূন্য বিষধরের ন্যায় অবসন্ন রহিল।

জয়লাভের পর আমেদ দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তখন ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য তাঁহার পদানত ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই উহা গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া স্বল্পকালমধ্যেই স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর তিনি আর একবারও ভারতভূমির প্রতি দৃক্-

পাত করেন নাই। এই প্রকারে দিল্লীর সাম্রাজ্য উচ্ছিন্ন হইল। অনন্তর কেবল সম্রাটের নামমাত্র সম্মানের আস্পদ রহিল। এদিকে বহু দূর হইতে দুস্তর সাগর অতিক্রম করিয়া এক বৈদেশিক জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। অতঃপর সেই জাতি আধিপত্য স্থাপন আরম্ভ করিল। আমরা পরে সেই অভিনব অধীশ্বরদিগের বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিব। এক্ষণে মোগল সাম্রাজ্যের মূলচ্ছেদ হইল। এই স্থলে আমাদিগের পুরাবৃত্তের প্রথম ভাগ সমাপ্ত করিলাম।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

২৪, বাইলেন, অপর সর্কিউলর রোড। গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।